

1953

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

চতুর্দ্বিংশৎ বর্ষ : : চৈত্র, ১৩৫৯

732/5
পৃষ্ঠা

বিষয় সূচী

| | | | |
|--|-----|-----|----|
| অধ্যক্ষের বাণী | ... | ... | ১ |
| কলেজ প্রসঙ্গ | ... | ... | ২ |
| সাম্প্রতিক সাহিত্য | ... | ... | ১৬ |
| বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ও রবীন্দ্রনাথ | ... | ... | ২৪ |
| শ্রুতির মৃত্যু (কবিতা) | ... | ... | ২৯ |
| বৃন্দচ্যুতি (কবিতা) | ... | ... | ৩১ |
| পদ্মা (কবিতা) | ... | ... | ৩২ |
| কল্পনা | ... | ... | ৩৩ |
| ইতিহাসে ব্যক্তির স্থান | ... | ... | ৩৭ |
| শব্দ (কবিতা) | ... | ... | ৪২ |
| ভুলের স্বর্গ (কবিতা) | ... | ... | ৪২ |
| ছুটির গান (কবিতা) | ... | ... | ৪৩ |
| বিজ্ঞাপনের অর্থনীতি | ... | ... | ৪৫ |
| র্যান্ডম্ | ... | ... | ৫১ |
| গ্রন্থপরিচয় | ... | ... | ৫৬ |
| আমাদের কথা | ... | ... | ৬৩ |
| EDITORIAL | ... | ... | 1 |
| THE CONCEPT OF ECSTASY IN THE LIGHT OF SANSKRIT POETICS | ... | ... | 9 |
| SINCLAIR'S NEW EPISTEMOLOGY | ... | ... | 12 |
| A TRIP TO TOTOPARA | ... | ... | 17 |
| SATISH C. MUKHERJEE AND THE DAWN MAGAZINE | ... | ... | 20 |
| AS CIVILISATION ADVANCES POETRY DECLINES | ... | ... | 32 |
| MIRZA RAJA JAI SINGH | ... | ... | 34 |
| LINGERING IMPERIALISM | ... | ... | 41 |
| AN APOLOGY FOR STATISTICS | ... | ... | 49 |
| THE PRINCIPAL'S WELCOME ADDRESS | ... | ... | 53 |

চিত্রসূচী

| | |
|---|---|
| রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ | } |
| রাষ্ট্রপতির শুভাগমন সংক্রান্ত চিত্রাবলী | } |
| COLLEGE UNION COUNCIL (1951-52) | } |
| ছাত্রাবাসে রাষ্ট্রপতি | } |
| "THE CALL OF THE WILD" | } |
| "A QUIET COVE" | } |

বিজ্ঞাপন

প্রতি সংখ্যার জন্য চাঁদার হার :—

| | |
|--|-----------|
| ভারতের মধ্যে (ডাকমাশুল নিয়ে) | ২।।০ টাকা |
| প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য— | ১।।০ ” |
| ভারতের বাইরে | ৪ শিলিং |

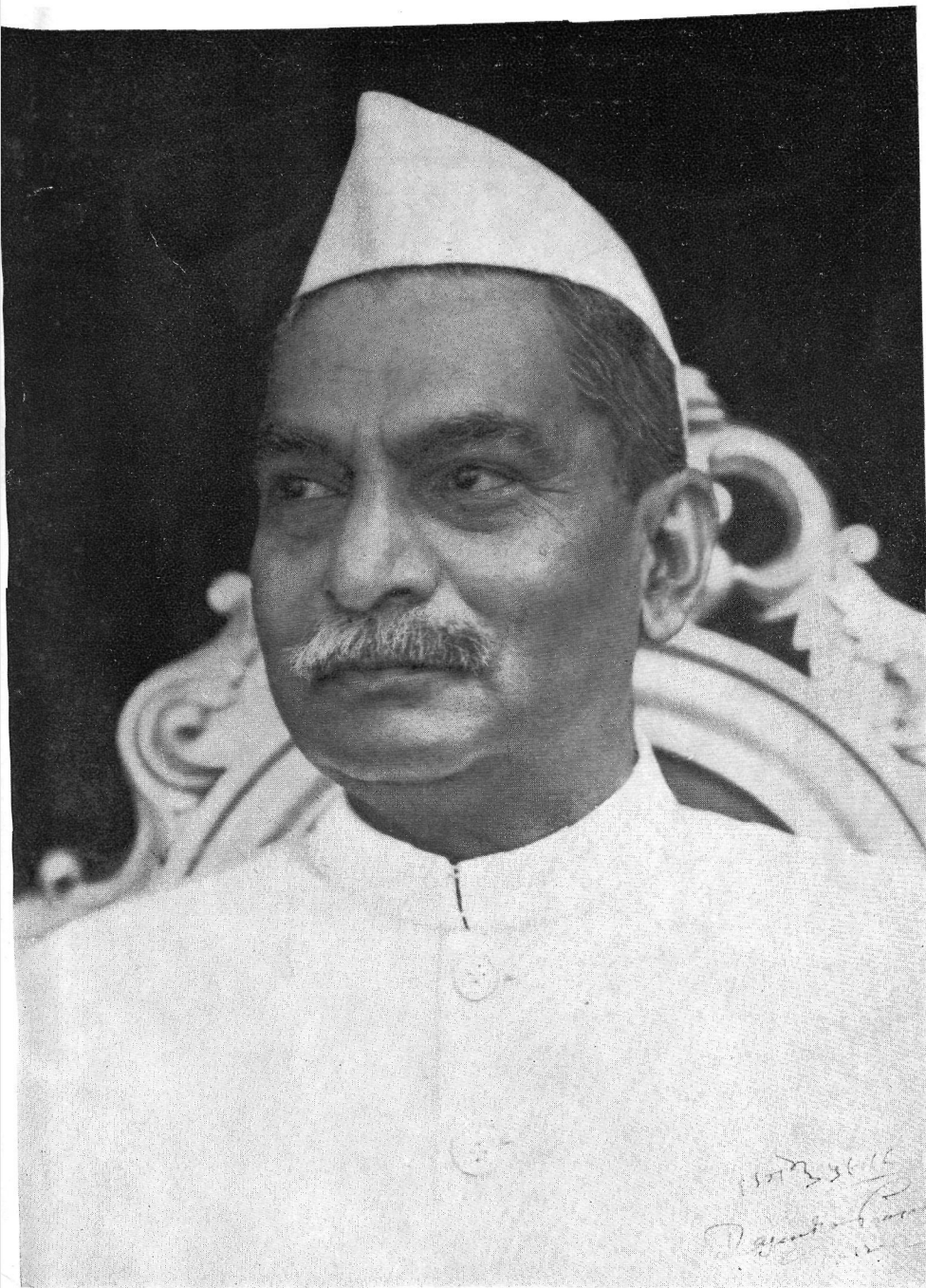
সাধারণতঃ বৎসরে দুইটি সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র এবং অধ্যাপকসমূহের নিকট এই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত এবং অগ্ৰাণ্য বিবিধ রচনা সাদরে আহ্বান করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, প্রকাশিতব্য রচনাগুলির প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার মান ও ঐতিহ্যের উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। একান্ত বিশেষজ্ঞ-বোধ্য রচনা এই পত্রিকার পক্ষে অনুপযোগী। উপযুক্ত ডাকটিকিটসমেত শিরোনামালিখিত লেফাফা সঙ্গে না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

রচনা পাঠাতে হলে নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি পালন করা প্রয়োজন :

কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তলিপিতে অথবা টাইপ করে লেখা দিতে হবে। শব্দ এবং পংক্তির মধ্যে এবং পৃষ্ঠার শিরোদেশে এবং বামপার্শ্বে উপযুক্ত ব্যবধান থাকা আবশ্যিক। বিভিন্ন সঙ্কেতের পরিবর্তে সংখ্যানুক্রমিক পাদটীকা বাঞ্ছনীয়। লেখকের সম্পূর্ণ নাম দিয়ে রচনা সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে।

পত্রিকাসংক্রান্ত অগ্ৰাণ্য বিষয়ে প্রকাশনাবিভাগের সম্পাদকের সঙ্গে পত্রালাপ করা যেতে পারে।



SIGNED PORTRAIT PRESENTED BY RASTRAPATI DR. RAJENDRA PRASAD
AS A MEMENTO OF HIS VISIT TO HIS OLD COLLEGE ON THE 24TH DECEMBER, 1952.



The Rastrapati, with some of his old fellow-boarders, in the room he occupied for some time at the Eden Hindu Hostel, where he was in residence from 1902 to 1907.

[By courtesy of the "Hindusthan Standard".

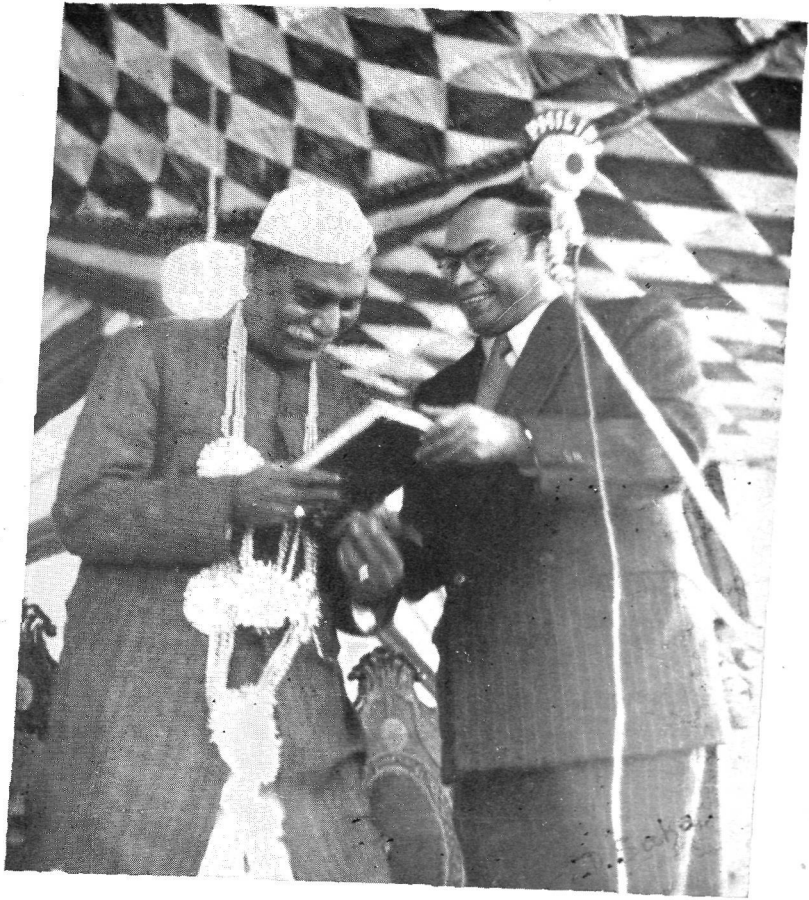


The Rastrapati greeted with conch-shells as he enters the Reception Pandal accompanied by the Principal.
[By courtesy of the "Amritha Basar Parvika".



Sri Debendranath Sen, a former Professor of History in this College and an old teacher of the Rastrapati, speaking at the reception.

[By courtesy of the "Hindusthan Standard".



The Principal presenting the Rastrapati with a specially bound volume of the Presidency College Register.

[Photo. : D. Saha, First Year Arts.]



The General Secretary presenting the address of welcome on behalf of the College Union.

[Photo. : B. Barman, Third Year Arts.]



The Rastrapati replying to the addresses of welcome.

[By courtesy of the "Hindusthan Standard".



A View of the Reception Pandal.

[By courtesy of the "Hindusthan Standard".

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

ফাল্গুন, ১৩৫৯ ::

চতুর্দশ বর্ষ

:: মার্চ, ১৯৫৩

অধ্যক্ষের বাণী

আমাদের এই মহাবিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার পর একশত ছত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং ইহার যে বিভাগটি পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে পৃথক সভালাভ করে, আগামী আড়াই বৎসরের মধ্যে তাহার একশত বৎসর পূর্ণ হইবে। এই কলেজের সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ১৯০২ সালে একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণীত হয়। একটি তৃতীয় আইন অধুনা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং এই বৎসরের মধ্যেই কার্যকরী হইবে।

এই কলেজের বিরাট ঐতিহ্য সর্বজনবিদিত, কিন্তু ইহার ভবিষ্যতের কথা আমাদের অধিক চিন্তনীয়। এই শিক্ষাকেন্দ্রের উন্নতির জন্ত স্বভাবতঃই আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন অধিক স্থানসংকুলান এবং আর্টসবিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের গবেষণার সুবিধা ও ব্যবস্থা—বিশেষ করিয়া অর্থনীতির গবেষণার জন্ত পৃথক কতকগুলি ঘর ও উপযুক্ত আয়োজন। ইহা ছাড়া, বর্তমান ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণার সূচনাক্ষেত্র-রূপে এই কলেজ প্রসিদ্ধ। আমাদের এখনকার বিজ্ঞানবিভাগগুলি যদিও গবেষণার সন্ধান রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহা হইলেও বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে বর্তমান স্থানাভাব উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

ঐহারা দেশে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নকামী, এই কলেজের ক্রমবিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে জন্ত তাঁহাদের ঔৎসুক্য ও চাঞ্চল্য স্বাভাবিক। স্তরাতঃ, কলেজের অগ্রগতির জন্ত এবং তাহার সন্ধান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত প্রয়োজন একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা। শীঘ্রই এইরকম একটি পরিকল্পনা কলেজ হইতে প্রস্তাবিত হইতেছে। সরকারের আশানুরূপ সাহায্যের উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করিবে।

শ্রীযতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত

কলেজ প্রসঙ্গ

আমাদের এই কলেজপত্রিকা চতুষ্ক্রিংশৎ বর্ষে পদার্পণ করল। কলেজের প্রাচীনত্বের আভা আজ এর উপর এসে পড়েছে। দীর্ঘকাল ধরে এই বিশাল বিখ্যাতনয় প্রশস্ত প্রাণ-প্রবাহের বিষয়ে একটা সামগ্রিক চেতনাসৃষ্টি করার প্রয়াস, তার প্রসঙ্গগতিকে বাণীর সার্থক মাধ্যমে একটা পরিমিত কিন্তু অখণ্ড রূপদানের প্রচেষ্টা এই পত্রিকাকে নিজস্ব দীপ্তির মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার প্রদীপলাঙ্ঘন নিরর্থক নয়। এই কলেজের কর্মিরূপটা সহজেই চোখে পড়ে—বিচিত্র উপকরণের বাহুল্যে তার উক্ত প্রকাশ। কিন্তু হওয়াটাই আশ্রমের আদর্শ, করাটা নয়। তাই কর্মের মুখর আবেষ্টনীর বাইরে স্বচ্ছন্দ মুক্তির আনন্দে যেখানে হয়ে-ওঠার অবকাশ, সেখানে প্রদীপ জ্বলেছে এই পত্রিকা—এই প্রাচীন মহাবিদ্যালয়ের বাহ্য কর্মচাক্ষুর অন্তরালে তার নিঃসঙ্গ, নিভৃত সত্তাকে আলোকিত করার ভার সে নিয়েছে।

প্রতিবৎসর এই প্রাচীন পত্রিকার রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ হয় এক নূতন সম্পাদকের উপর। তার পক্ষে এটা শুধু প্রকাশনার নয়, একটা প্রকাশের অভিজ্ঞতা। প্রাচীন এবং নবীনের সমন্বয়ে সজীবতার সঞ্চারণ হওয়া সম্ভব, কিন্তু যে ঐতিহ্য এই পত্রিকার পোষণ-পদার্থ, তাকে অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব এই সাধনার মুখ্য অঙ্গ। স্বথের বিষয়, এ দায়িত্ব সম্পাদকের একার নয়—সেই ঐতিহ্যের সার্থক প্রকাশের প্রচেষ্টাতে এই কলেজের অতীত বা বর্তমানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঋীদেরই সহায়ত্ব আছে তাঁদের সকলের। বিলম্বে সঙ্কট আত্মপ্রকাশের দৈহ্য ও গ্লানি থেকে মুক্তিলাভের আশায় নববর্ষে এই পত্রিকা তার সকল কল্যাণকামীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তাঁদের পূর্ণসহযোগিতা প্রার্থনা করেছে। এ শুধু নববর্ষের শুভেচ্ছাবিনিময় নয়—যে প্রদীপকে আমরা প্রতীকরূপে বরণ করেছি, তার স্থির এবং অক্ষয় জ্যোতিতে আত্মস্থাপনের আহ্বান।

*

*

*

এক একটা বৎসর চলে যায়—ছাত্রদলের আগমন ও নির্গমনের মধ্যে দৈনন্দিন ঘটনার উপচীর্ণমান স্তূপ নিয়ে কলেজের জীবন বহে চলে। সেই প্রবহমান স্রোতের উপরে তার ঐতিহ্যমূর্তি মাঝে মাঝে ভেসে উঠলেও তার সষক্কে সমষ্টিগত চেতনা অক্ষুট থেকে যায়। যতই আমরা কালের সামনের দিকে এগিয়ে চলি একটা প্রতিষ্ঠানের প্রাচীন সত্তার বিষয়ে চেতনা ততই বিচ্ছিন্ন, ক্ষণিক, এমন কি নির্জীব হয়ে আসতে থাকে। সেই চেতনা এবং তারই সংশ্রয়ী কতকগুলি বিশিষ্ট ভাব এবং আদর্শকে সঞ্জীবিত করে তুলতে হলে আত্মগঠনিক অবগাহনের জগ্রে মাঝে মাঝে অতীতের গর্ভে নিহিত মূল উৎসের পথে ফিরে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। এবার বর্ষশেষে এই রকম প্রত্যাবর্তনের এক উপভোগ্য স্রবোগ আমরা

পেয়েছিলাম। গত ২৪শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের আগমন আমাদের কলেজের বর্তমান ছাত্রসমাজের পক্ষে একটি বিশেষ উপলব্ধিসমূহ অভিজ্ঞতা।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র এবং অধ্যাপকের বিপুল সমাবেশে এই দিনের মিলনোৎসবের পিছনে ছিল আত্মোপলব্ধির প্রেরণা। যুগান্তরের পরিপ্রেক্ষণিকায় এই অনুষ্ঠানের উপর যেন যান্ত্রিক মর্ষাদা এসে পড়ে—যেন আমরা এক স্মৃতির যজ্ঞের আয়োজন করলাম, তার প্রধান পুরোহিত হলেন আমাদের সেদিনের অতিথি রাষ্ট্রপতি। যে যুগে এই মহাবিদ্যালয়ের স্বাক্ষর নিয়ে অনেকেই জাতীয় সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন—যাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য এই সংগ্রামের অগ্রতম বিজয়ী বীর আমাদের রাষ্ট্রপতি—সেই যুগের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধানিবেদন যেন সেই যুগের দীক্ষাকে উপলব্ধি করার প্রেরণা দেয় আমাদের। পরীক্ষাশালায় এবং কর্মজীবনে সাফল্যের চেয়ে উচ্চতর আদর্শে আমাদের ছাত্রদের উৎসাহ নাই এ রকম ধারণা হয়তো আজ প্রচলিত। কিন্তু আমাদের কলেজেরই ছাত্র ছিলেন রাষ্ট্রপতি এবং ছাত্রজীবনের সর্বোচ্চ সম্মানও তিনি লাভ করেছিলেন। জাতির ভাগ্যগঠনে আমাদের সেরা ছাত্রদের অংশ থাকবে না এ রকম নৈরাশ্য ভিত্তিহীন।

জাতির কল্যাণে এই কলেজের শিক্ষায়তন অবদানের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে তার আত্মপ্রদানের দাবী মেটানো দরকার। এই অর্ধশতাব্দীতে জাতির রাজনৈতিক জীবনে যে যুগান্তর এসেছে শিক্ষাজীবনে তার ব্যাপক সাড়া মেলে নাই। এই অসঙ্গতির সাফল্য পাই আমাদের এই প্রাচীন শিক্ষায়তনের বর্তমান সঙ্কটে। বহুদিনের সঞ্চিত অতাবে এবং যুগোপযোগী উপকরণের প্রয়োজনে এই কলেজের ব্যাপক প্রসারের সমস্তা আজ নিছক প্রাণের দাবীতে এসে ঠেকেছে। রাষ্ট্রপতি যখন তাঁর পুরাতন কলেজকে স্মরণ করে আমাদের মাঝে এলেন তখন কলেজের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে এই মিলনোৎসবের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন অভয়পত্রী কল্পনা করা অসঙ্গত নাও হয়ে থাকতে পারে। শুধু অতীতের স্মৃতিপূজাই আমাদের সেদিনের উৎসবের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। জাতির ভাগ্যান্বিত্যের উপস্থিতির দুর্লভ মুহূর্তে তাঁর এবং আমাদের মাতৃসমা বিদ্যাভূমির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা গোপন করা কঠিন এবং এই স্মপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানের নীরব, অসহায় আবেদনকে স্ফুট করে তোলার প্রলোভন স্বাভাবিক। তিনি যে একজন পুরাতন ছাত্র, আমাদেরই একজন—এই চিন্তায় আশ্বাসের আকর্ষণ আছে। এই প্রসঙ্গে কলেজের আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা যিনি প্রথম দরদ দিয়ে অহুভব করে তার সর্বাঙ্গীণ পরিবর্ধনের পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন সেই পুণ্যশ্লোক অধ্যক্ষ হেনরী জেমস্-এর ‘কলেজ হল’-সংক্রান্ত একটি আবেদনের কথা মনে পড়ে। অবসরগ্রহণের অনেক পরে এই পত্রিকার চতুর্দশ খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় (মার্চ, ১৯২৮) তাঁর “The College Hall” শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি উত্তর পাবার আশায় প্রশ্ন করছেন—“Is the idea that old Presidency College men might make a gift to the College of its

Hall of Assembly, an idle dream ? Or is it a true vision ?” যদি অধ্যক্ষ জেম্‌স্‌ তাঁর উদার মানসনেত্রে দেখতে পেতেন এই কলেজের একজন ছাত্র একদিন ভারতের রাষ্ট্রপতি হবেন তাহলে তাঁর উদ্বিগ্ন হয়তো শান্ত হতো। আজ কলেজের সমস্তা অধ্যক্ষ জেম্‌স্‌-এর সময়ের থেকে অনেক বেশী জটিল হয়েছে—তার যে দিকটা শুধু ঘরবাড়ীর চাহিদা তার আয়তনও বিপুলতর। রাজপুরুষের দুর্লভ আহুকূল্যই এক্ষেত্রে একমাত্র আশা এইরূপ প্রসিদ্ধি। তবু যা অধ্যক্ষ জেম্‌স্‌ সমগ্র প্রাক্তনছাত্রমণ্ডলীর নিকট প্রত্যাশা করতে যথেষ্ট সাহস পান নাই, আজ তার চেয়ে বৃহত্তর অভাবও মাত্র একজন প্রাক্তনছাত্রের ইচ্ছায় দূর হতে পারে এই আশা পোষণ করা হয়তো নিরর্থক নয়। স্বয়ং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও আজ অসীম নয়, তবু রাজতন্ত্রের কল্পতরুভূমিতে নির্ভরশীল হওয়াই আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য—এ ক্ষেত্রে আমাদের সৌভাগ্য যে বর্তমান দুর্দশায় আমাদের এই ভিক্ষা সন্তানের কাছে মাতার অভাবমোচনের প্রার্থনা অপেক্ষা অধিক অসঙ্গত নয়।

*

*

*

কিছুদিন আগে অধ্যাপকমণ্ডলী থেকে অবসরগ্রহণ করেছেন দুজন ঘাঁদের সঙ্গে এই কলেজের যোগ ছিল নিবিড় এবং দীর্ঘকালব্যাপী। গণিতবিভাগের স্বেযোগ্য অধ্যাপক শ্রীশঙ্করদাস ভড় সূদীর্ঘকাল কলেজের পরিচালনাকার্যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে এসেছেন আয়বায় পরীক্ষার ভারবহনে অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে। কর্মসচিবরূপে তাঁর দক্ষতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রেমটাদ-রায়টাদ-বৃত্তিবাহারী এই সূখী অধ্যাপনায়ও স্তন্যম অর্জন করেন। তাঁর বহুমুখী নৈপুণ্যের একটি মনোগ্রাহী নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে একবার আমাদের কলেজের শিল্পকলাপ্রদর্শনীতে স্বহস্তে অঙ্কিত ছবি এবং উচ্চশ্রেণীর সূচিকার্য দেখিয়ে ইনি সকলকে চমৎকৃত করেন। এই নীরব অক্লান্ত কর্মীর অভাব আমরা বহুক্ষেত্রে নিয়ত অনুভব করি।

রসায়নবিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার সেনের অধ্যাপনায় ও গবেষণায় খ্যাতি স্বেদিত। Jute Chemistry-সংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর মূল্যবান দান উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানাগারের বাইরেও ইনি বহুমুখী দক্ষতার অধিকারী। খেলাধুলায় তাঁর এত উৎসাহ যে গাজও তিনি কলেজের খেলার মাঠে আসতে ভোলেন না। ইনি নিজে খেলোয়াড় ছিলেন, বিশেষ করে ভালো ক্রিকেট খেলতেন। সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাঁর অধিকার আছে। ছাত্র-জীবনে ভালো অভিনেতা ছিলেন—কলেজের নাট্যাগুষ্ঠানে তাঁর সোৎসাহ উপদেশ বিশেষ উপযোগী হত। আমরা জেনে সূখী হলাম যে কলেজ থেকে অবসরগ্রহণের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে Forensic Laboratoryর পরিচালকপদে নিযুক্ত করেছেন। স্মরণ হতে পারে, কিছুদিন আগে সরকারী অনুরোধে তিনি বিলাতে Forensic Chemistry সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিদর্শন করে আসেন। নবপ্রতিষ্ঠিত Forensic Laboratory গড়ে তুলতে হবে তাঁকেই। আমরা তাঁর পূর্ণসফল্য কামনা করি।

শ্রীগুরুদাস ভড়ের অবসরগ্রহণে আয়বয়পরীক্ষকের গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন ভূতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার রায়। গণিতবিভাগের গভীর ক্ষতি আরও বর্ধিত হয়েছে ডক্টর দেবেন্দ্রনাথ মিত্র খড়্গাপুরে Indian Institute of Technologyতে যোগদান করায়। অধ্যাপক ভড়ের স্থানে নবাগত ডক্টর নন্দলাল ঘোষকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাই। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্রের স্থান সাময়িকভাবে পূরণ করেছেন শ্রীকামিনীকুমার দে এবং তাঁর শূণ্যস্থানে এসেছেন শ্রীশ্যামাধন মুখোপাধ্যায়। Astronomical Observatoryর সুষোগ্য সহকারী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস সূদীর্ঘকাল কাজ করার পর অবসর গ্রহণ করলেও কলেজ তাঁকে ছেড়ে দিতে পারে নি। গত জুলাই মাসে আংশিকভিত্তিতে তিনি পুনর্নিযুক্ত হয়েছেন।

রসায়নবিভাগের প্রধান অধ্যাপকের স্থান পূরণ করেছেন কৃতী অধ্যাপক ডক্টর প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত। জামসেদপুরের National Institute of Sciencesএর ভূতপূর্ব Research Fellow, ডক্টর সুরধীরচন্দ্র সোম এই বিভাগে যোগদান করেছেন। কৃষ্ণনগর থেকে এসেছেন শ্রীজগদীশ রায়।

খড়্গাপুরে Indian Institute of Technologyতে যোগদান করার জন্ম আরেকজন অধ্যাপক আমাদের কলেজ থেকে বিদায়গ্রহণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন উদ্ভিদবিজ্ঞানবিভাগের অধ্যাপক, ডক্টর নীরদকুমার সেন। এঁদের মত সুষোগ্য অধ্যাপকের অভাবে আমাদের কলেজের গভীর ক্ষতি। কিন্তু নবপরিকল্পিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তোলার কাজে আমাদের কলেজের বিশিষ্ট অংশ থাকবে এটা খুবই সঙ্গত।

উদ্ভিদবিজ্ঞানবিভাগের লেকচারার শ্রীশ্যামাশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্প্রতি Indo-German Industrial Co-operation Scheme অনুযায়ী পশ্চিম জার্মানীতে Bonn বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্ম প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর স্থানে নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীনিরঞ্জন পাল। আজকাল বিদেশে উচ্চশিক্ষালাভের যে নানারকম পরিকল্পনা হয়েছে তার সুষোগ্য আমাদের পদার্থবিজ্ঞানবিভাগের লেকচারার শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যও পেয়েছেন। তিনি আমেরিকায় Indiana প্রদেশের Notre Dame বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী গবেষকরূপে উচ্চশিক্ষালাভ করছেন।

পদার্থবিজ্ঞানবিভাগে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষের স্থান পূরণ করেছেন শ্রীহিমাংশুকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীস্বশীলচন্দ্র সরকারের জায়গায় এসেছেন শ্রীরাসবিহারী চক্রবর্তী। ভূতত্ত্ব বিভাগের সুষোগ্য সহকারী শ্রীবিনয়কুমার ঘোষ পদত্যাগ করায় তাঁর স্থানে নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীকমলচন্দ্র রায়চৌধুরী।

আমাদের কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষা-মূলক সমিতি বা অধিবেশনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এই বৎসরে উল্লেখযোগ্য খবর এই যে, আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবারও বঙ্গীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানসমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং দর্শনের অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

গত ডিসেম্বর মাসে মহীশূরে অল্পকালীন সপ্তবিংশতিতম দর্শনকংগ্রেসে Logic and Meta-physics শাখার সভাপতিত্ব করেন।

কলেজের সঙ্কীর্ণ পরিধির বাইরে বৃহত্তর জ্ঞানসাধনায় আমাদের অধ্যাপকদের আগ্রহ কত গভীর তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আমাদের ভূজ্ঞানবিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনিশীথরঞ্জন করের হিমালয়ের হিমবাহ-সম্বন্ধীয় গবেষণায় আত্মনিয়োগ। তাঁরই নেতৃত্বে তিন বৎসর গবেষণার পর ভারতীয় ভূগোলবিদগণ গত বৎসর পূর্ব-হিমালয়ে এক কোটি বৎসর পূর্বে বিশ্বব্যাপী হিমানীযুগের অস্তিত্বের ব্যাপক প্রমাণ পেয়েছেন। এই বিচিত্র তথ্য আবিষ্কারে শ্রীযুক্ত করের মূল্যবান অবদান আমাদের কলেজের গৌরবের বস্তু। আমরা তাঁকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করে তাঁর বৃহৎ গবেষণার সাফল্যময় পরিণতি কামনা করি।

আমাদের কলেজের বিজ্ঞানশাখার নানা বিভাগে অত্যন্ত বৎসরের অল্পরূপ পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অল্পমোদিত পরিকল্পনামুহাযী বিবিধ গবেষণা-কার্য পরিচালিত হচ্ছে। গত 'প্রতিষ্ঠা দিবসে' প্রকাশিত 'প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী'তে ১৯৫২ সালে এই কলেজে পরিচালিত গবেষণাকার্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে।

* * *

গত সংখ্যায় ১৯৫২ সালের আই, এ এবং আই, এমসি পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে আমাদের কলেজের কৃতী ছাত্রদের নাম প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু পাসের হার জানানো সম্ভব হয় নি। আমরা পরে জেনেছি, এই দুইটি পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রদের পাসের হার যথাক্রমে ৮২.৩৬% এবং ৮৭.৩৬%। গত বি, এ ও বি, এমসি পরীক্ষার ফলও সমস্তোৎসাহক। বি, এ-তে প্রথমশ্রেণীর অনার্স পেয়েছেন ২ জন এবং বি, এমসিতে ১৮ জন। আর্টসে স্নাতকদের মধ্যে আমাদের ইতিহাসের ছাত্র শ্রীমান্ অশিনরঞ্জন দাশগুপ্ত দীর্ঘকালীন লাভ করে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। বিজ্ঞানে গণিতের ছাত্র শ্রীমান্ সুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় আমাদের কলেজের এবং সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিজ্ঞানপরীক্ষার্থীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। তাঁদের সাফল্যে আমরা গর্বিত। অর্থনীতি, ইতিহাস, গণিত এবং ভূতত্ত্বে আমাদের কলেজ শুধু প্রথমস্থান অধিকার করেছে তা নয়, প্রথমশ্রেণীর অনার্স লাভ করেছেন অর্থনীতিতে তিনজন, ইতিহাসে তিনজন, গণিতে সাতজন এবং ভূতত্ত্বে সাতজন।

সমগ্ৰপ্রকাশিত ১৯৫২ সালের এম, এ ও এম, এমসি পরীক্ষার ফলাফল যতদূর আমরা অবগত হয়েছি তাতে আমাদের কলেজ থেকে অন্ততঃপক্ষে এম, এ তে সাত জন এবং এম, এমসিতে ছয় জন প্রথমশ্রেণীতে স্থান পেয়েছেন। ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূ-জ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, সংখ্যা-বিজ্ঞান এবং ভূ-বিজ্ঞান আমাদের কলেজ প্রথমশ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করেছে। এবিষয়ে তথ্য অসম্পূর্ণ, সেইজগৎ ত্রুটি থাকা সম্ভব।

পরীক্ষার ফলাফলের পূর্ণতর বিবরণ অগতঃ দ্রষ্টব্য।

* * *

আমাদের কলেজের একজন বিশিষ্ট প্রাক্তন অধ্যাপককে স্মরণ করে অভিনন্দনের শুভ-স্বচনার স্বযোগ এবার আমরা পেয়েছি। স্বনামধন্য ঐতিহাসিক শ্রীকুরুভিলা জ্যাকারায়ার সঙ্গে আমাদের কলেজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সুবিদিত। সম্প্রতি UNESCOর পরিকল্পিত মানব-জাতির ইতিহাসসঙ্কলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করার জন্ত তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন। এই বিরাট ইতিহাসের যষ্ঠ খণ্ড (বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) রচনার ভার তাঁর উপরে হস্ত হয়েছে। তাঁর অননুসারধারণ পাণ্ডিত্যের এই আন্তর্জাতিক সমাদরে আমরা গর্বিত। শিক্ষকজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে শ্রীযুক্ত জ্যাকারায়ার দিল্লীতে পররাষ্ট্রদপ্তরের ঐতিহাসিক শাখার পরিচালকপদে অধিষ্ঠিত হন। সম্প্রতি আমরা জানতে পেলাম তিনি এই পদ থেকে অবসরগ্রহণ করছেন।

উল্লিখিত মানবজাতির ইতিহাসসঙ্কলনকার্ণে অংশ গ্রহণের জন্ত আমাদের কলেজের একজন যশস্বী প্রাক্তনছাত্রও UNESCOর সাদর আমন্ত্রণ লাভ করেছেন। তিনি হচ্ছেন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। যে আন্তর্জাতিক কমিশনের হাতে UNESCO উক্ত গ্রন্থপ্রকাশের সম্পূর্ণ ভার দিয়েছেন গত বৎসরে অহুষ্ঠিত তার তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মজুমদার সম্পাদকীয় সমিতির সদস্যপদে মনোনীত হন। আমাদের প্রাক্তনছাত্রের এই বিশিষ্ট সম্মানলাভে আমরা গৌরব অহুভব করি। আমাদের কলেজের সঙ্গে শ্রীযুক্ত মজুমদারের সংযোগের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তিনি কলেজের পরিচালকসমিতির একজন প্রাক্তন সদস্য।

সম্প্রতি আমাদের দুজন বিশিষ্ট প্রাক্তনছাত্রের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। শ্রীদিনীপ সেন শুধু আমাদের কৃতী প্রাক্তনছাত্রই নন, এই কলেজে অধ্যাপনাও করেছিলেন কিছুদিন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ উপাধিপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে শিক্ষাক্ষেত্রে পুনরায় যোগদান করেছেন। তাঁর “Speuserian Imitations and Imitators : 1700-1771” শীর্ষক thesis-এর পরীক্ষক ছিলেন Prof. B. W. Davies এবং Prof. James Sutherland—শ্রীযুক্ত সেনের মৌলিকগবেষণা এই দুইজন খ্যাতনামা অধ্যাপকেরই প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাই এবং তাঁর শিক্ষকজীবনে যশোলাভ কামনা করি।

১৯৫২ সালে প্রকাশিত ১৯৫১ সালের I. A. S. ইত্যাদি পরীক্ষার ফলাফলে আমাদের কলেজের যে সব প্রাক্তনছাত্রের সাফল্য ঘোষিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে একজন এই পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, শ্রীস্বধীন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৯৩৭ সালে ১৫ই আগস্টের পর তাঁরই উদ্যোগে বাংলা-অংশের প্রাধাত্যগৌরবে আমাদের কলেজ পত্রিকার নবরূপায়ণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়। বর্তমান প্রচ্ছদপটে বাংলা শিরোনামার রূপসজ্জাও তাঁরই স্বহস্তরচিত।^১ বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্ত গুপ্ত একজন নিপুণ শিল্পী। তাঁর সাফল্য আমাদের বিশেষ আনন্দের বস্তু। তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা হইল।

*

*

*

১। প্রচ্ছদপটের ‘পদ্ম-প্রদীপ’ লাক্ষণ ১৯২৯ সালে প্রাক্তনছাত্র শিল্পী শ্রীচারু রায় রূপায়িত করেন।

গত ডিসেম্বর মাসে বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মৃত্যুতে সমস্ত দার্শনিকসমাজ শোকাভিভূত। আমাদের কলেজের পক্ষে এই শোক অত্যন্ত গভীর। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত দর্শনের অধ্যাপক ও মুখ্যাধ্যাপক এবং রবীন্দ্র-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতিরূপে এই কলেজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তাঁর স্মৃতি আমাদের গর্বের বস্তু। ইংরাজী এবং বাংলায় রচিত অন্যান্য চল্লিশখানি গ্রন্থ—দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, আয়ুর্বেদ, নন্দনতত্ত্ব, সমালোচনা-সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি এবং অবদানের আংশিক নিদর্শন। দেশে বিদেশে তাঁর বিরাট মননশীল প্রতিভা সম্মানিত হয়েছে—পাশ্চাত্য জগতে তাঁর খ্যাতি স্ফুটিত। জীবনের শেষভাগে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসরচনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন—জীবনের শেষ দিনেও তিনি এই স্মৃহং গ্রন্থের পঞ্চমখণ্ডের উপর কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই জ্ঞানসাধকের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

গত জুন মাসে শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্তের মৃত্যুতে এই পত্রিকার শৈশবের স্মৃতির উপর বিষাদের ছায়া এসে পড়েছে। তিনি দ্বিতীয়বর্ষের সম্পাদক ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে তিনি ভারতে এবং ভারতের বাইরে সুনাম অর্জন করেন। ভারত সরকারের অর্থনীতি ও সংযোগ (Communications) দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারিরূপে তাঁর কার্য-কুশলতা ভারতের নানাস্থানে সুখ্যাত। বিলাত এবং আমেরিকাতেও তিনি একাধিকবার ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত Tele-Communications Conferenceএ তাঁরই উদ্ভাবিত পরিকল্পনা বর্তমানে কার্যকরী হয়েছে। ১৯৪৭ সালে তিনি Deputy Auditor-Generalএর পদে উন্নীত হন। কিন্তু শুধু কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠাই মোহিতকুমারের একমাত্র পরিচয় নয়। ধারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁর অসামান্য সৌজয় ও চারিত্রিক মহত্ব তাঁদের মুগ্ধ করেছে এবং মানুষ্য হিসাবে তাঁর স্মৃতি আমাদের বরণ্য।

বিশিষ্ট আইনজ্ঞ পরলোকগত শ্রী আবদুর রহিম আমাদের একজন প্রাক্তনছাত্র। ১৮৮৬ সালে তিনি এই কলেজ থেকে এম্, এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। বিচারকরূপে খ্যাতি অর্জন করে তিনি ১৯২১ থেকে ১৯২৫ সাল অবধি Bengal Executive Councilএর সদস্য নির্বাচিত হন। পরে দীর্ঘকাল তিনি Indian Legislative Assemblyর সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৭ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক D. C. L. উপাধি প্রদান করেন।

কলিকাতার মেয়র এবং বিশিষ্ট সলিসিটর পরলোকগত শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্র আমাদের কলেজের একজন কৃতী প্রাক্তন ছাত্র (১৯০৫-১৯১১)। ১৯১১ সালে তিনি এম্, এ পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথমশ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি বাংলাদেশের বিখ্যাত 'পঞ্চনেত্র গোষ্ঠীর' অগ্রতমরূপে গণ্য হতেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য-পার্টির তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের Incorporated Law Society-র তিনি সভাপতি ছিলেন। শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে এবং আইন ব্যবসায়ই

তঁার পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়। এই সহরে শিল্প এবং সংস্কৃতির সাধনায় তঁার দান কম নয়। সঙ্গীত এবং নাট্যকলার উৎসাহী রসগ্রাহী ছিলেন তিনি।

আমাদের কলেজের এই সকল বিশিষ্ট প্রাক্তনছাত্রদের মৃত্যুতে আমরা গভীর-শোক প্রকাশ করি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

*

*

*

গত কয়েক মাসের মধ্যে দেশে এবং বিদেশে কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষীর মৃত্যুতে শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক জগৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আমাদের দেশে লোকান্তরিত হয়েছেন গান্ধীদর্শনের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা শ্রীকিশোরীলাল মসরুওয়াল্লা, যশস্বী কবি ও সমালোচক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার এবং একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্প্রতি দর্শন-জগতের ক্ষতিই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাশ্চাত্যদেশে বিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক Benedetto Croce এবং আমেরিকা-প্রবাসী স্প্যানিশ দার্শনিক ও সাহিত্যিক George Santayana এই দুইজন মনীষীর তিরোধান বিশ্বের স্মৃতিসমাজের গভীর শোকের বিষয়। সাহিত্য-জগৎ থেকে অপসারিত হয়েছেন বিখ্যাত ফরাসী কবি Paul Eluard এবং বিংশশতাব্দীর অগ্রগণ্য ফরাসী সমালোচকদের অগ্রতম Charles Maurras। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, আইনবিশারদ এবং ভারতের Federal Court-এর সর্বপ্রথম প্রধান বিচারপতি Sir Maurice Gwyer-এর মৃত্যু আমাদের দেশের পক্ষে গভীর শোকাবহ। বহুদিক্ থেকে তঁার কাছে এ দেশের ছাত্র ও শিক্ষকসমাজ গভীরভাবে ঋণী। আধুনিক দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তঁারই অগ্রতম সৃষ্টি। বিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ René Grousset-র মৃত্যুতে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে গভীর ক্ষতি অহুভূত হয়েছে। এই কিছুদিন আগে UNESCO তাঁর উপর মানবজাতির ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড (৪০০-১৩০০ খৃঃ অঃ) রচনার ভার দেন। ইংলণ্ডে পরলোকগত হয়েছেন প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানবিদ, জ্যোতির্বিদ এবং 'Nature' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক Sir Richard Gregory এবং Social Credit Plan-এর প্রবর্তক Clifford Douglas। Israel-এর প্রথম প্রেসিডেন্ট Dr. Chaim Weizmann-এর মৃত্যুতে শুধু রাজনৈতিক জগতেরই ক্ষতি হয়েছে তা নয়। Dr. Weizmann বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকও ছিলেন, রসায়নশাস্ত্রে তঁার অবদান সুপরিচিত। Jerusalem-এর অনতিদূরে Mount Scopus-এর উপর Hebrew University স্থাপনে তঁার প্রচেষ্টাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Josef Stalin-এর সাম্প্রতিক মৃত্যু শুধু ব্যক্তিবিশেষের জীবনাবসান নয়, এই শতাব্দীর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অগ্রতম। পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রের অগ্রতম স্রষ্টা, ত্রাতা এবং কর্ণধাররূপে তঁার অবদান বিশ্ববিদিত—এখানে তা' উল্লেখের অপেক্ষা রাখেনা। অসাধারণ রাষ্ট্রনেতা ছাড়া তিনি এক বিশেষ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন—মাক্সবাদের প্রামাণিক গ্রন্থপঞ্জীর মধ্যে তঁার-লেখা ও বক্তৃতাগুলি এক বিশিষ্টস্থান অধিকার করে আছে।

লোকান্তরিত মনীষীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

*

*

*

‘আমাদের অভাব অভিযোগ’ কলেজ-প্রসঙ্গের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পত্রিকার এই অংশটি একজন প্রাক্তন সম্পাদকের ভাষায় ‘সাময়িক বিলাপ’ (‘periodical wail’)-এই পর্ষবসিত হয়, তবু এটা অপরিহার্য। কতকগুলি অভিযোগ এই পত্রিকার প্রায় জন্মকাল থেকে পুনরাবৃত্ত হয়ে আসচে। এ রকম বড়গোছের অভিযোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য Assembly Hallএর অভাব এবং ছোটখাটো চাহিদার মধ্যে আর্টস্ বিল্ডিং থেকে বেকার ল্যাবরেটরী পর্যন্ত একটি আচ্ছাদিত পথের জন্ম আবেদন। প্রতি বৎসর এত নূতন নূতন অভিযোগ সঞ্চিত হতে থাকে যে এই পুরাতন অভিযোগগুলির সম্বন্ধে ক্লাস্তি এসে পড়া স্বাভাবিক। তবু এই নূতন এবং পুরাতন অভিযোগের মিশ্রস্তুপের ক্রমবর্ধমান ভার-বহন এই পত্রিকার সমন্বয়ী দায়িত্বের অঙ্গ। তবে স্থানাভাব ইত্যাদি কারণে শুধু যেসব অগ্রায় ও অভাবের বিষয়ে কতৃপক্ষ যথেষ্ট সচেতন নন অথচ যার আশু প্রতিকার একান্ত প্রয়োজন তাদের মধ্যে কতকগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আমাদের সম্বন্ধে থাকতে হয়। আমাদের কলেজ থেকে সংস্কৃত পঠনপাঠন তুলে দেওয়া অবশ্যই এই রকম একটি অভিযোগের বস্তু। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে অভিযোগ যথেষ্ট পুরাতন নয়, এই পত্রিকার পাতাতেও নয়। প্রায় তিন বৎসর আগে আমাদের এই শোচনীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে কিন্তু এ পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন দৃঢ় প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়নি বললেই হয়। কিন্তু সরকারের এই ব্যবস্থা নীরবে শিরোধার্য করে নেওয়ার আগে ভেবে দেখা দরকার এতে কলেজের ক্ষতি কতটা হল।

স্বাধীনতালাভের পর জাতীয় সরকারের নির্দেশে দেশের প্রাচীনতম মহাবিদ্যালয় থেকে দেবভাষার চর্চা উন্নীত করে স্থানান্তরে রোপণের এই অশোভন উদ্যমে প্রথমই একটা রুঢ় অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, কারণ ব্রিটিশ বা লীগ আমলেও এই ধরণের অস্বাভাবিক ব্যবস্থা ছিল অচিস্তনীয়। শুধু এই একটি মাত্র বিষয় পড়ে আসার জন্ম এই কলেজের ছাত্রদের যে অস্ববিধা ভোগ করতে হয় তাতে তাদের সংস্কৃত অধ্যয়নের আকর্ষণ বা আগ্রহ কমে আসে। নিরুদ্বেগ পরিবেশে সমাহিতভাবে সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রশস্ত। কিন্তু এ কলেজে একটি ক্লাস থেকে প্রায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে উৎস্বাসে অত্র কলেজে উপস্থিতি জ্ঞাপন করেই তৎক্ষণাৎ এক প্রাচীন সাহিত্যে নিমগ্ন হবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই এই আদর্শের অহুকুল নয়। এই ব্যবস্থায় অন্তর্ধান অপেক্ষা ধাবনই অধিক হয়ে থাকে। আর এই ধাবন শুধু অবাঞ্ছনীয় মানসিক চাঞ্চল্যেরই পোষক তাই নয়, যানবাহনসম্মূল রাজপথ অতিক্রম করার সময় প্রায়শঃ বিপজ্জনকও বটে। দারুণ গ্রীষ্মে ও অবিরাম বর্ষায় রাস্তা পার হয়ে ছুই বাড়ীর মধ্যে ছোট্টাছুটি, ছুই কলেজের ঘড়ির এবং ছুটির অমিলের দরুণ বিশৃঙ্খলা, সংস্কৃতের ছাত্রদের অগ্রাণ্ড ক্লাসে বিলম্ব সসঙ্কোচ প্রবেশ এবং তার দরুণ ক্লাসের কাজে বিঘ্ন—এই সব নানারকম বিভ্রমনার কথা ভাবলে স্বতঃই মনে হয় সরকার যেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের আভাসে

বলে দিচ্ছেন, 'সংস্কৃত পড়ো না।' অথচ এই অদ্ভুত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল নাকি সংস্কৃত অধ্যয়নের উন্নতিসাধন! সংস্কৃত পড়ার উৎসাহ এমনিতেই আজকাল ক্ষীণ হয়ে আসছে। তার উপর যে ব্যবস্থার ফলে প্রদেশের শ্রেষ্ঠ কলেজের ছাত্রদের সংস্কৃতকে পাঠ্যবিষয়রূপে গ্রহণের উত্তম স্বভাবতঃই হ্রাস পায় তার সাহায্যে এই উদ্দেশ্য কিভাবে এবং কতটা সাধিত হবে বোঝা কঠিন।

এ ছাড়া, সংস্কৃত কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের সংমিশ্রণের ফলে যে ব্যাপক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে তার কথা ভাবলে এই পরিকল্পনার বৃহত্তর ব্যর্থতা উপলব্ধি করা যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে যেসব ছাত্র প্রবেশলাভ করেন তাঁদের প্রয়োজনের মান যে সাধারণের থেকে ভিন্ন একথা মেনে নেওয়া যায়। ফলে এই কলেজে যেসব ক্লাসে সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা যোগদান করেন সেই সব ক্লাসে অধ্যাপক এক সমস্তার সম্মুখীন হন। তিনি যদি তাঁর নিজের ছাত্রদের কথা ভাবেন তাহলে তাঁকে ক্লাসে উপস্থিত অল্প এক শ্রেণীর ছাত্রদের উপেক্ষা করে পড়াতে হয়। এতে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের কোন উপকারই হয় না। আবার যদি অধ্যাপক সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের উপকারে আসতে চান তাহলে তাঁকে স্বাভাবিক স্তর থেকে নেমে আসতে হয়—এতে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা অতৃপ্ত থেকে যান। নিয়ত শিক্ষার এই ভিন্নমানের দ্বন্দ্ব অধ্যাপক এবং ছাত্র উভয়েই ব্যর্থতার ক্লাস্তিকে স্বীকার করে নেন। শিক্ষার উন্নতমানের যে ঐতিহ্য আমাদের গর্বের বস্তু তার এই নীরব অবক্ষয় গভীর আক্ষেপের বিষয়।

পরিশেষে আমাদের প্রার্থনা এই যে অন্ততঃপক্ষে ইন্টারমিডিয়েট এবং বি, এ পাস কোর্সের সংস্কৃতপাঠ যেন আমাদের কলেজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রাচীন শিক্ষায়তনে দেবভাষার শূন্য আসনের অকল্যাণ আংশিকভাবেও দূর হোক।

লাইব্রেরি সম্বন্ধে অভিযোগ 'কলেজপ্রসঙ্গে' নূতন নয়। এই লাইব্রেরি আমাদের গৌরবের বস্তু এবং সেইজন্য এই মূল্যবান সম্পদের অবহেলা অসহ্য। যেখানে ব্যথা সেখানে বারবার হাত পড়ে। সরকারী কলেজের অঙ্গ হয়ে থাকা এই লাইব্রেরির উন্নতির পথে সহায়ক না হয়ে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী কতৃৎস্বের চাপে লাইব্রেরিকে অসহায়ভাবে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তার দুটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

লাইব্রেরিতে অনেক মূল্যবান দুপ্রাপ্য বই আজ পুরাতন জীর্ণ হতে চলেছে। সেগুলির সংরক্ষণের জন্ত নূতন বাঁধাইএর প্রয়োজন। প্রতিদিনই এই রকম বইএর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সরকারী কলেজ বলে বই বাঁধাতে পাঠাতে হয় আলিপু্রে সরকারী দফতরী-খানায়। দেশবিভাগের পর দু বছর ধরে দফতরীখানায় বিশৃঙ্খলার দরুণ কলেজ থেকে বই বাঁধানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপরেও প্রার্থনা প্রথমে প্রত্যাখ্যাত হয়, শেষে একসঙ্গে পঞ্চাশটির বেশী বই বাঁধানো যাবে না এই আদেশ আসে। অনেক আবেদন নিবেদন করে এই একদফায় প্রেরণযোগ্য বইএর সংখ্যা একশত করানো হয়েছে। এই বই বাঁধিয়ে ফিরতে

সময় লাগছে এক বছর থেকে দু বছর। যতক্ষণ না একদফা বই বাঁধিয়ে আসতে ততক্ষণ অল্প কোন বই পাঠানো যাবে না। উপস্থিত লাইব্রেরিতে হাজার সাতেক বই-বাঁধানোর জরুরী প্রয়োজন। বর্তমান হারে এই সব বই বাঁধাতে সময় লাগবে সত্তর থেকে একশো চল্লিশ বছর! স্থানীয় দফতরীদের বই বাঁধাতে দেওয়ার অহুমতির জগৎ বহু অহুন্নয় করা সত্ত্বেও উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের সম্মতি পাওয়া যায় নি। কিন্তু এতে যে বহু পুরাতন দুস্প্রাপ্য বই নূতন বাঁধাইএর অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়ে সরকারেরই মূল্যবান সম্পত্তির অপূরণীয় ক্ষতি হবে উর্ধ্বতন কতৃপক্ষ সে বিষয়ে উদাসীন।

লাইব্রেরির সম্পত্তি নষ্ট হতে দেওয়ার আর এক উপায় উর্ধ্বতন কতৃপক্ষ উদ্ভাবন করেছেন আর্টস লাইব্রেরিতে বই রাখার বর্তমান অদ্ভুত ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে। ষ্ট্যাকসে আলো-বাতাসের পথ রুদ্ধ—বছর পঁচিশ আগে বই রাখার জগৎ ষ্টীলগ্যালারীর ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু খেয়াল হয়নি আলো-বাতাস চলাচলের বন্দোবস্ত করা দরকার। এই অবহেলার ফল এখন আমরা ভোগ করছি—বন্ধ জায়গায় গাদা থেকে অনেক মূল্যবান বই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, লাইব্রেরির কর্মচারীদের স্বাস্থ্যহানিও হচ্ছে ঐখানে বসে কাজ করতে। কিছুদিন আগে একজন বিশ্বস্ত কর্মদক্ষ কর্মচারীর অকালমৃত্যুর অগ্রতম কারণ ঐ রকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দিনের পর দিন কাজ করে যাওয়া। এই ধরণের ঘটনায় অগাধ কর্মচারীদের মধ্যে ভীতি ও উত্তমহীনতার সঞ্চার হয়েছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জগৎ হয় বৎসরের অধিক আবেদন নিবেদন চলছে। দেয়ালে বড় বড় গর্ত করে বায়ুপ্রবেশের উন্নততর ব্যবস্থার পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয়েছিল। অবশেষে ১৯৫১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে অহুমোদন পাওয়া গেল। কিন্তু তখন সরকারের আর্থিক বৎসর শেষ হতে আর দিন সাতেক বাকী। সরকারী কলেজ, অতএব এসব কাজের মালিক হলেন P. W. D.—তঁারা অবশ্যই জানালেন সাতদিনে কিছু করা সম্ভব নয়। পরের আর্থিক বৎসরে আবেদন করে আবার অহুমোদন এল। এবার P. W. D.র লোকেরা এসে আবিষ্কার করলেন পরিকল্পনায় কিছু কারিগরী গলদ আছে, অথচ পরিকল্পনাটি ছিল তাঁদেরই রচিত। পরিকল্পনাসংশোধনের জগৎ সেই যে তাঁরা চলে গেছেন আর কোন সার্ভিশ নেই। ইতিমধ্যে বই যথেষ্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকারী কলেজের লাইব্রেরির এমনিই সৌভাগ্য!

গত কয়েক বৎসর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলের গেজেটপ্রকাশে বিলম্ব ধৈর্ষের মাত্রা অতিক্রম করে চলেছে। এই বিলম্বের একটা নমুনাই যথেষ্ট হবে—১৯৫১ সালের মে মাসে অক্টোবর বি, এ এবং বি, এন্স সি পরীক্ষার ফলাফল গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে। যাঁদের বি, এ পাশ করার পরেই কর্ম-সংস্থানের চেষ্টা করতে হয় বা যাঁরা তখন কর্মজীবনে প্রবেশ না করলেও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা স্থির করতে ইচ্ছুক হন তাঁদের আশু প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য এই গেজেট ছাড়া আর কোথাও মেলে না। পরীক্ষার যে মোটামুটি ফলাফল প্রথমে প্রকাশিত হয় তাতে পরীক্ষোত্তীর্ণদের স্থানাহুক্রম,

বৃত্তিলাভ, পদক বা পুরস্কার প্রাপ্তি ইত্যাদির কোন বিবরণ থাকে না। এই সব খবরের জ্ঞান যদি এতদিন অপেক্ষা করতে হয় তাহলে বহু ছাত্রের ভবিষ্যৎ অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বিড়ম্বনার মূলেও আছে সরকারী হস্তক্ষেপের অবশ্যস্বাভাবী কুফল। সরকারী প্রেসের উপর গেজেট প্রকাশনার ভার দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজকে এই বিপর্যয়ে জড়িত করেছে। আমাদের প্রার্থনা, অযথা বিলম্ব না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রেস থেকে পরীক্ষার ফলাফলের গেজেট ছাপানোর ব্যবস্থা হোক।^১

বাংলাদেশের ছাত্রদের বিভিন্ন পরীক্ষায় ব্যাপক এবং দ্রুত অবনতি লক্ষ্য করে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃমণ্ডলী উদ্বোগাকুল হয়ে উঠেছেন। Public Service Commissions এর কাছে তাঁরা ইদানীং এ বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধানও করেছেন। এই পত্রিকার রজত-জয়ন্তী সংখ্যায় খ্যাতনামা প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীহিরণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় “Presidency College—1924-1938” শীর্ষক প্রবন্ধে ১৯৩০-৩৮ সালের মধ্যে নানাদিকে ব্যয়সংকোচ ও ছাঁটাই সত্ত্বেও আমাদের কলেজের অধ্যাপক সংখ্যা অক্ষয় থাকার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—“It has enabled us to separate the honours classes entirely from the pass and to inaugurate a scheme which aims at giving special assistance to promising under-graduates who intend to appear in the public service examinations after taking their degrees.” এই পরিকল্পনা সেই সময় কিছুদূর কার্যকরী হয়েছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু বর্তমানে এর অস্তিত্ব নেই। যখন এই পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হয়েছিল তখনকার চেয়ে এখন এর প্রয়োজন অনেক বেশী। কারণ, প্রথমতঃ শিক্ষার মান অনেক নেমে গেছে; দ্বিতীয়তঃ, Public Service Commissions এখন কর্ম-সংস্থানের অনেক বেশী রাস্তা খুলে দিয়েছে। আমাদের কলেজের সেরা ছাত্রদের অনেকেই I. A. S. প্রভৃতি পরীক্ষার জগৎ প্রস্তুত হতে চান। গত কয়েক বছর এই সব পরীক্ষার ফলাফল আমাদের কলেজের পক্ষে নৈরাশ্র জনক। উল্লিখিত প্রবন্ধে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী মন্তব্য বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য—

Candidates appearing in these examinations from Bengal are handicapped for want of proper coaching facilities and it is in the fitness of things that Presidency College with its splendid resources should take the lead in this matter.

আমরা কর্তৃপক্ষকে অতীতের পরিকল্পনাকে অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় কার্যে পরিণত করার কথা বিবেচনা করতে অনুরোধ করি।

*

*

*

১। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ধ্যাপ্রকাশিত এম্, এ এবং এম্, এম্ সি পরীক্ষার ফলাফলে কতকগুলি বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের ক্রমিক স্থান নির্দেশ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এইটাই সঠিক প্রণালী। অস্বাভাবিক সমস্ত বিষয়ে এবং অনার্স পরীক্ষাগুলির সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়।

‘অভাব অভিযোগের’ দীন আবৃত্তির মধ্যে একমাত্র সাঙ্ঘনা পাওয়া যায় এই ভেবে যে আমাদের কলেজের অধ্যক্ষপদ ধারা অলঙ্কৃত করেছেন তাঁদের অনেকেই কলেজের বৃহত্তর অভাবের সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করেছেন—ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় আঘাত পেয়েছেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য পরলোকগত অধ্যক্ষ জেম্‌স্‌। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের নবকলেবরের স্বপ্ন দেখেছিলেন—কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের আকস্মিক উৎপাতে তাঁর উদ্ভাবিত পরিকল্পনার অপমৃত্যু ঘটে। ১৯২৫ সালে বিশ্বযুদ্ধের দুঃস্বপ্নের ঘোর যখন অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে তখন প্রতিষ্ঠা-দিবসে লর্ড লিটনের বাণীতে সঞ্জীবনী মন্ত্রের আভাস পাওয়া গেল। তৎকালীন অধ্যক্ষ Stapleton এবং তাঁর পরবর্তী কয়েকজনের উত্থোগে অধ্যক্ষ জেম্‌সের Improvement Scheme এর কিছু কিছু অংশ কার্যে পরিণত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে কলেজের অনেক নূতন অভাবও দেখা দিয়েছে—অথচ পুরাতন পরিকল্পনার বৃহৎস্থ স্ববিরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। অধ্যক্ষ শ্রীভূপতিমোহন সেন একবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলোড়নে আবার সব আশা নিমূল হল। আজ দেশের স্বাধীনতালাভের পরও পাঁচ বৎসর কেটে গেছে। ব্যর্থতার এই দীর্ঘ ইতিহাসের পরিসমাপ্তির জন্ম এই কলেজের সকল শুভাহুধ্যায়ীর ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। সম্প্রতি কলেজের সর্বাঙ্গীণ সম্প্রসারণের একটি বৃহৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে আমাদের অধ্যক্ষের আত্মনিয়োগে আবার আমাদের মনে আশার সঞ্চার হচ্ছে। কিন্তু এই সংখ্যার পুরোভাগে তাঁর প্রদত্ত বাণীতে এই পরিকল্পনার উল্লেখ করে তার সাফল্যের সম্ভাবনার বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তা স্মরণ রাখতে হবে। এই পরিকল্পনা এখনও অসম্পূর্ণ, সেইজন্ম এর বিস্তারিত আলোচনা এখন সম্ভব নয়। তবু বর্তমান সম্পাদকের অহুরোধে অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁর পরিকল্পনার অংশবিশেষ প্রকাশ করেছেন। নীচের বিবৃতি থেকে তার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হতে পারে।

এই পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে কলেজের অবয়বে অঙ্গসংস্থানের বর্তমান বৈষম্য দূর করে আর্টস্‌ এবং বিজ্ঞানশাখার বিভিন্ন বিভাগের স্তম্ভসমূহ স্বতন্ত্র বুদ্ধিলাভের পথ স্বগম করা। কলেজে প্রবেশ করলেই একটা মস্ত বড় অসঙ্গতি চোখে পড়ে—আর্টস্‌ বিল্ডিংয়ের দ্বারদেশে রসায়নের বিরাট পরীক্ষাশালার অবস্থিতি! রসায়নের উপস্থিতি এই সৌধে সর্বব্যাপী—একতলা, দোতলা, তিনতলায় এর বিস্তৃত আধিপত্য। রসায়নের ল্যাবরেটরিগুলি চারিপাশেও বেষ্টিত করে আছে। এই অতিকায় অতিথিকে জায়গা দিতে গিয়ে আর্টস্‌ বিষয়-গুলি স্বরাজ্যে থেকেও সঙ্কচিত। সেইজন্ম বর্তমান পরিকল্পনা অহুধ্যায়ী প্রথম সংস্কার হবে রসায়নবিভাগকে একটা নিজস্ব বাড়ী দিয়ে এখানকার শূন্য স্থানে আর্টস্‌য়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিষ্ঠা। রসায়নবিভাগের নূতন বাড়ী হবে আমাদের খেলার মাঠের পশ্চিমপ্রান্তে। এদিকে আর্টস্‌ বিল্ডিংয়ের একতলায় ছাত্রদের সুপারিসর বিরামপীঠিকার এবং পরিকল্পিত School of Economics-এর আংশিক সংস্থান হবে। দোতলায় বর্তমান অর্থনীতি সেমিনার রূপান্তরিত হবে ছাত্রীদের বিরামাগারে। তার পাশেই অবস্থিত Chemistry

gallery ছুটিতে ইতিহাসবিভাগের বক্তৃতা-কক্ষ এবং সেমিনারের স্থান করা হবে। কলেজের অফিস তাহলে ছাত্রীদের বর্তমান বিরামপীঠিকা থেকে ইতিহাসের বর্তমান সেমিনার ঘর পর্যন্ত বিস্তৃত হবার অবকাশ পাবে।

এই পরিকল্পনার বৃহত্তম নির্মাণসংকল্প হচ্ছে আর্টস্ বিল্ডিংয়ের পিছনে যেখানে এখন Physical Chemistry Laboratory অবস্থিত সেইখানে এক বিরাট চারতলা বাড়ী তৈরী করা এবং মধ্যবর্তী চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণে (quadrangle) যেখানে টিন-আচ্ছাদিত রসায়ন পরীক্ষাগৃহগুলি অবস্থিত সেখানে আমাদের বহু আকাজক্ষিত Assembly Hall নির্মাণ। নূতন যে বাড়ী তৈরী হবে, চারতলা হলেও তার উচ্চতা বর্তমান আর্টস্ বিল্ডিংয়েরই সমান হবে। সংলগ্ন অটালিকা ছুটির বিভিন্ন তলার অসম উচ্চতার জন্ত সোপানের সাহায্যে সংযোগ স্থাপিত হবে। নূতন বাড়ীর একতলায় একটি বৃহৎকক্ষে ছাত্রদের ব্যায়ামাগার এবং অবশিষ্ট স্থানে School of Economicsএর বৃহত্তর অংশ স্থাপিত হবে।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী যদি এই কলেজে আর্টসের স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলার কল্পনা কার্যে পরিণত হয় তাহলে অধ্যাপকসংখ্যার প্রভূত বৃদ্ধি প্রয়োজন হবে। ফলে অধ্যাপকদের বিরামপীঠিকার আয়তনও বাড়তে হবে ২০নং ঘর পর্যন্ত একে বিস্তৃত করে। এই একই কারণে শুধু বর্তমান আর্টস্ বিল্ডিংয়ের দোতলা এবং তিনতলায় অবশিষ্ট জায়গায় বিভিন্ন বিষয়ের বক্তৃতাকক্ষের যথেষ্ট সংস্থান অসম্ভব। সেইজন্ত নূতন বাড়ীর দোতলা, তিনতলা এবং চারতলায় নবপরিকল্পিত গবেষণাবিভাগগুলিকে এদের সঙ্গে স্থান বণ্টন করে নিতে হবে। এই সাংঘর্ষ উভয়ের পক্ষে শুভই হবে।

আমাদের আর্টস্ লাইব্রেরির স্থানাভাব দূর করার জন্ত পাঠ-গৃহের পশ্চাদ্ভাগে সামান্য সম্প্রসারণ এবং ছাত্রদের বর্তমান বিরামপীঠিকাটি বই রাখার জন্ত ব্যবহার করতে দেওয়ার বেশী কিছু বর্তমানে করা সম্ভব নয়। তবে ভবিষ্যতে লিফ্টের ব্যবস্থা হলে নূতন বাড়ীর সর্বোচ্চতলে লাইব্রেরি স্থানান্তরিত করা সম্ভব হতে পারে। পার্শ্ববর্তী উদ্ভিদবিভাগের কিছু অংশ আন্সসাং করে সায়েন্স্ লাইব্রেরির খানিকটা প্রসার সম্ভব।

বেকার ল্যাবরেটরীতে অবস্থিত ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা এবং শারীরবৃত্তবিভাগের সম্প্রসারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে এবং নবপ্রতিষ্ঠিত সংখ্যাবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানবিভাগ ছুটিরও পরিসর বাড়ানো দরকার। এই সব বিভাগের অতিরিক্ত সংস্থানের জন্ত একটি চারতলা বাড়ীর পরিকল্পনা সরকারের কাছে ইতিমধ্যেই নিবেদিত হয়েছে। এই বাড়ী তৈরী হবে বেকার ল্যাবরেটরীর পশ্চিমে উদ্ভিদ-উত্থানের স্থানে। কলেজের পশ্চিম প্রাচীরের প্রান্ত অবধি হবে এর বিস্তৃতি। প্রস্তাবিত রসায়নসৌধের সঙ্গে এটি লম্বভাবে অবস্থান করবে, অর্থাৎ ছুটি বাড়ীর সংলগ্নরূপ হবে L-আকৃতি—অবশ্য উপস্থিত পরিকল্পনা অনুযায়ী মধ্যে প্রায় ৫০।৬০ ফিট ব্যবধান থাকবে। এই ছেদ পূর্ণ করার কথা ভবিষ্যৎ প্রয়োজনানুসারে বিবেচ্য।

Astronomical Observatory-এর নীচে অবস্থিত সব ঘর কলেজ ইউনিয়নকে দেওয়া হবে বিভিন্ন ছাত্রসচিবদের ব্যবহারের জন্ত। কলেজের নিম্নতন কর্মচারীদের নূতন বাসস্থান নির্মিত হবে আর্টস্ লাইব্রেরির পশ্চিমে জীর্ণ প্রাচীর বরাবর।

আমাদের কলেজের অধ্যক্ষের বাসগৃহ কলেজের সংলগ্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। খেলার মাঠের উত্তর-পশ্চিম কোণে অধ্যক্ষবাস নির্মিত হবে।

এই সংখ্যায় এই স্মৃহং পরিকল্পনার আংশিক প্রকাশ হল। কোন সংখ্যায় তার পূর্ণ বাস্তব পরিণতির শুভসংবাদ প্রকাশিত হবে তা সরকারই জানেন।

সাক্ষেতিক সাহিত্য

তপনকুমার বন্দোপাধ্যায়—ষষ্ঠ বর্ষ, বাংলা

পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে বিশিষ্ট form বা রচনাশিল্প আমাদের দেশের সাহিত্য-ভূমিতে আসিয়া স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে, “সাক্ষেতিক সাহিত্য” বা “Symbolic Literature” তাহাদের মধ্যে অগ্রতম। ট্র্যাজেডি, নভেল, রোমান্স প্রভৃতি রচনাশিল্পের গ্রায় সাক্ষেতিক সাহিত্যও আমাদের দেশে একেবারে নূতন আমদানী। বরঞ্চ বলা চলে যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অগ্ৰাঙ্গ শিল্প-রীতি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেও হয়তো ছদ্মবেশে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু Symbolic Literature-এর যে অভিনব রূপ পাশ্চাত্য সাহিত্যে দেখিতে পাই তাহা আমাদের সাহিত্যে ইতিপূর্বে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

বলাই হয়তো বাহুল্য, পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই সাক্ষেতিক সাহিত্যের অভ্যুদয় খুব বেশী দিন হয় নাই। কিন্তু এই সাহিত্য-শিল্পটি সাহিত্যসমালোচনার আসরে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। কেহ ইহাকে সাহিত্যের একটি অপকৃষ্ট অক্ষম প্রয়াস বলিয়া গাল পাড়িয়াছেন, কেহ বা ইহার আবেদনে মুগ্ধ হইয়া ইহার স্তুতি গাহিয়াছেন। কার্লাইল তো স্পষ্টই বলিয়াছেন—

“It is in and through symbols that man, consciously or unconsciously, lives, works, and has his being; those ages, moreover, are accounted the noblest which can best recognise the symbolic worth and prize it highest.”

যাহা হউক, এই নিন্দা-স্তুতির বাহিরে থাকিয়া আমরা এখানে সাক্ষেতিক সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করিব।

“সাক্ষেতিক,” এই শব্দটির সহিত আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে, তাই “সাক্ষেতিক সাহিত্য”—এই কথাটি শুনিলে আমরা তাহার একটা সাধারণ অর্থ বুঝিতে পারি। আমরা

মোটামুটি বুঝি, “সাম্প্রতিক সাহিত্য” হইল সেই সাহিত্য, যাহার দ্বারা কোন কিছুর একটি সূক্ত দেওয়া হয়। “কোন কিছুর একটি সূক্ত”, সাম্প্রতিক সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে ইহা একটি মূল্যবান কথা। কথাটিকে ব্যাখ্যা করা যাক।

সূক্ত অর্থে আমরা কি বুঝি? সূক্ত অর্থে বুঝি ইঙ্গিত, ইশারা। স্টেশন হইতে ট্রেন ছাড়িবে, নীল আলোটি জ্বলাইয়া দেওয়া হইল। এই নীল আলোটি একটি সূক্ত। যেখানে সেখানে নীল আলো দেখিলেই মনে করি না যে ট্রেন ছাড়িতেছে; একটি বিশেষ সন্নিবেশের মধ্যে নীল আলোটি ট্রেন ছাড়ার ঘটনাকে নির্দিষ্ট করিতেছে। অর্থাৎ নীল আলোর কোন একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র অর্থ থাকিতে পারে, যাহা সর্বত্রই এক কিন্তু যখন একটি বিশেষ সন্নিবেশের মধ্যে তাহাকে দেখি, তখন তাহা একটি বিশিষ্ট অর্থগৌরব লাভ করে। তখন নীল আলোটিকে বলি, ইহা একটি সূক্ত। তাহা হইলে দেখি, যখন কোন একটি বিষয় অপর একটি বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার জন্ত আপনার নিজস্ব অর্থটিকে কিয়ৎ-পরিমাণে বিসর্জন দিয়া সেই বিষয়ান্তরের অর্থটিকে প্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলি সূক্ত। এই যে এক বিষয়ের দ্বারা বিষয়ান্তরের অর্থ প্রকাশ ইহাই সূক্ত। যুদ্ধ সূত্র হইবে, শঙ্খ ধ্বনি হইল; এখানে শঙ্খের ধ্বনি যুদ্ধের সূচনাকে প্রকাশ করিতেছে, ইহা তাই যুদ্ধের সূক্ত।

এখন যদি এই বিষয়ান্তরের অর্থপ্রকাশের চেষ্টায় বিষয়টি আপনার স্বতন্ত্র অর্থটিকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলে তখন তাহা প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। শঙ্খের ধ্বনি যুদ্ধের সূচনাকে প্রকাশ করিলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে আপনার অর্থ হারাইয়া ফেলিতেছে না। আমরা এখানে প্রথমে শঙ্খের অর্থটিকে গ্রহণ করি, তাহার পর যুদ্ধের পরিবেশের সহিত তাহাকে সম্বন্ধযুক্ত করিয়া তাহার অর্থকে অতিক্রম করিয়া বিষয়ান্তরের অর্থে চলিয়া যাই। এখানে তাই শঙ্খধ্বনি যুদ্ধসূচনার প্রতীক নহে, সূক্তমাত্র। কিন্তু যখন একজন রাজার দূত আসিয়া আর এক রাজার কাছে স্বর্ণপাত্র মুক্ত রূপাণ ও পুষ্পমালা একত্রে মেলিয়া ধরিল এবং রাজাকে কোন একটি গ্রহণ করিতে বলিল, তখন বুঝি যে পুষ্পমালাটি সন্ধির প্রতীক, তলোয়ারটি সংগ্রামের। এখানে পুষ্পমালা ও তলোয়ারের স্ব স্ব অর্থ নাই; ইহারা আপনাপন অর্থ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

এইরূপে দেখি সূক্ত ও প্রতীকের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা প্রকৃতিগত নয়, পরিমাণগত। সূক্তের বিষয়টি যদি এমন গভীরভাবে বিষয়ান্তরের ইঙ্গিত করে যে উপযুক্ত সন্নিবেশের অভাব সূক্তও বিষয়ান্তরের অর্থটি পরিস্ফুট হয়, তখন তাহা প্রতীকে পরিণত হয়। এইরূপে দেখি, কাঠের শ্লোব পৃথিবীর প্রতীক, লরেল গাছের পাতা জয়ের প্রতীক, চরকা কংগ্রেসের প্রতীক, সাম্যবাদীদের পতাকা কান্তে ও হাতুড়ি চাষী-মজুরের প্রতীক। প্রতীকগুলি স্থানিক ও কালিক প্রয়োজনে গড়িয়া ওঠে, প্রতীকের অন্তর্নিহিত অর্থ যতই যুক্তিপূর্ণ ও সহজবোধ্য হয়, ততই স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ প্রতীকগুলি সর্বজনীন ও সর্বকালীন হইয়া উঠে।

এই প্রতীক আবার দুই শ্রেণীর। একপ্রকার প্রতীক আছে যাহাতে বিষয় ও বিষয়ান্তরের সম্বন্ধটি অতিশয় স্পষ্ট এবং স্মৃতিপূর্ণ। সেখানে অর্থটিকে ব্যাখ্যা করা যায় এবং প্রতীকটিকে বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হয় না। আর এক শ্রেণীর প্রতীক দেখিতে পাই যেখানে বিষয় ও বিষয়ান্তরের মধ্যকার যোগসূত্রটি লোকমানস হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সেখানেও প্রতীকটি একটি বিষয়ান্তরের ইঙ্গিত করে, কিন্তু উভয়ের অন্তঃস্থিত সম্বন্ধটিকে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার দ্বারা অপরের বোধগোচর করা যায় না। দশভূজার মূর্তি যে দশদিকব্যাপী শক্তির প্রতীক তাহা যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু শালগ্রামশিলা কিরূপে সহস্র-পদ, সহস্র-শীর্ষের প্রতীক হইতে পারে তাহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে পারি না। জীবনের সহিত ব্যবহারে মানবমন সাধারণতঃ যুক্তি খোঁজে। যেখানে এই যুক্তিকে বিস্মৃত হইয়া অথবা অস্বীকার করিয়া জীবনকে শুধু মাত্র একটি সহজ বিশ্বাসে গ্রহণ করি, সেখানে আমাদের ব্যবহারটি সংস্কারে পরিণত হয়। প্রথম শ্রেণীর যে প্রতীকের কথা বলিলাম তাহার আবেদন আমাদের যুক্তিবাদী মনের কাছে, এবং আর এক শ্রেণীর প্রতীকের আবেদন আমাদের সংস্কারগত মনের কাছে। হিন্দুর মণীর সিঁথির সিঁধুর তাহার স্বামীর দীর্ঘায়ুর প্রতীক। কিন্তু এই প্রতীকের অর্থটিকে যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। যে দেশের রমণীরা সিঁধুর ব্যবহার করে না, তাহাদিগকে যুক্তির দ্বারা বুঝানো যাইবে না যে ওই লাল রঙের চূর্ণটির সহিত একজনের দীর্ঘজীবনের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে। এই প্রতীকটির আবেদন আমাদের সংস্কারগত মনের কাছে। সেই সংস্কারের অভাবে প্রতীকটির আবেদন অল্প মনের নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর প্রতীকটি তাই যত বিশ্বজনীন হইয়া উঠে, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীকটি দেশে ও কালে সীমাবদ্ধ থাকিয়া সে পরিমাণে বিশ্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে না।

প্রতীকের এই যে দুইটি প্রকার ভেদের কথা বলিলাম, ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য সন্দেহও একই শব্দের দ্বারা উভয়কে আখ্যাত করা হয়। এখানে আলোচনার সুবিধার জন্ত দুইটি নামের দ্বারা ইহাদিগকে পরিচিত করিব। একটিকে বলিব রূপ-প্রতীক, এই প্রতীকে বিষয়ান্তরের একটি রূপের পরিচয় দেওয়া হয়, সে পরিচয়টি যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের মন সহজে গ্রহণ করিতে পারে; অপরটিকে বলিব ভাব-প্রতীক, এই প্রতীকে বিষয়ান্তরের কোন রূপের পরিচয় স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হয় না, ব্যঞ্জনার দ্বারা তাহার একটি ভাব মনের মধ্যে জাগাইবার চেষ্টা করা হয়, যে ভাবটিকে আমরা যুক্তিদ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া ধরিতে পারি না।

সন্দেহ বা প্রতীক সম্বন্ধে উপরে যাহা বলিলাম সেই দিক দিয়া সাস্থ্যতিক সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইবে। তাহা হইলে কোন একটি সাহিত্য-শিল্পকে কখন সাস্থ্যতিক সাহিত্য বলিব?—সাহিত্যটি যখন কোন একটি বিষয়ের রূপ-প্রতীক অথবা ভাব-প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ সেই সাহিত্যের যাহা প্রত্যক্ষ অবলম্বনীয় বিষয় তাহা যখন অপ্রত্যক্ষ বিষয়ান্তরের ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনা দেয় তখনই তাহাকে সাস্থ্যতিক সাহিত্য বলিতে পারি।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনা দুইভাবে হইতে পারে এবং তাহাতেই সাক্ষেতিক সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ আসিয়া যায়। সাক্ষেতিক সাহিত্যের এই প্রকারভেদের অবতারণার পূর্বে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের ব্যঞ্জনার অবকাশ সাহিত্যে কোথায় সে কথা বুঝিয়া দেখা যাক।

আমাদের জীবনের মোটামুটি দুইটি বিভাগ—একটি বাহিরের, অপরটি ভিতরের। এই বাহিরের বিভাগটি প্রত্যক্ষ রূপ-জগৎ লইয়া আর ভিতরের বিভাগটি অপ্রত্যক্ষ ভাবজগৎ লইয়া। এই অপ্রত্যক্ষ ভাবজগতের আবার দুইটি অংশ; একটি অংশ নির্দিষ্টকে লইয়া, অপরটি অনির্দিষ্টকে লইয়া। যাহা অনির্দিষ্ট তাহা সব সময়েই অপ্রত্যক্ষ। যাহা নির্দিষ্ট তাহার দুইটি পরিচয়—একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় রূপজগতে আর একটি অপ্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের ভাবজগতে, যেখানে রূপেরই একটি ভাবগত অস্তিত্ব রহিয়াছে। সাহিত্যিক তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে এই প্রত্যক্ষ রূপজগৎ অথবা অপ্রত্যক্ষ ভাবজগতের কথা বলিয়া থাকেন। সাহিত্যে যেখানে আমরা এই প্রত্যক্ষ রূপ-জগতকে লাভ করি, সেখানে আমরা সাহিত্যকে বাস্তবায়নগামী বলিয়া থাকি, আর যেখানে সাহিত্যে এই অপ্রত্যক্ষ ভাবজগৎটি প্রকাশ পায়, সেখানে আমরা সাহিত্যকে রোমান্টিক এবং মিষ্টিক বলিয়া থাকি।

এখন, এই অপ্রত্যক্ষ অনির্দিষ্ট জগৎকে আমাদের নিকট উপস্থিত করা, সাক্ষেতিক সাহিত্য সৃষ্টির ইহাই মূল কথা। কার্লাইল বলেন—

“In the symbol proper, what we can call a symbol, there is ever more or less distinctly and directly some embodiment and revelation of the Infinite; the Infinite is made to blend itself with the Finite to stand visible, and, as it were, attainable there.”

এই অপ্রত্যক্ষ অনির্দিষ্টের জন্ম আমাদের জীবনে একটি তৃষ্ণা দেখা যায়। আমাদের মানবস্বভাবেরই আমরা আমাদের অপ্রত্যক্ষ ভাবরাজ্যে একটা অনির্দিষ্টের জগৎ, একটা না-পাওয়ার জগৎ গড়িয়া তুলি। এই জগৎটি আমাদেরই একটি অভিনব আকাঙ্ক্ষা হইতে জাগিয়া উঠে। প্রত্যক্ষ রূপ-জগতের সহিত আমাদের প্রাত্যহিক কারবার, ইহাতে আমরা নির্দিষ্ট কিছুকে লাভ করি, কিন্তু এই নির্দিষ্টকে লইয়া আমরা সন্তুষ্ট থাকি না, আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের অতীতে আরও একটা কিছু অনির্দিষ্টের জন্ম আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলি এবং সেই অনির্দিষ্টকে লাভ করিবার জন্ম ব্যাকুল হই। কিন্তু যাহা অপ্রত্যক্ষ, অনির্দিষ্ট, যাহা নিঃসংশয়ভাবে আমারই একটি বৃহত্তর মানসদ্যানপ্রসূত, তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে লাভ করা যাইবে কি উপায়ে? তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই, কিন্তু তাহার জন্ম তৃষ্ণা জাগাইয়া রাখিয়া আমরা তাহাকে কারবার প্রমাণ করিতে থাকি। এই তৃষ্ণার প্রকৃতিটি আধ্যাত্মিক। সঙ্গীতে, চিত্রে, ভাস্কর্যে আমরা জীবনের এই তৃষ্ণার একটি শিল্প-প্রকাশ দেখিতে পাই; দেখি, শিল্পী কেমন করিয়া অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্ট করিতে চাহিয়াছেন, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেছেন।

বিশেষ করিয়া সঙ্গীতের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, সেখানে স্বরের সাহায্যে আমাদের চিত্ত কেমন করিয়া নির্দিষ্টের বন্ধন হইতে অনির্দিষ্টের মধ্যে মুক্তি পায়। স্বরের কোন নির্দিষ্ট অর্থ নাই বলিয়া তাহা সহজেই অনির্দিষ্টের ব্যঞ্জনা দান করিতে পারে। সঙ্গীতের এই ধর্মটি সাহিত্য-শিল্পীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। তাঁহারা সাহিত্যের মধ্যেও এই সঙ্গীতের ধর্মটি প্রবেশ করাইয়া দিয়া সঙ্গীতের যে effect বা ফলশ্রুতি, সেই ফলশ্রুতি দানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে বিষয়-বস্তু এবং শিল্প-ভঙ্গী উভয় দিক দিয়া তাঁহাদের সাহিত্য একটি নূতন পথ ধরিল। কারণ, এতদিন ধরিয়া সাহিত্য জীবন-কথাকে যে ভাবে বলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাহাকে আমরা আমাদের এই বাস্তব জীবনবোধের দ্বারা একটি নির্দিষ্টের ব্যঞ্জনার মধ্যে লাভ করিয়াছি। সেখানে কোন অনির্দিষ্টের ব্যঞ্জনার অবকাশ ছিল না বা সাহিত্যও সে অবকাশ রচনা করিয়া লয় নাই। কিন্তু এখন তাঁহারা সাহিত্যকে সঙ্গীতের ছায় অনির্দিষ্টের ব্যঞ্জনার যোগ্য করিয়া তুলিতে চাহিলেন। *The Heritage of Symbolism* গ্রন্থে C. M. Bowra বলিতেছেন—

“The essence of Symbolism is its insistence on a world of ideal beauty and its conviction that this is realised through art.....A peculiar intensity is what the symbolists sought to give. In their loyalty to this aim they had to break with many familiar characteristics of poetry. Above all they avoided those public and political themes which were dear to the romantics. For the symbolists absorbed in an ideal beauty, politics is an alien and hostile theme.”

এইরূপে দেখি, সাস্কৈতিক সাহিত্য একটি বিশেষ ধরণের জীবনকথাকে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে বলিবার চেষ্টা করে। ইতিপূর্বে আমাদের জীবনের তৃষ্ণার যে আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কথা বলিয়াছি, সাস্কৈতিক সাহিত্য সেই আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার শিল্প-প্রয়াস হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। Arthur Symons তাঁহার “The Symbolist Movement” নামক গ্রন্থে বলিতেছেন—

“It is an attempt to spiritualise literature, to evade the old bondage of rhetoric, the old bondage of exteriority.....In attaining this liberty it accepts a heavier burden; for in speaking to us so intimately, so solemnly, as only religion had hitherto spoken to us, it becomes itself a kind of religion, with all the duties and responsibilities of the sacred ritual.”

আমাদের জীবনের যে অংশে এই আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা, যে অংশে এই অপ্রত্যক্ষ, অনির্দিষ্টের জগৎ আকাঙ্ক্ষা, সেই অংশ সাস্কৈতিক সাহিত্যের ভূমিকা রচনা করিয়া দেয়। আমাদের যে জীবনধর্ম এই অপ্রত্যক্ষের জগৎ রচনা করিতে থাকে, সেই জীবনধর্মের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে না পারিলে সাস্কৈতিক সাহিত্যের রসাস্বাদন ঘটে না।

সাহিত্যিক সাহিত্যের এই যে বিশিষ্ট প্রকৃতির কথা বলিলাম, ইহাতে তাহার পরিচয়টি পরিষ্কৃত হইবে। অতঃপর পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে সাহিত্যিক সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকার ভেদটি দেখাইব। সাহিত্যিক সাহিত্য বলিতে আমরা ব্যাপক অর্থে সাহিত্যের মধ্য দিয়া সঙ্কেতের কথা বুঝি; এই সঙ্কেত নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট, প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ বিষয় লইয়া হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা 'রূপ-প্রতীক' এবং 'ভাব-প্রতীক' শব্দ দুইটি ব্যবহার করিয়াছি। সাহিত্যিক সাহিত্য কখনও রূপ-প্রতীক হইয়া উঠে, কখনও ভাব-প্রতীক হইয়া উঠে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই 'সাহিত্যিক সাহিত্য' এই একই নামে অভিহিত করিলে তাহাদের পার্থক্যগুলিকে সহজে বুঝানো চলে না। অথচ আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সাহিত্যিক সাহিত্যের আবির্ভাব খুব বেশী দিনের নয় বলিয়া, এই বিভিন্ন বিষয়গুলির জন্ম বিভিন্ন শব্দ এখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। পণ্ডিতেরা এক এক জনে এক একটি শব্দ ব্যবহার করিয়া বিষয়টিকে জটিল ও দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা এখানে বিষয়ের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাহিত্যিক সাহিত্যের বিভিন্ন-রূপগুলিকে (form) বিভিন্ন নাম দিবার চেষ্টা করিব।

সাহিত্যের অবলম্বনীয় বিষয়টি যখন কোন একটি অপর প্রত্যক্ষরূপের সঙ্কেত দেয় তখন সেই সাহিত্যকে 'রূপ-প্রতীক' বলিতে পারি। প্রত্যক্ষরূপ সব সময়েই নির্দিষ্ট, তাহার মধ্যে কোন অনির্দিষ্ট কিছুই স্থান নাই। এই শ্রেণীর সাহিত্যের সঙ্কেতকে আমরা যুক্তির দ্বারা অনুসরণ করিতে পারি। ইংরাজীতে যাহাকে Allegory বলা হয়, ইহা অনেকটা সেই প্রকার। অনেকে Allegory-র অর্থে 'রূপক' কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু রূপক কথাটিকে এ অর্থে ব্যবহার না করিয়া আরও গভীর অর্থে ব্যবহার করিতে পারা যায়। তাই এ ক্ষেত্রে রূপক কথাটি ব্যবহার না করিয়া রূপ-প্রতীক কথাটি ব্যবহার করিলাম।

সাহিত্যের অবলম্বনীয় বিষয়টি যখন কোন একটি অপ্রত্যক্ষ ভাবের সঙ্কেত দেয় তখন সেই সাহিত্যকে ভাব-প্রতীক বলিতে পারি। অপ্রত্যক্ষ ভাব দুই প্রকারের হইতে পারে; একটি নির্দিষ্ট, অপরটি অনির্দিষ্ট। ভাব-প্রতীকের এই দুইটি শ্রেণীকে পৃথক সংজ্ঞা দিতে হইবে। যেখানে অপ্রত্যক্ষ ভাবটি নির্দিষ্ট বিষয়কে ব্যঞ্জিত করে সেখানে সাহিত্যকে 'সাহিত্যিক সাহিত্য' এই নামে অভিহিত করিব। এখানে 'সাহিত্যিক' কথাটিকে এই বিশিষ্ট অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'তাসের দেশ' এই শ্রেণীর সাহিত্য। ইহার মধ্য দিয়া একটি নির্দিষ্ট অপ্রত্যক্ষভাবের সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। এই সঙ্কেতটিও আমরা যুক্তির দ্বারা অনুসরণ করি; কিন্তু রূপ-প্রতীকের গ্রাম এখানে যুক্তিট অত স্পষ্ট নয়, বিষয়টি ভাবগত বলিয়া এখানে সঙ্কেতটিকে আমাদের বোধের দ্বারাও অনেকখানি গ্রহণ করিতে হয়।

আবার অপ্রত্যক্ষ ভাবটি যেখানে অনির্দিষ্ট বিষয়কে ব্যঞ্জিত করে সেখানে সাহিত্যটিকে 'রূপক' এই নামে অভিহিত করিব। রূপক অর্থে বুঝিব যাহা পরিপূর্ণভাবে, নির্দিষ্টভাবে,

রূপ লাভ করে নাই, অথচ যাহার মধ্যে রূপের একটি ভাব রহিয়াছে, অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্ট করিবার একটি আভাস রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’, ‘রাজা’, মেটারলিঙ্কের ‘ব্লু বার্ড’ প্রভৃতিকে রূপক সাহিত্য বলিতে পারি। এখানে বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়া আমরা এক অনির্দিষ্ট ভাবের আভাস পাই। এখানে সেই সঙ্কেতটি যুক্তির দ্বারা অনুসরণ করা যায় না, আমাদের এক আধ্যাত্মিক সংস্কারের কাছে ইহার আবেদন। সাহিত্যিক এখানে নানাভাবে আমাদের মধ্যে সেই সংস্কারকে জাগাইয়া দিতে চাহেন। যুক্তি হইতে আমাদের মনকে সরাইয়া আনিয়া আমাদের চিত্তকে স্বরের অধিগত করিয়া দেন এবং তাহাতেই কেমন একটা ধ্বনির মধ্যে আমাদের চিত্ত মুক্তি লাভ করে এবং সেই মুক্তিতে যুক্তিকে ত্যাগ করিয়া একটা সংস্কারের অধীন হইয়া পড়ে। সেই সংস্কারটিতেই অনির্দিষ্টকে স্পর্শ করিয়া যাওয়া আমাদের রসিক চিত্তের পক্ষে সম্ভব হয়। তখন,

“The visible world is no longer a reality and the unseen world no longer a dream.” (Yeats).

সাহিত্যিক সাহিত্যের এই যে প্রকারভেদ দেখাইলাম, ঠিক এই ছাঁচের মধ্যেই যে সকল সাহিত্যিক সাহিত্যকে গণ্য করা যাইবে সে কথা বলিতে পারি না। সাহিত্য শিল্প-প্রেরণা ও বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে শিল্প-রূপ লাভ করে। সব সময়ে সেই শিল্পরূপকে কোন একটি বিশেষ ছাঁচের মধ্যে ফেলিয়া তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। সাহিত্যিক সাহিত্যের মূল প্রকৃতিগুলি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কতকগুলি কথা বলা চলে, কিন্তু বাঁধাধরা অলঙ্কার-শাস্ত্র তাহার জগ্ন রচনা করিয়া দেওয়া যায় না। সাহিত্যিক সাহিত্য মূলতঃ সঙ্কীত-ধর্মী, তাহা সব সময়েই অলঙ্কার শাস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে চাহিতেছে। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যিক সাহিত্যের পরিচয়কে ছাঁচের মধ্যে বাঁধিয়া দিতে চাহিলে ভুল হইবে। উপরের শ্রেণীবিভাগকে তাই চরম বলিয়া দাবী করিবার অবকাশ নাই।

অতঃপর সাহিত্যিক সাহিত্যের শিল্পভঙ্গী ও রসের আবেদন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব। সাহিত্যিক সাহিত্য যখন ‘রূপ-প্রতীক’ হইয়া উঠে তখন ছোট গল্পের আকারে, কাহিনীমূলক রচনার মধ্য দিয়া অথবা নাটকের আকারে তাহার শিল্প-প্রকাশ দেখিতে পাই। সেখানে বক্তব্য বিষয়ের ব্যঞ্জনা খুব গভীর নহে। তাহা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ার্থকে প্রকাশ করে এবং সেই বিষয়ার্থটিকে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের রসাস্বাদন ঘটে। এই বিষয়ার্থটি জীবনের কোন তত্ত্বকে বা নীতিকে প্রকাশ করে, যে তত্ত্ব বা নীতি শিল্পীর জীবনবোধের একটি পরিণতি বা conclusion মাত্র। “রূপ-প্রতীক” হইতে তাই আমরা যে রস পাই, তাহা এই বিচিত্র রূপময় জীবনের আশ্বাদন-জনিত নহে, তাহা জীবনের কোন তত্ত্বজ্ঞান বা নীতিজ্ঞানজনিত। এখানে জীবনের কোন চিত্র যদি আসিয়া যায় তবে তাহাকে গৌণ করিয়া যে নীতি বা তত্ত্বটি তাহার সঙ্কেত, সেই নীতি বা তত্ত্বটিকে মুখ্য করিয়া ধরিতে হইবে। অর্থাৎ জীবন এখানে সাহিত্যের অবলম্বন নয়, তাহা সাহিত্যসৃষ্টির উপায় মাত্র। তাই উদ্দেশ্যসাধনের জগ্ন যতটুকু জীবনকথার

প্রয়োজন, জীবনের চিত্র, তাহার অধিক এখানে পাওয়া যায় না। সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ইহার মূল্য তাই খুব বেশী বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

সাহিত্যিক সাহিত্য যখন “ভাব-প্রতীক” হইয়া উঠে, তখন নাটকের আকারে তাহার শিল্প-প্রকাশ দেখিতে পাই। পূর্বে যেমন বলিয়াছি, ইহার দুইটি নাম দেওয়া যায়—সাহিত্যিক নাটক ও রূপক নাটক। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও শিল্প-ভঙ্গীর দিক দিয়া উহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। এই শ্রেণীর নাটককে সাধারণনাটকের সহিত মিলাইয়া লইতে পারা যায় না। ইহাতে সাধারণভাবে নাটকের মূল ধর্মটি বিঘ্নমান, তাহা হইল ঘটনার পারস্পর্য বিধানে অভিনয়ের দ্বারা একটি কাহিনীকে রূপদান করা। কিন্তু সাধারণনাটকের মতই ইহাতে ঘটনার প্রাধান্য ও বৈচিত্র্য নাই, চরিত্র-চিত্রণেও বিশেষ প্রয়াস নাই। এখানে কতকগুলি ভাব আর কতকগুলি ভাবের অহুগামী মাত্র। এই ভাব পরস্পরায় মূল ভাবটি পরিশেষে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন ঘট-প্রতিঘাতে বিচিত্র জীবনবন্দ্য দেখানো ইহার উদ্দেশ্য নয়, একটি বিশেষভাবে ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য। এই ধীরে ধীরে ভাবকেন্দ্রের আবরণ উন্মোচন করার মধ্যেই দৃশ্য-দৃশ্যান্তরের অবতারণা করা হয় এবং তাহাতেই শিল্পের একটি নাট্যরূপ ফুটিয়া উঠে। এখানেও জীবনের বাস্তবঘটনা-প্রবাহকে অস্বীকার করা হয় এবং জীবনের সহিত একটি যে নিবিড় রক্তমাংসের সন্ধন আমরা অনুভব করি এখানে আমরা সব সময়ে তাহা পাই না। ‘সব সময়ে’ কথাটি বলিলাম এইজন্ম যে, রবীন্দ্রনাথ তাহার সাহিত্যিক নাটকে বা রূপক নাটকেও মানব-জীবনের গভীর দ্বন্দ্ব দেখাইয়াছেন। সেখানে ভাববস্তুর (নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট) কেন্দ্র করিয়া যে সকল পার্শ্বচরিত্রের ক্রিয়া দেখিতে পাই, তাহারা সকলেই মানব। তাহারা তাহাদের স্ব স্ব হৃদয়গুণতির বৈশিষ্ট্য লইয়া এক একটি বিশিষ্ট জীবনবন্দ্যের সূচনা করিয়াছে। অনেক সময় দেখা যায়, যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই জীবনবন্দ্য, তাহা অতিমানবিক লোকে প্রতিষ্ঠিত, যদিও নাটকের পাত্র-পাত্রীর আধিভৌতিক জীবনের দ্বন্দ্ব সেখানে স্থান পায় নাই।

রূপক নাটকের রসের আবেদন মূলতঃ আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের আনন্দবোধে। সেখানেও হয়তো জীবনের কোন একটি দার্শনিক তত্ত্ব অস্ত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, কিন্তু “রূপপ্রতীকে” যেমন জীবনের তত্ত্বটিকে সোজাসুজি সঙ্কেতের আবরণে উপস্থিত করা হয়, এখানে সেরূপ করা হয় না। এখানে একটি আধ্যাত্মিক অহুভূতি বা চেতনার মধ্য দিয়া জীবনতত্ত্বটিকে আমাদের বোধগোচর করিয়া দেওয়া হয়। রূপপ্রতীকে জীবন-তত্ত্বটিকে সোজাসুজি জানানো হয়, এখানে বিভিন্ন ব্যঞ্জনার দ্বারা তাহাকে আমাদের মনে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হয়। তাই এখানে বাস্তব জীবনকে সব সময় না পাইলেও, আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হইয়া আমাদের রসিক চিত্তের যে একটি মুক্তি ঘটায়, তাহাতেই আমাদের রসের সাক্ষাৎ হয়। এই রস-ব্যঞ্জনা দান করিয়া রূপক নাটক সাহিত্যসংসারে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ও রবীন্দ্রনাথ

বিনয় চৌধুরী—চতুর্থ বর্ষ, ইতিহাস

নূতন বছরের হালখাতা তৈরীর আগে পুরাতন বছরের হিসাব মেলাবার দায় আছে—সাধারণ দোকানদারির ব্যাপারে এর সমাধা মোটা মোটা অঙ্কের সহজ সূত্রে। কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপারে, কোন মহৎ শিল্পীর ঐতিহ্যবিচারের ক্ষেত্রে খতিয়ানটা তত সোজা নয়। কেননা সংস্কৃতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধের মধ্যেও ঘটে পরিবর্তন। পুরাতন যখন স্বভাবের মত সত্য হয়ে যায় তখন পুরাতনকে স্মরণ করার কোন গরজ স্বভাবতঃ থাকেনা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের মূল্যবিচারের প্রশ্নটা স্বভাবের মত সহজ হয়ে যাওয়া পুরাতনের মূল্যবিচারের প্রশ্ন। সাহিত্যের ভাবদর্শে ও আঙ্গিকে, সমাজের সমস্তার রূপে ও গুরুত্বে, রাজনৈতিক চিন্তাধারায় রবীন্দ্রনাথের যুগ থেকে আজকের যুগের তফাৎ যথেষ্ট। ইতিহাসের মোড় ফিরেছে—এক বিশেষ অধ্যায়ে ছেদ পড়েছে—স্বরূপ হয়েছে নূতন ইতিহাস সৃষ্টির অভিযাত্রা। যে রেনেসাঁসের প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ তা আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। যুগের সমস্তা আজকের সাহিত্যে যেমনটি প্রকটভাবে রূপায়িত হচ্ছে—রবীন্দ্রনাথে ঠিক ততটা নেই। কালিদাসের যুগে ফিরে যাবার স্বপ্নে যে রোমান্টিক আর্তি, তার বদলে রুঢ় বাস্তবকে স্বীকৃতি জানাবার প্রয়োজন আজকের সাহিত্যে বেশী। সাহিত্যে সাধারণ মানুষের ভিড় জমেছে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনে প্রাচীন ভারতীয় সাধনার উপর ঝাঁকটা কমে গেছে, ভারতের ভাবী সমাজ-বিপ্লবকে নূতন মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করেছি। স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের মূল্য সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ জেগেছে। কল্লোলযুগের রবীন্দ্র-বিরোধিতার ক্ষীণ রেশ এখনও পাওয়া যায় কোন কোন সাহিত্যসমালোচনায়। কল্লোলযুগের ঝাঁপতাল আজকে না থাকলেও টিমে তেতালাতে স্বরের অল্পরণন মেলে।

প্রশ্ন উঠতে পারে রবীন্দ্র-বিরোধী পক্ষের থেকে যে, ভারতীয় ইতিহাসের যে রূপ রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়েছে তা ভারতীয় ইতিহাসের আসল ও সত্যরূপ নয়। বেদ-উপনিষদের যুগ, ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানকার যে বিরাট ইতিহাস, যে মন্বিত বেদনার কাহিনী—রবীন্দ্রনাথে তার পরিচয় নেই। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা ইতিহাসের মূল গতিক ব্যাখ্যা করতে পারে না। প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতীয় ইতিহাসের দীর্ঘ যাত্রায় এই একটি মাত্র স্বরূপই কি সেতারের নাগকীর স্বরের মত আর সব স্বরূপকে ছাপিয়ে গেছে? প্রশ্ন উঠতে পারে, আজকালকার সাহিত্যে জীবনের ব্যাপ্তির যে রূপায়ন, নূতন আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা—রবীন্দ্রসাহিত্যে তার অভাব। সমাজের যে রূপ, ব্যক্তির বিচিত্র অনুভূতির

যে রূপ রবীন্দ্রনাথে আমরা পাই তা তাঁর কবিকল্পনার রঙে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে গেছে। নির্বিশেষ, নৈর্ব্যক্তিক এ রূপ—তাতে রিয়ালিজমের অঙ্গহানি।

রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে হবে এক বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথ যে রেনেসাঁস্ যুগের কবি তা একান্তভাবেই সমসাময়িক ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন ও ভাবগত—তাতে বর্তমানের সব প্রয়োজনকে এক বিশেষ ভাববাদী দর্শনের কাঠামোয় ফেলার প্রচেষ্টা আছে। বৃটিশশাসনের সঙ্গে সঙ্গে যে নূতন অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে উঠল, তার পরের অবশ্জ্ঞাবী পরিণতির দিক্ থেকে সমস্রাকে দেখার কোন প্রেরণা ছিল না ভারতীয় রেনেসাঁসে—কেননা নূতন যে শ্রেণী রেনেসাঁসের প্রতিভূ ছিল তার বিকাশ ব্যাহত হয়েছিল পদে পদে। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে যদি আমাদের দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ সহজ ও স্বাভাবিক হতো তাহলে পুরাতনের প্যাকবাজ্ঞে নূতনকে এঁটে দেবার কোন প্রাণান্ত চেষ্টা হতোনা। ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদীশক্তির স্বার্থে সমাজ-বিপ্লবের সে রূপ মার্ধক হতে পারে না। ভারতবর্ষেও তা হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আধা-সামন্ততান্ত্রিক রূপের সঙ্গে সম্ভাবনাপূর্ণ বুর্জোয়া অর্থনীতির বড়রকমের একটা অসঙ্গতি তখনকার ভারতীয় সমাজবিপ্লবকে চিহ্নিত করেছে ও পরের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। একটা বিশেষ অর্থনীতির বনিয়াদ ধ্বংসে পড়েছে—অথচ নূতন একটা সংহত রূপ নিয়ে গড়ে উঠেনি। তখনকার যে শ্রেণী-বিকাস তার মধ্যেও অসঙ্গতির আদল স্পষ্ট। তাই জাতীয় আন্দোলনের শিকড় বাংলার মাটির গভীরে গিয়ে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না—নূতন যে শ্রেণীর সৃষ্টি তার সঙ্গে ছিল না বাংলার নাড়ীর যোগ। নবজাগৃতির বিশেষ অধ্যায়ে পুরাতনের দিকে ফিরে তাকানো খুব স্বাভাবিক। ইতিহাসে দেখা যায় জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিশেষ এক যোগ আছে। আর এ বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পুরণোর দিকে আসক্তি বিমিয়ে পড়ে একান্ত প্রত্যক্ষ মুদ্রাতন্ত্রের হিপোটোজমে। কার্লমার্কসের ভাষায় “Cash-payment is the sole nexus between men and men.” সেক্সপীয়রের টাইমস অফ এথেন্সে ও গ্যেটের ফাউন্টের প্রথম অঙ্কে এ মুদ্রাতন্ত্রের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। পুরাতন বিধি-বিধানের জায়গায় সৃষ্টি হয় নূতন কার্যদা-কাহ্নের। মার্ক্সের ভাষায়—

“All fixed, fast-frozen relations, with their train of ancient and venerable prejudices and opinions, are swept away—all new-formed ones become antiquated before they can ossify. All that is solid melts into air, all that is holy is profane, and man is at last compelled to face with sober senses his real conditions of life and his relations with his kind.”

ভারতীয় রেনেসাঁসের রূপের আলোচনায় বুর্জোয়া বিকাশের এই ব্যাহত দিক্ আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। নূতনের যে বীজ উদ্গমের আশায় আলোবাতাসের জন্ত দিন গুণছিল তার চারপাশে আবরণ সৃষ্টি করল মধ্যযুগীয় একরাশ বিধি-বিধান। তাই

রবীন্দ্রনাথের রূপ একান্তভাবে ভাবগতই হয়ে থাকল। বুর্জোয়াশ্রেণীর জাগ্রত চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশের রূপ কোথাও ফোটেনি। নূতন যে শ্রেণীর সৃষ্টি তার মধ্যে না ছিল সামন্ততন্ত্র থেকে জাতীয়তাবাদের পথে উন্নীত রাজনৈতিক চেতনার বিকশিত রূপ, না ছিল নূতনের পথে মুক্তির উন্মাদনা, না ছিল জীবনের ব্যাপ্তি। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্বমুখরতার মধ্য দিয়ে সমাজশক্তির যে ঐক্যরূপ সাহিত্যে রিয়ালিজমের গোড়ার কথা তা এ অবস্থায় সম্ভব ছিল না। কবিতায় ছাড়া রবীন্দ্রনাথ গল্প-উপন্যাসে যেখানে সমাজের রূপ ফোটাতে চেয়েছেন সেখানে তা পরিপূর্ণভাবে সার্থক হতে পারেনি। কবিতায় কবি প্রায়শঃ কালনিরপেক্ষ, কিন্তু উপন্যাসে মানুষ কালনির্ভর। একটা বিশেষ যুগের পটভূমিকায় মানুষের রূপ ফুটে উঠে এ উপন্যাসে। উপন্যাস আবার ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বের থেকেই শুরু—আর ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তির প্রাথমিক বুর্জোয়া যুগ থেকেই। তাই উপন্যাস বুর্জোয়া যুগের বিশেষ এক অবদান। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ব্যাপ্তির যে অভাব, মানুষের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তর-পরিক্রমার ঐশ্বর্যের যে অভাব—তার গোড়াকার কথা এই ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা। ঔপনিবেশিক দেশে জীবনের প্রকাশ ব্যাহত ও সংকীর্ণ। সাহিত্যের মধ্যে যে সত্য তার রূপায়ন তখনই কেবলমাত্র সম্ভব হয়, যখন শিল্পীর পক্ষে সে সত্য জল-বায়ুর মত স্বাভাবিক হওয়ার সুযোগ থাকে। ফরাসী ইতিহাসের এক বিশেষ যুগে বালজাক স্বাভাবিক—যদিও সহজ নয়—কেননা একটা জীব অতীতের গলিত রূপ তাঁর চোখের সামনেই ঘটছিল। সেখানে ইতিহাসের বিকাশ সঙ্কুচিত নয়; গতি অবরুদ্ধ নয়—রবীন্দ্রনাথের কাছে সমাজের সে চেহারা সংহতরূপে প্রকাশ পাবার সুযোগ ছিল কম। এমনকি শরৎচন্দ্রের মধ্যেও রিয়ালিজমের রূপ সত্য হতে পারেনি যদিও তাঁর সাহিত্যে আরও সাধারণ মানুষের স্থান আছে। সাহিত্যে রিয়ালিজমের যদি সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে “truthful reproduction of typical characters under typical circumstances” (এঙ্গেলস্) তাহলে টাইপচারিত্র ও পরিস্থিতি দুটোরই অভাব শরৎ-সাহিত্যে। তবুও রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভা সব ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে আসল সত্যের দিকে অঙ্গুলিপাত করেছিল। জাতীয় জীবনের গভীরে আপন সত্তার যোগ পাওয়ার যে চেষ্টা, সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজের আঙ্গিক সঙ্গতি খুঁজে পাওয়ার যে চেষ্টা ‘গোরা’র মধ্যে, বাংলা সাহিত্যে তা রবীন্দ্রনাথের বিরাট অবদান। ঔপনিবেশিক দেশে রাজনৈতিক চেতনার স্তর এত নীচু থাকা সত্ত্বেও ‘গোরা’র মধ্যে আছে বিরাট সম্ভাব্য আন্দোলনের দোলায় আলোড়িত সত্তার রূপায়ন। রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভার পক্ষেই কেবলমাত্র এটা সম্ভব ছিল। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে আপন মহত্বে প্রতিষ্ঠা করার যে দাবী ‘গোরা’য়—তা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী অবদান। মানুষ হিসাবে মানুষের মূল্য দেওয়ার জ্ঞান যে উদার মানবিকতাবোধ, তা রবীন্দ্রকীর্তির একটা বিশেষ দিক।

জাতীয় আন্দোলনের বিশেষ এ রূপটা বাদ দিলেও ইতিহাসের বিশেষ নিয়মে যে শ্রেণী

প্রধান হয়ে উঠতে পারত বা কিছুটা পেরেছিল, তা হলে সামন্ততন্ত্রের জীর্ণ খোলস ফেটে নতন বুর্জোয়া শ্রেণী—ইতিহাসের এই বিশেষ সময়ে বুর্জোয়ারাই প্রগতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক। আর এই আন্দোলনের মধ্যে কৃষক-শ্রমিকের আন্দোলন চাপা পড়ে গেছে। ঐতিহাসিক নিয়মে সমাজে যে শ্রেণী প্রধান হয়ে উঠেছে—সে শ্রেণীর অসঙ্গতির চরম স্তর না আসা পর্যন্ত অল্প আন্দোলন সাধারণতঃ ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে না। অত্যাচ্ছ আন্দোলন বিশেষ এই শ্রেণীর হাতিয়ার রূপেই ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব। রিফর্মেশন-যুগে অ্যানাব্যাপ্টিজম, ইংলণ্ডের সপ্তদশ শতাব্দীর আন্দোলনে লেভেলার, ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে জ্যাকোবিন আন্দোলন তখনকার ইতিহাসের ধারাকে ভিন্ন পথে চালিয়ে দিতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এক উদার বিশ্বমানবতাবোধ। এ উদারতা তাঁর কবিতায় ও গানে যে ব্যাপ্তি এনেছিল বাংলা সাহিত্যের তা সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথের যে মানবিকতাবোধ তার ভিত্তিই হল জীর্ণ পুরাতনের বহন-মুক্তি। গোটের ফাউন্টের মধ্যে মুক্তির যে আনন্দ, সে আনন্দ সামন্ততন্ত্রের অচলায়তন থেকে ব্যক্তির মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় এই মুক্তির আর্তি ও আনন্দ ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর মহিমা কীর্তন নয়—সে ধর্ম জীবনের ধর্ম—প্রতিটি মুহূর্তে প্রকৃতির সান্নিধ্যে আনন্দের স্পর্শে নতন যে উজ্জীবন-বোধ, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম তারই স্বাক্ষর বহন করছে। রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনা একান্তভাবেই আধুনিক। আজ ইতিহাসের মধ্যে শ্রেণী-সংঘাতের যে দ্বন্দ্বিকরূপ দেখতে আমরা অভ্যস্ত, রবীন্দ্রনাথের কাছে ইতিহাস সে রূপে হয়ত ধরা দেয়নি। কিন্তু তাঁর মানবতাবোধ মূঢ় কুসংস্কার ও প্রগতি-বিরোধী শক্তিকে আঘাত করতে তাঁকে প্রণোদিত করেছে। যারা পৃথিবীর বায়ুকে বিষিয়ে দিচ্ছে, আলোক যারা নিবিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তাঁর জ্বলন্ত অভিশাপ উগত হয়ে উঠেছে। মানুষের অগ্রগতিতে বিশ্বাস হারানোকে তিনি মহাপাপ বলে মনে করতেন। দানবের মূঢ় অপব্যয় ইতিহাসে যে কোনো শাস্ত্র অধ্যায় রচনা করতে পারবে না এই তাঁর ভবিষ্যবণী। মহাকালের সিংহাসনে সমাসীন মহাপুরুষের থেকে তিনি শক্তিভিক্ষা করেছেন অত্যা অত্যাচারের বিরুদ্ধে আঘাত হানবার জ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের জীবনের গোথূলি-লগ্নের কবিতাগুলোতে এই “সর্বত্রগামিতা”র ছাপ স্পষ্ট। ব্যথায় ও আনন্দে, অভিশাপে ও অভয়দানে তাঁর প্রতিটি কবিতার মধ্যে লেগেছে আশ্চর্য মহত্বের ছাপ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কদর্য নগ্ন রূপকে, তার লক্ষ্মীছাড়া দীনতার উচ্ছিন্নতাকে তিনি উন্মাদিত করেছিলেন, যুরোপে যুদ্ধের উন্মাদনায় উন্মত্তদের তিনি অভিশাপ হেনেছেন, স্পেনের বিপ্লবী গণ-আন্দোলনকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন নতন পৃথিবীর গড়বার পথে সোভিয়েট দেশের মহান কর্মপ্রচেষ্টাকে, বিক্রম করেছেন সাম্রাজ্যবাদী জাপানের হিংস্র জাতীয়তাবাদকে। এই বিরাট মানবতাবোধের ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অমর ঐতিহ্য—

এই মানবতাবোধের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলা সাহিত্যের ব্যাপ্তি অসম্ভব। আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে থেকে রবীন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত মন সত্যের আবির্ভাবকে লক্ষ্য করেছিল। মাল্লুয়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অন্তহীন ভালবাসা কোনো বিশেষ সংস্কারে অর্গলিত হতে পারেনি।

সাহিত্যের মধ্যে যে ঐতিহ্য-বাদ তার গোড়াকার কথাই হলো ইতিহাসকে অস্বীকার না করে পুরাতনের মধ্যে, অতীতের মধ্যে সত্যের যে রূপায়ন তাকে অভিনন্দন জানানো ও তাকে আত্মসাৎ করে এগিয়ে যাওয়া—কোনো বিশেষ সংস্কার এই ঐতিহ্যবোধকে খণ্ডিত করলে তাতে ভাবী সাহিত্যেরই ক্ষতি। ম্যাথু আর্নল্ডের ক্লাসিক্যালঘোষা মন শেলীর কবিতাকে স্বীকৃতি জানাতে অসমর্থ। এলিয়টের ঐতিহ্যবাদ সম্পূর্ণ কালনিরপেক্ষ, এজন্ড অনৈতিহাসিক। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আধুনিক সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টাতে সাহিত্য-সার্কাসের মল্লগিরি ও পালোয়ান-গিরিই শুধু দেখানো হবে। আজকের বাংলাসাহিত্যের যা প্রধান সমস্যা, তা নূতন নূতন আঙ্গিক নয়, স্বস্থ সমাজ-বোধ ও মানবতাবোধ। আঙ্গিক সর্বস্বতা এ যুগের বুর্জোয়াসংস্কৃতির অবক্ষয়েরই লক্ষণ। আঙ্গিকের উপর জোর দেওয়ার যে শুচিবায়ুগ্রস্ততা, তা শিল্পীর সৃষ্টিশীলতার অভাবেরই প্রমাণ—শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলাবার মতো সৌখীন মজদুরি সাহিত্য নয়। ফ্রান্সে ডাভাইজম, স্মর-রিয়ালিজম, ইংলণ্ডে ইমেজিষ্ট আন্দোলন ও গোটা যুরোপীয় সাহিত্যে সিঞ্চলিজমের প্রসার, নূতন নূতন আঙ্গিকের পথকে হয়ত খুলে দিয়েছে কিন্তু মাল্লুয়ের মূল্যবোধের মধ্যে নূতন কোন বিপ্লব ঘটতে পারেনি। টেকনিকের চুলচেরা সম্পূর্ণতার মধ্যে দেউলিয়া মনের নগ্নতা স্পষ্ট। আবার রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বর্তমানের সমাজসমস্যা সার্বিক প্রতিফলন হয়নি সত্য, কিন্তু আধুনিক সাহিত্যেও তার রূপায়ন কি সার্থক ও সম্পূর্ণ? গণ থাকলেই শুধু গণ-সাহিত্য বা প্রগতি-সাহিত্য হয় না। আধুনিক বাংলাসাহিত্যে ব্যাপ্তি এসেছে সন্দেহ নেই—কিন্তু গণ-সাহিত্য একান্তভাবেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলার ইতিহাসের অনেক পর্ব কেটে গেছে। জাতীয়-আন্দোলন গণ-আন্দোলনের সার্বিক রূপ নিয়েছে; পঞ্চাশের মনস্তর বাংলার সমাজ-জীবনের ভিত শুদ্ধ কাঁপিয়ে দিয়েছে; স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর জনসাধারণের ঘটেছে মোহমুক্তি; মহাচীনের মুক্তিবিপ্লব সম্পর্কে মাল্লুয়ের ধারণাকে প্যান্টিয়ে দিয়েছে; স্বতরাং সাহিত্যের মধ্যে নূতন নূতন সমস্যা এসেছে, সমাজবোধের রূপ সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে উঠার সুযোগ আছে যা রবীন্দ্রনাথের সময় সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ভাষার অফুরন্ত উত্তরাধিকার আমাদের দিয়ে গেছেন যা না হলে আজকালকার বাংলাসাহিত্যসৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটত প্রচুর। প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্যের সঙ্গে ভাবানুভূতির ঐশ্বরের নিত্য-সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথ থেকে পেয়েছি আমরা এই প্রকাশভঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ভাব ছীপের চারধারের জলের মত আমাদের বেঠন করে আছে—তাকে অস্বীকার করা আমাদের অর্থহীন মূঢ়তা ও অহংকারেরই পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথ ভাবী বাংলাসাহিত্যের রাজ-দরবারে ঘাঁবার পথে বিরাট তোরণ-দ্বার। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাকে তাঁর বিরাট মানবতাবোধ অনেকখানি ঘুচিয়ে দিয়েছে। মাহুষের প্রতি ভালবাসায় ও মমত্ববোধে রবীন্দ্রনাথ জনগণেরই কবি। আর আধুনিক বাংলার গণ-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করেই এগিয়ে যেতে পারে। সেক্সপীয়রের যুগের সমস্তার সঙ্গে আজকের ইংলণ্ডের সমস্তার গুণগত তফাৎ— তবুও এলিয়টের সেক্সপীয়র-বিরোধিতা সত্ত্বেও ইংরেজীসাহিত্য সেক্সপীয়রকে অস্বীকার করে এগুতে পারবেনা। বিরাট প্রতিভার স্বরূপই হল আগামী ছুঁতিন শতকের সম্ভাবনার সংহত শক্তি নিজের মধ্যে বিধৃত করা। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম ও বিশ্বমানবতাবোধ আগামীকালের ইতিহাসেরই নিভুল পদচিহ্ন।

অষ্টার মৃত্যু

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—চতুর্থ বর্ষ, আর্টস্

আজ দেখি আমাদের মনের কপাট
বন্ধ আর অন্ধকার ঘরের ভিতর
অত্মকে ডাকিনা কেউ ; জানালার শানিত অধর
দাঁতে দাঁত চেপে রাখে, আহা যদি এমন প্রহর
আচম্বিতে নামে যার দুই হাতে হাত রেখে দেখা যায় মাঠ
তুণের নিবিড় প্রেমে, আর যদি দেখা যায় বন
আলোয় আপ্লুত বৃক্ষে : অবারিত ভোরের আকাশ
প্রতিশ্রুত সূর্যে স্মৃথী।

কিন্তু এই মন

যতোবার পৃথিবীর মুখোমুখি হয়, ইতিহাস
সম্মতি দেবে না, সে-ও বেদনায় হয়েছে ক্লপণ।

অথচ ঘুমের স্বপ্নে কেটে যায় দিন
কখন জানি না, তবু এটুকুই অনেক বাঁচোয়া,
নাহলে বুঝি-বা এই কলঙ্কিত বৃত্ত-প্রদক্ষিণ
দুর্বিষহ হতো আরো, এটুকুই ঋণ
শতাব্দীর কাছে। আজ সভ্যতার প্রাণ শীর্ণতোয়া
নদীর মতন, তাতে যাবে না হাত-পা-মুখ ধোয়া।

কিন্তু যদি অনিদ্রার ভীষণ সঙ্কটে
কোনো এক রাত্রি আসে, আর এক ছর্বোধ্য ইশারা
ঘরের বিশ্রাম করে ব্যাহত, কালের নদীতটে
উত্তাল ঢেউয়ের পর ঢেউ দেখে নৌকো এসে জোটে
একে-একে, তারপর হাওয়ায় হঠাৎ
খুলে যায় হৃদয়ের জানালা-দরোজা,
প্রাগৈতিহাসিক কোনো রাত্রির আকাশ ভরা তারা
এনে দেয় সেদিনেরো রাত.....
তাহলে ভালোই হয়, তবু আজ মিথ্যে তাকে খোঁজা।

আজ শুধু তিমিরের ঋতু-পরিক্রমা
আমাদের জীবন্মৃত জীবনের সাক্ষ্য দেয়, যদি
প্রমিথিয়ুসের মতো দুর্ভাগ্য উজ্জলতা করে যাই জমা
কিছুই হবে না লাভ, হয়তো এমনি নিরবধি
অবিচিত্র পথান্তিবাহন, কোনো মোহানার ক্ষমা
বর্ষিত হবে না বুঝি, হয়তো প্রার্থিত সেই প্রাণকণা নদী
কখনো দেখবো না আর অরণ্যের অমৃত-ওষধি
দেবেনা দেবেনা কেউ, তবু এসো পার হয়ে যাই
এ সব মৃত্যুর কান্না কাঁটায় সঙ্কুল উপত্যকা
এই সব উত্তরাই চড়াই।

থরো থরো আশঙ্কায় তবে কেন জাঁক
মৈত্রীর মধুর ছবি? চলো আজ ভরসায় ছবি এঁকে যাবো,
এই তামসীর তীরে ঘুরে ফিরে আমাদের গান
শুনে তার কালোজলে পদ্ম হবে শুচি ও শ্বেতাভ—
দীপ্তির সঙ্কল্পে স্মহান
অক্ষয় প্রদীপ জ্বলে এখানেও সঙ্গীত শোনাবো।

তারোপর মনের কপাটে
যদি কেউ খিল তুলে আড়ালে লুকায়,
সম্মোহিত সেই ঘরে দিনরাত হাঁটে,
আমাদের না-চিনেই হেঁটে হেঁটে যায়,
অন্য কোনো মুক্তির উপায়
না পেলেও দে'খে যাবো তখন কেমন দিন কাটে ॥

বৃত্তচ্যুতি

শিশিরকুমার দাশ—দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান

নদীতে নেমেছি কতদিন অবগাহনে
কত সন্ধ্যায় মন্থর পায় আলসে,
যখনই এ তনু জ্বলেছে দারুণ দহনে
ভরেছি তখনই কালোজল এই কলসে ।
স্বর্ণহুত্র অগোচরে নদীসলিলে
দেহ হ'তে খসে ভেসে গেল শ্রোতোগতিতে ;—
সহসা কখন মুখর মনের দলিলে
লেখা বাধা পেল শুধু অবিরাম যতিতে ।
হারিয়ে তাকেই—আজো ত' অপার বেদনা
যে ছিল জীবনে আলোভরা কত সকালে ;
পৃথিবীর আলো-অঙ্গুরী তা'র সাধনা
ব্যর্থ করতে পারলনা কেন অকালে ?
অনেক প্রশ্ন অপরিণত এ মনেতে
জেগেছে তাদের সাড়া পাইনিকো তবু যে ;
উত্তরহীন পর্বত ঢাকা বনেতে ;
উতলা সাগরে—কি ক'রে বোঝাবে অবুঝে !
কত ছায়াপথ তারা গ্রহ আলো আকাশে
কতদিন ধরে সেই আলো আসে নয়নে ;
আকাশের সুর কত ভেসে আসে বাতাসে
সারারাত কাটে রূপালি মশারি বয়নে ।
সেও কি পারে না পৃথিবী ভরাতে শোভাতে
কান্তার-কেশী ধরার কাননে কাননে,
ফোঁটাতে কোরক শতদলে মনলোভাতে ?
কেন তবে বারে কোরক বিরস আননে ?
তবু চেয়ে দেখি কত নদী জল সাগরে
চলেছে ডিঙিয়ে পর্বত-বন হরষে ।
মোহানায় তা'র কল্লোল গুনি সজোরে
শুধু তরঙ্গ চঞ্চল হয় রভসে ॥

পদ্মা

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত—চতুর্থ বর্ষ, ইতিহাস

দিগন্ত-নিলীন-নীল শামলিম প্রান্তর যেখানে
রাত্রি আর প্রভাতের নিত্যদূত, যেখানে কেবল
সবুজের সমারোহ, যেথা শুধু ছায়া-স্বশীতল
শান্তির কুটিরগুলি মর্মরিত মর্মের আজানে,
কনক-ধাত্তের শ্রোতে হাওয়ার তরণী যেথা আনে
স্বপ্নের সৌরভ-স্বর, যেখানে প্রাণের শতদল
গানের কিরণ-স্পর্শে অফুরান আনন্দ-উজ্জল,
হে পদ্মা, সেখানে কেন, কেন তুমি কিসের সন্ধানে ?

আমিও বুঝি না হায় স্বপ্ন দিয়ে তৈরী এই দেশে
তোমারি মতন ঠিক সেদিনের অগতর্ক ক্ষণে
পথ ভুলে ভুল করে কেন যে এসেছি, মোহাবেশে
কেন যে সেদিন আমি সমুদ্রত উদ্ধত যৌবনে
দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি নির্মম হাতে, এর
অগ্র কোন মানে ছিল ?—একমাত্র ঘণ্য কুচক্রীর
বুটিল চক্রান্ত ছাড়া বলে পদ্মা, বলে আমাদের
আর কে ফেরাতে পারে যৌবনের আনন্দ-নিবিড়
স্বাভাবিক পথ থেকে ?

—তবু তুমি এখনো হুঁয়ার

উত্তুঙ্গ-তরঙ্গ-শীর্ষা ; স্নিগ্ধ-শ্রাম এই বাংলার
দিগন্তবিস্তৃত কোলে দূরান্ত-উন্মুখ শিশু-প্রাণ,
জন্মদাতা ঈশানের বজ্র-গাঢ় ভয়াল বিষণ
এখনো বাজিয়ে যাও আত্ম-হারা তরঙ্গের রোলে,
কিন্তু আমি পারি না তো তোমারি মতন সেইরূপ
পুঞ্জীভূত প্রাণ-মত্ত প্রাণ হতে ? হে পদ্মা তা' বলে
তুমি কী আমাকে করবে ক্ষমাহীন বিদ্যৎ-বিজ্রপ ?

স্বীকার্য : অক্ষম আমি, তোমারি মতন পূর্ণ-প্রাণ
 মত্তপ্রাণ প্রাণ-শিশু নই আমি আজ, জেনো তবু
 একদিন তোমারি মতন তীব্র তেজে দীপ্তিমান
 ছিলাম, চঞ্চল-চিত্ত হিমাদ্রির শক্তির প্রতিভু
 ছিলাম সেদিনো জেনো, তারপর কোন কুচক্রীর
 কুটিল চক্রান্ত-ফলে হয়ে গেছি ভোরের শিশির,—
 সে কথা জানি না, তাই অবরুদ্ধ শক্তির বেদনা
 তোমারি তরঙ্গ-ভঞ্জে মনে হয়, যায় যেন শোনা ।

আমার আত্মার আর্তি অপ্রকাশ্য, তাই তুমি তার
 সার্থক সুন্দর রূপ মনে হয়—হে পদ্মা আমার ॥

কল্পনা

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়—পঞ্চম বর্ষ, ইংরাজী

মিথ্যাকে যখন আমরা 'কাল্পনিক' আখ্যা দিই তখন মানুষের কাছে কল্পনার
 প্রয়োজনীয়তা ভেবে দেখি না। কল্পনাকে সাধারণতঃ মতিভ্রমের উদাহরণ ধরা হয়, আর
 না হয় সাহিত্যিকের জন্ম এর খানিকটা উপযোগিতা স্বীকার করা হয়—তার বেশী নয়।
 কিন্তু কল্পনা শুধু অস্থিরমতির অস্বস্থতার প্রকাশ নয়—বা মানসিক শক্তির চপলতার বিকাশ
 নয়। মানুষের ক্রমোন্নতির প্রতিটী ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মৌলিক কার্যাবলী সম্পাদন করে
 কল্পনা। কল্পনা চিন্তাশীল প্রাণীর পক্ষে অপরিহার্য।

মানুষের জীবন যে বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উপনীত হতে পেরেছে তার মূলে আছে
 কল্পনা। যা সে পেয়েছে তাইতেই মানুষ সম্ভূষ্ট হতে পারে নি। সে আরও ভাল জিনিসের
 কল্পনা করে এসেছে। এক বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হয়েও সে আরও সুখের অপর বাস্তবের
 স্বপ্ন দেখতে পেরেছে। গুহা ত্যাগ করে কুটীর নির্মাণ করবার আগে কুটীরবাস যে বেশী
 সুখকর হবে সে কথা আদিম মানুষ কল্পনা করে নিয়েছে। মানুষ যদি সংস্কার দ্বারা চালিত
 হ'ত তা হলে এখনও সে বর্বর হয়ে থাকত। সহজাত সংস্কারকে সে উপেক্ষা করেছে বলেই
 আজ সভ্যতার স্তরে এসে পৌঁছেছে।

এক সময় গেছে যখন বহু মানুষ ও বহু পশু একই সঙ্গে বাস করে এসেছে।
 আত্মরক্ষার জন্ম মানুষ পশুর কাছ থেকে যথাসম্ভব আত্মগোপন করে এসেছে, আর কল্পনা

করেছে নতুন শক্তির যে শক্তিতে সে পশুর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। এই কল্পনাই জন্ম দিল অঙ্গের। এখন মানুষ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হ'ল। আগে খাওয়ার জন্ম তাকে প্রকৃতির দানের অপেক্ষা করতে হ'ত—অস্বাভাবিক মানুষের পক্ষে পশু হত্যা করে ক্ষমিত্ব করা সহজ হল। প্রচণ্ড শীত ও গভীর অন্ধকারকেও জয় করার কথা মানুষ কল্পনা করল। ফলে সে আগুন জ্বালতে শিখল। এই আগুনের উত্তাপ ও আলোক তার পক্ষে অনেকখানি স্বস্তিদায়ক হল। জলাশয়ের জল তাকে হাতছানি দেয়। জলে ভাসবার কথা তার মনে উদ্ভিত হল। গাছের গুঁড়ি কেটে নৌকা তৈরী হল। মানুষ অস্বথ সারাবার কথা কল্পনা করল, ঔষধের সৃষ্টি হল। কল্পনা চলেছে, এগিয়ে চলেছে—এ যাত্রার শেষ নেই, এ গতির বিরাম নেই। সৃষ্টি হয়ে চলেছে আকাশবান, আকাশবাণী ও আণবিক বোমার।

মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের মধ্যে কল্পনা অগ্রতম। যা কিছু বড় ও ভাল কাজ মানুষ করেছে তার মূলে আছে কল্পনা।

চঞ্চল, স্নদূরের পিয়াসী মানুষ তার নিজের দেশটুকু দেখেই পরিতৃপ্ত হতে পারে নি। মানসনেত্রে সে দেখেছে দেশ-দেশান্তরের ছবি। তার কল্পনা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে নতুন দেশে। নব নব জনপদ হয়েছে আবিষ্কৃত। বিপুল পৃথিবীর পরিক্রমা শেষ করে মানুষ এখন আশপাশের গ্রহ-উপগ্রহে যাবার কল্পনা করছে। হয়ত' অদূরভবিষ্যতেই এই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হবে। বাস্তবহারী মানুষ মঙ্গল-গ্রহে গিয়ে নতুন উপনিবেশের স্থাপনা করবে।

অনাগত, ভাবীকালের কথা যে রকম আমরা কল্পনা করতে পারি সেই রকম কল্পনায় আমরা ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়েও ফিরে যেতে পারি। প্রাচীন ইতিবৃত্তের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কল্পনা আমাদের এক বলকেই দেখিয়ে দিতে পারে। আমরা উন্মাদক জনতার বাদবিতণ্ডা থেকে বহুদূরে আশ্রমের শান্তপরিবেশে তপস্চারত আর্ষ ঋষিদের দেখতে পারি। দেখতে পারি অহিংসার প্রচারক বিশ্বপ্রেমিক বুদ্ধদেবকে। দেখতে পারি বিমুগ্ধা বিমুগ্ধপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করে ধর্মপ্রাণ নিমাইয়ের গৃহত্যাগ। কল্পনার সাহায্যে আমরা দেখি জুশবিন্দু যীশুখ্রীষ্টকে—ক্ষমাসুন্দর তাঁর দৃষ্টি। আমরা দেখি সত্যের জন্ম মৃত্যু-বরণ-রত সক্রটিনকে—সম্মিত তাঁর আনন্দ। আমরা দেখি যন্ত্রণাকাতর মুম্বুর শয্যাপার্শ্বে সেবারত ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে—মূর্তিমতী করুণা।

কল্পনার প্রাচুর্য থাকা খুবই ভাল, কিন্তু কল্পনার অপব্যবহার ভাল নয়। কল্পনা যাতে বিলাসে পরিণত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। কল্পনা যখন আমাদের উত্তোষী করে তোলে তখনই তার সার্থকতা, কল্পনা যদি শুধু অলসতায় পর্যবসিত হয় তা' হলে তা' অর্থহীন মনোবিকার মাত্র। যাদের কল্পনাশক্তি নেই তারা সত্যিই অন্ধকম্পার পাত্র। তারা কবিতা পড়তে পারে না, প্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে খুঁজে পায় না সৌন্দর্য, ভ্রমণে তাদের আনন্দ নেই, খেলায় নেই উৎসাহ। কল্পনা না থাকলে জীবনের কৌতুক, সত্য, সৌন্দর্য ও মাধুর্যের অনেকখানি থেকেই আমরা বঞ্চিত হই।

শিশুর কল্পনাশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। চেয়ারে বসে সে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়েছে কল্পনা করে, পুতুলকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে মনে করে অচিন্ দেশের রাজকন্ঠার ঘুম ভাঙালে। তার মন বলে—হেথা নয়, হেথা নয়, অণু কোন খানে। তাই মনোরম এই ভুবন থেকেও সুন্দরতর ভুবন সে সৃষ্টি করে নেয়। তার মনোবনে যে ফুল ফোটে তার সৌরভ শ্রেষ্ঠ পার্থিব গুপ্পের স্নগন্ধের চেয়েও মধুরতর। শৈশবই বোধ হয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন, 'Heaven lies about us in our infancy'.

সেক্সপীয়ারের মিডসামার-নাইট্‌স্ ড্রীম্ নাটকে আছে—

The lunatic, the lover and the poet
Are of imagination all compact.

প্রমত্ত, প্রেমিক ও কবির কল্পনার রাজ্যে বাস। এই দিক দিয়ে এই তিন জন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শেক্সপীয়ার এই সত্যই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুন্দর ভাব ও ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

মানুষ যখন পাংগল হয় তখন তার মনোরাজ্যের কোন রকম শৃঙ্খলা থাকে না—তার কল্পনা বিক্ষিপ্তভাবে ছুটে যায়। তাই লেডী ম্যাকবেথের হাতে রক্তের গন্ধ থেকে যায়—যে গন্ধ আরবের সমস্ত সুরভিও দূর করতে পারে না। তাই ওফেলিয়া ফুল আর গানের মাঝখানে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, তাই লীয়ারের চোখে গ্লষ্টার গণেরিলে হয় রূপান্তরিত।

প্রেমিকের চোখে থাকে প্রণয়ের অঙ্কন। তাই তার প্রিয়জনকে সে স্বর্গীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত দেখে। তাই যক্ষ তার প্রিয়াকে কল্পনা করে—

...সুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাত্তেব ধাতুঃ।

তাই শকুন্তলা সধক্কে দুঃস্বস্তের উক্তি—

ধীরত্বসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে।

তাই জুলিয়েটের ছ্যতিতে রোমিওর চোখ ঝলসে যায়—

But, soft! what light through yonder window breaks?
It is the east, and Juliet is the sun.

প্রেমিক তার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তার মানসীকে রচনা করে, তাই সে অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা।

কবি কল্পনার সাহায্যে তাঁর কাব্য সৃষ্টি করেন। ঝাঁদের এই কল্পনার উল্লেখযোগ্য ক্ষুতি নেই তাঁরা যত বড় ভাষাশিল্পীই হ'ন না কেন সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীর কবি হতে পারেন না। উদাহরণ স্বরূপ ল্যাটিন সাহিত্যে হরেন্স ও ইংরাজী সাহিত্যে পোপের নাম করা যেতে পারে। কবির কল্পনাই তাঁকে ও তাঁর কাব্যকে মহত্ব দান করে। তাই মধুসূদন কল্পনাকে সাদর আহ্বান জানিয়েছেন—

তুমিও আইস দেবী,
তুমি মধুকরী কল্পনে।

মিল্টনের মহীয়সী কল্পনাই তাঁর মহাকাব্যকে অমরত্ব দান করেছে। কবি কল্পনার সাহায্যে নতুন জিনিস সৃষ্টি করেন—পুরাতনকে করেন নবজীবনদান। কবির কল্পনার এই দিক্টা লক্ষ্য করেই সংস্কৃত আলঙ্কারিক বলেছেন :

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ ।
যথাস্মৈ রোচতে বিখং তথৈদং পরিবর্ততে ॥

শেক্সপীয়ার কবির 'দিব্যোন্মাদ-ঘৃণিত-দৃষ্টি'র কথা উল্লেখ করেছেন। বাস্তবের যেসব জিনিস প্রতিদিনকার ব্যবহারে ক্লিষ্ট, কবি সেইসব জিনিসের ওপর কল্পনার আলো ফেলে তাদের উজ্জ্বল করে তোলেন। যেগুলি সুন্দর সেগুলিকে তিনি সুন্দরতর করতে চান। তাই তিনি বলেন :

নবীন আঁধাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্ত কায়া
বাসন্তীবাস-পর।
ধরণীর তলে গগনের গায়
মাগরের জলে অরণ্যছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।

আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় কবির কল্পনাই সবচেয়ে বড় কল্পনা। কারণ কবি তাঁর অমর কাব্য সৃষ্টি করে মনুষ্যত্বের মহিমা প্রচার করেন—মানুষকে আশা ও উৎসাহ দেন। দুঃখ-হুর্দশা তিনি দূর করতে পারেন না, তবে কাঁটাবনের মতো যে ফুলটা ফুটে থাকে তার দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেন। কিন্তু কয়েকজন আধুনিক মনোবিজ্ঞানী বলছেন যে মানুষ যদি নিজের সঙ্গে ঈশ্বরের একাত্মতা কল্পনা করতে পারে, যদি মানুষের হৃদয়তন্ত্রী অনন্তের সুরে বাজতে থাকে, তা হলে সে মহামানবে পরিণত হতে পারে—তখন সে পার্থিব দুঃখ-দৈত্যের উপেক্ষা চলে যেতে পারবে। আর এই মহামানবই একদিন পারবে ধরার ধূলিতলে স্বর্গের সুষমা সৃষ্টি করতে।

ইতিহাসে ব্যক্তির স্থান

অংশুরঞ্জন সেন*

ইতিবৃত্তের প্রবাহপথে একটা সমাজ-প্রগতির দীপ্তি আবর্ত চঞ্চল করে তোললে মানব-মানসকে। স্বদূর অতীত হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এই অশ্রান্ত কল্লোলই ইতিহাসের দিশারী আলো হয়ে ওঠে। নানা ষাট-প্রতিষাটের মধ্য দিয়ে মানুষ এগিয়ে চলেছে শান্তিময় সৌন্দর্যময় বৈচিত্র্যের দিকে। সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, মহত্ত্ব সজীব আলেখ্য হয়ে ওঠে ইতিহাস-সচেতন মনে। তাই সমাজ-ব্যবস্থার প্রাথমিক যুগে আত্মবিকাশের নানাপথ যখন উপস্থিত হোল মানুষের সামনে, সমসাময়িক ইতিহাসেও দেখা গেলো তার প্রকাশ। আবার ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি যখন স্তব্ধ হয়ে আসে, তখন সেই প্রাণহীন আবর্জনাকে দূর করতে আবির্ভাব হয় কোন অজ্ঞেয় ব্যক্তির, যিনি দুর্গমকে করে তোলেন স্নগম, দুর্লভকে উপলব্ধ।

আদিম যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের অক্ষুট চেতনা বিকাশ লাভ করেছে প্রকৃতির সংস্পর্শে এসেই। এইভাবে সে চিনেছে তার পারিপার্শ্বিককে, চিনেছে গোটা পৃথিবীকে। আর এর থেকেই জন্ম নিয়েছে নতুন ভাব, নতুন শক্তি, নতুন আদর্শ। স্মৃতির প্রকৃতির অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আর সমাজ ও মানুষের স্বার্থকে অধিক পরিমাণে রূপায়িত করে তোলার শক্তিই মানুষের ব্যক্তিত্বকে করেছে সমাজে স্মৃতিষ্ঠিত। ইতিহাসে ঋষি ব্যক্তির মর্ষাদা আর অক্ষয় মহুগ্ধের কথা বিবৃত করেছেন, তাঁদের মধ্যে কার্লাইলই ছিলেন বিখ্যাত। বহুদিন ধরে ইতিহাসকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখার অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছিলো মানুষের। সেই ঘটনারাশির স্তূপ হতে বেরিয়ে আসাই হোল কার্লাইলের প্রধান কীর্তি। তিনিই প্রথম গুণীর ব্যক্তিত্ব আর অজ্ঞেয় পৌরুষের কথা উদ্ঘাটিত করলেন আমাদের কাছে। সেদিন থেকে খুলে গেলো ইতিহাসের আর একটি নতুন পথ।

কিন্তু সমসাময়িক কালের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করলেও কার্লাইলের ঐতিহাসিক মর্ষাদা আজ লুপ্তপ্রায়। জীবন ও বহির্জগতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে একটা বিরাট অসঙ্গতি, যার ফলে তাঁর প্রভাব ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তিনি রাজনীতিতে ছিলেন একজন উদারনৈতিক, কিন্তু কর্তৃত্বেও বিশ্বাস করতেন। তিনি একদিকে নৈতিক উন্নতির পক্ষপাতী, আবার অল্পদিকে বাস্তব অগ্রগতির বিরোধী। এর ফলে তিনি বিজ্ঞানকে করলেন উপহাস। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হোল এই যে, যে দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তিনি নতুন বিজ্ঞানকে বিক্রপ করলেন, প্রাচীন ধর্মকেও বিচার করলেন সেইভাবে।

অপরদিকে সত্যই ছিলো তাঁর জীবনের প্রধান নীতি ও ধর্ম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিছক বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই যেতে হোল তাঁকে। কারণ, যে বাস্তব অগ্রগতির বিরোধিতা করেছিলেন তিনি, তা তাঁর নৈতিক লক্ষ্যগুলোর রূপান্তর ঘটাতে বাধ্য। ফলে দেখা গেলো তাঁর গোঁড়ামীর এক হাশ্বাস্পদ সমাবেশ। তিনি সম্মান করলেন কেপলারকে, অবিধাস করলেন নিউটনকে, উপহাস করলেন ফেরাডেকে, আর অবজ্ঞা করলেন ডারউইনকে। তাঁর চোখে মালুম হোল সত্য, দিব্য ও অনন্তের অলুসরণকারী। এক কথায় বলতে গেলে এঁরা পারমাণ্বিক ছাড়া আর কিছুই নন। নৈতিক মূল্যের দ্বারা মালুমকে বিচার করাই হোল কার্লাইলের উদ্দেশ্য।

কার্লাইলের মতে সমাজের অধিকাংশ মালুমই নির্বোধ আর নিজেদের দোষ-গুণ সংশোধন করতে একেবারে অক্ষম। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের কুসংস্কার, অগ্নায়, অবিচার দূর করাও তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। স্তবরাং তাদের ঠিকপথে চালিত করতে হলে এমন কোন স্বেচছাগ্য নেতার প্রয়োজন যিনি তাদের নিজ ইচ্ছামূল্যায়ী পরিচালনা করতে পারবেন। এটাই হোল উদারনৈতিক কার্লাইলের ব্যক্তি-বিচারের নিরিখ। কিন্তু এ ধরণের ব্যক্তিত্ব সমাজের পক্ষে কি রকম বিপজ্জনক তা' প্রমাণ হয়েছে বিসমার্ক আর হিটলারের জার্মাণিতে। বিসমার্ক তাঁর "প্রাশিয়ানাইজেশান" নীতির অবলম্বনে সমস্ত রাষ্ট্রকে প্রবঞ্চিত করে যে জার্মাণি গড়ে তুলেছিলেন, তার এক শতাব্দী পরে হিটলার তাঁরই পদাঙ্ক অলুসরণ করে একনায়কত্বকে করলেন স্প্রতিষ্ঠিত। এইভাবে ফ্যাসিষ্ট নাৎসী বাহিনী গড়ে উঠল জার্মাণিতে। এই একগুঁয়েমীর ফলে জার্মাণির হোল চরম পরাজয়, কারণ এই ভয়ঙ্কর নীতি স্থায়ী হতে পারে না বেশী দিন। আর এরই ফলে তাঁদের আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের ঘটলো অপমৃত্যু।

এই প্রবল ব্যক্তিদের ব্যর্থতার সন্ধান মিলবে ইতিহাসে। অবশ্য জনসাধারণ যে তাদের নেতাদের অলুসরণ করতে চায় না তা' নয়। বেশীর ভাগ মালুমই স্তবর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, প্রচণ্ড শক্তিশালী আর কৃত্তী নেতাদের অলুসরণ করতে চায় সর্বদা। কিন্তু প্রকৃত কারণ আরও বেশী জটিল ও কষ্টসাধ্য। প্রথমতঃ স্বেচছাগ্য ব্যক্তি তাঁর কাজের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত হ'ন না সব সময়ে। জুলিয়াস সীজার তাঁর বন্ধুদের সমর্থন হারিয়েছিলেন, অপরদিকে রোমের তাঁর শত্রুদেরও আয়ত্বে আনতে পারেন নি। ফলে তাঁর জীবনপ্রদীপ নিবে গেলো চিরদিনের মতো। এইভাবে নেপোলিয়নেরও হয়েছিলো পতন। দ্বিতীয়তঃ, স্বেচছাগ্য ব্যক্তি বংশের ধারাকে রক্ষা করতে পারেন না। অলিভার যা' লাভ করেছিলেন, রিচার্ড ক্রমওয়েলকে হারাতে হোল তা'। আবার বিসমার্ক যা' লাভ করেছিলেন, বেথমেন-হেলগেরেণ, তা' ডুবিয়ে দিলেন বিশৃঙ্খলার অন্ধকারে। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণ তাদের নেতাদের দর্শনমাত্রই স্বীকার করে নিতে প্রায়ই অক্ষম হয়। যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা তিনি সকলেরই গোচরীভূত। কারণ, তাঁর কার্য বাস্তবক্ষমতার নিদর্শন—যা' অগ্রাহ্য করা যায় না।

আবার যিনি কোন চার্চের প্রতিষ্ঠাতা তিনি অধিকাংশ মানুষের দ্বারা উপেক্ষিত ও অস্বীকৃত হতে পারেন। কারণ, তাঁর সৃষ্টি ভাবের মধ্যেই নিহিত যার সঙ্গে বাস্তবের নেই কোন সংযোগ। একথা ঠিক যে যন্ত্র-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে পোপ আর বিশপের প্রাধান্য ক্ষীণ হয়ে পড়েছে অনেকখানি। তখন থেকে যন্ত্র ও যন্ত্রই হয়েছে মানুষের ভাগ্যের নিয়ামক। তাই পুরানো ঘুণে-ধরা শক্তি আর স্থায়ী হোল না বেশী দিন, ধীরে ধীরে নতুন আদর্শ তার স্থান দখল করলো। এভাবে পুরোহিতের ব্যক্তিত্বের মূলে ধরলো ফাটল, আর তার জীবনের মান গেলো তলিয়ে একটা ব্যর্থতার অন্ধকারে।

কার্লাইলের ঐতিহাসিক ব্যক্তিবিত্তার অত্যধিক ধর্মভাবাচ্ছন্ন। অবশ্য ইতিহাসের বিশিষ্ট কয়েকটি ব্যাপারে ধর্মও জড়িত হয়ে আছে। কিন্তু সমস্ত কিছুর মূলে ধর্ম-সংযোগ করা নিতান্ত অগ্ৰায় ও অশোভন। তাই তাঁর বীর হলেন ভগবানের প্রতিনিধি, যিনি অসংখ্য নির্জীব নির্বোধ মানুষের নেতা। একমাত্র ভগবানই এই বিরাট জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি মহাবীর, তাই মর্ত্যের অগ্ৰায় ও পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করেন কয়েকজন ছোট-খাটো মানুষ বীরকে। সুতরাং ভগবানই একমাত্র শক্তিশালী অতিমানব ও পূজ্য মহাপুরুষ আর এই পৃথিবীটাও চিরকাল একই রকম, এর কোন পরিবর্তন নেই। অথচ ইতিহাসের অর্থই হোল পরিবর্তন। কিন্তু কার্লাইল শেষ জীবনে তাঁর এই ভ্রান্ত নীতি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে জনসাধারণ ততটা নির্বোধ নয় যতটুকু তাঁর অভিমত। তারা সত্যিই শৌর্ষে-বীর্ষে স্ননিপুণ, এমনকি তাদের প্রিয় নেতার জঘ প্রাণবিসর্জনেও অক্ষম নয়। ইতিহাসই এর সাক্ষ্য দেয়।

সমাজ-অগ্রগতির মূলে ব্যক্তির অবদান নির্ভর করে সেই যুগের বিশিষ্ট অবস্থার ওপর। ফরাসীবিপ্লবে নেপোলিয়নের আবির্ভাবই এর চূড়ান্ত উদাহরণ। তাঁর ব্যক্তিগত শক্তির কাছে তাই অগ্ৰায় সেনাপতিদের স্থান ছিলো তুচ্ছ। তার কারণ তাদের শক্তিমত্তা সম্ভাবনা থেকে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন জেগে ওঠে। যে নেপোলিয়নের শক্তি ও প্রতিপত্তির ফলে সামাজিক বিপ্লব ঘটেছিলো, তাঁকে ছাড়া কি তা সম্ভবপর হোত না কোনদিন? মোটেই তা নয়। যখন সমাজ তার বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিদের সামনে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করে তখন তাঁদের মন সেই সমস্যা সমাধানের প্রতি নিবিষ্ট হয়। তারপর যখন তার সমাধান হয় তখন তাঁদের দৃষ্টিও অগ্র সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং গুণীর কার্যের গতি এগিয়ে চলবে যুগধর্ম অহুযায়ী; তাঁর দৃষ্টি অগ্রদিকে নিবন্ধ হবে না সেই সময়ে। নেপোলিয়ন যদি সেনাপতিত্বের পরিবর্তে মঙ্গীত-চর্চার অভ্যাস করতেন, তাহলে নিশ্চয় তিনি রাষ্ট্রের কর্ণধার হতে পারতেন না ডবিশ্বতে।

যেসব মনীষী রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা ছাড়াও শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতিতে নিজেদের প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন, তাঁরাও ছিলেন সমাজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা,

অর্থাৎ সামাজিক কল্যাণ বা স্বার্থের সঙ্গেই জড়িত। তাই Renaissance-যুগের অমর শিল্পী লিওনার্দো-ডা-ভিঞ্চি, মিকেল এ্যাঞ্জেলো প্রভৃতির সৃষ্টিতে রূপায়িত হয়ে উঠেছে জরাজীর্ণ শাসনতন্ত্রের দাসত্ব হতে মুক্তির চেতনা আর স্বাধীন মানুষের আন্দোলন। আবার এই যুগেই গড়ে উঠলো মৃত্যুঞ্জয়ী কবি শেক্সপীয়রের মহান সাহিত্য। তিনি নতুন যুগের মুক্ত মানুষকে জানালেন অভিনন্দন। তাঁর অপরায়ে শিল্পীব্যক্তিত্ব বাস্তব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা হতে বিচ্যুত হয়নি কোনোদিন। অপরদিকে ঊনবিংশ শতাব্দী ইংরেজী উপন্যাসের মধ্যে নিয়ে এলো এক অভূতপূর্ব রূপান্তর। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্কট আর চার্লস ডিকেন্সের বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টি ও পুরাতনের বিরুদ্ধে তাঁদের বিজ্ঞপ ও গ্লেব নতুন যুগের বাণীকে করে তুললো আরো সুন্দর, আরো সার্থক। বিশেষ করে ডিকেন্স ফরাসীবিপ্লবের উৎপীড়িত ও শোষিত মানুষের কাহিনীকে যেরকম মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তাঁর রচনায়, তা' তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বকে অমর করে রেখেছে পৃথিবীর ইতিহাসে। এই ভাবেই জনস্বার্থের সঙ্গে জড়িত থেকে যুগে যুগে ব্যক্তিত্ব এগিয়েছে আপন সার্থকতার পথে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসেও দেখি একই উদাহরণ। ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা বহুকাল ধরে স্থায়ী ছিলো। কিন্তু সমাজ স্থাপুর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না একজায়গায়। তাই ঊনিশ শতকে এলো বিরাট পরিবর্তন। মধ্যযুগের অচল সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন রামমোহন রায়। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ভারত এগিয়ে গেলো একেবারে পথে। তিনি হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকল মানুষকে দিলেন গভীর সম্মান। এমন একটা সময়ে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিলো যখন আমাদের আর্থিক ও মানসিক শক্তি গেছে আড়ষ্ট হয়ে। তাই সেদিনকার মানুষ তাঁকে শত্রু বলে তিরস্কার ও উপহাস করেছিলো। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র ক্রক্ষেপ না করে আমাদের দেখিয়েছিলেন ভারতের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্যকে। ভারতের সাধন-সম্পদের দ্বার তিনিই খুলে দিলেন মানুষের সামনে। তাই নবযুগের অগ্রদূত রামমোহনকে আজও সারা ভারতের মানুষ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তাঁর মহিমা ছেয়ে গেছে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত। সুতরাং ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের মূলে ছিল রামমোহনের কঠোর উদ্যম ও অজ্ঞেয় ব্যক্তিত্ব।

এইভাবে ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা রয়েছে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। একজন গুণী ব্যক্তি যে তাঁর ব্যক্তিগত গুণরাশির জগৎ মহৎ তা' নয়, তাঁর মহত্বের কারণ হোল যে তিনি যুগের পাওনা মিটিয়ে দেন যুগকেই। কার্লাইলের ভাষায় এঁরা সমাজের জন্মদাতা। এই ষথার্থ উক্তির জগৎ কার্লাইল্ ধন্য। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে একজন গুণী মানুষ প্রকৃতপক্ষে নতুনের সূচনাকারী, কারণ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি অগ্নের চাইতে তীক্ষ্ণ ও প্রবল। তাই সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ অনেকখানি, প্রায় আকাশ-পাতালের দূরত্ব। একটা সমাজ যখন ভেঙ্গে যায় তখন তা'র চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর মানসসৃষ্টিতে। আবার আগামী দিনের নতুন নতুন সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রতিও তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ হয়।

সুতরাং, তাঁকে একজন বীর বলা যেতে পারে। কিন্তু তিনি এই অর্থে বীর ন'ন যে নিজ ইচ্ছানুযায়ী তিনি স্বাভাবিক ঘটনাস্রোতকে প্রতিহত কিংবা পরিবর্তিত করতে পারেন। তাঁকে বীর আখ্যা দেওয়ার প্রধান কারণ হোল যে তিনি প্রয়োজনীয় অথচ অচেতন পদার্থকে প্রকাশ করেন সূত্র ও সচেতনভাবে। এখানেই নিহিত আছে তাঁর সমস্ত মহত্ব, এখানেই তাঁর সম্পূর্ণ ক্ষমতা।

সুতরাং ইতিহাসের বিশিষ্ট ঘটনারাশি ও মহান ব্যক্তিরাই হলেন সেই সেই যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমোন্নতির প্রমাণ ও নিদর্শন। কিন্তু অবস্থার মন্বর গতির জগৎ এইসব গুণী ব্যক্তিদের দায়ী করা চলে না, কারণ পরিবর্তন ধীরে ধীরে আসাই স্বাভাবিক। আবার এই পরিবর্তন কখনো আপনা হতেই উদ্ভূত হয় না। তাই ফাঁরা বিরাট বিরাট সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধানে রত থাকেন, এখানে তাঁদের মধ্যবর্তিতার প্রয়োজন হয় সবসময়েই। কিন্তু এও মনে রাখা উচিত যে কেবলমাত্র বিখ্যাত ব্যক্তিদের জগৎই বিশাল কর্মক্ষেত্রের দ্বার উন্মুক্ত নয়। এর দ্বার তাদের জগৎ উন্মুক্ত যাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি সর্বদা তীক্ষ্ণ ও সজাগ, আর যাদের হৃদয় প্রতিবেশীদের প্রতি উদার ও সহানুভূতিশীল। সুতরাং “বিখ্যাত” শব্দটাই হোল একটি সম্বন্ধ-বাচক সাধারণ ভাব। আমরা পবিত্র বাইবেলেও দেখেছি এর উদাহরণ। সেখানে বলা হয়েছে, “সেই মানুষই বিখ্যাত যিনি পরের জগৎ নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।” সুতরাং ব্যক্তিত্বের ব্যভিচারের হাত থেকে এঁরা মুক্তির আশ্বাদ নিয়েই সমাজের বুক জন্ম নিয়েছেন। সমাজ এঁদেরই চায়—কারণ, ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক রূপ এঁরাই ফিরিয়ে আনতে পারেন।

এইভাবে ব্যক্তির সাফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ান সুপরিষ্কৃত হয়ে উঠেছে ইতিহাসের পাতায়। পৃথিবীতে এরকম বহু মহতের আবির্ভাব হয়েছে আর শেষে সম্মানরাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁদের বিসর্জন হয়েছে অতলস্পর্শ বিশ্ব্বতির মধ্যে। প্রত্যেক মাহুষের মনের মধ্যে রয়েছে একটা স্বাতন্ত্র্য। তাই তাঁদের গতিশক্তির বৈচিত্র্য এক নয়। গতির লক্ষ্য এক, কিন্তু তা'র পথ অনেক। অন্ধের মতো একজনের পশ্চাতে আর-একজনের চলার কোন ক্ষমতা থাকতে পারে না। ব্যষ্টি আর সমষ্টির শক্তির মানদণ্ডে রয়েছে বিরাট প্রভেদ। যা' হোক, নতুন দিনে এইসব গুণীদের ব্যক্তিত্বই সমাজে স্বীকৃত হবে—কারণ, জীবনের সহজ সংযোগেই এঁরা সাহিত্য, শিল্প, দর্শন সৃষ্টি করেছেন, নতুন সভ্যতা গড়ে তুলেছেন। তাঁদের মহত্ত্ব তাঁদের কাজের মধ্যে রেখে গেছে আপনার ছাপ। সমাজের প্রচলিত প্রথা তাঁদের ধরে রাখতে পারে না, তাঁদের ব্যাকুলতাই দেখিয়েছে তাঁদের পথ। জয় তাঁদের স্থানচিত্ত, কারণ তাঁরা পুরাতনের ধ্বংসকারী ও চিরনতুনের পূজারী। ক্লিষ্ট আকাশে তাঁরাই হলেন আলোকের দূত।

স্বপ্ন

অর্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য—প্রথম বর্ষ, আর্টস্

ছায়াঢাকা বাণী ব'য়ে শেষ হ'য়ে দিন ঐ আসে,
সবুজ স্বপনে ভরা মাঠ আজ ঘুমাবে এখন ।
ডুবে যাওয়া আলোকের কণাটুকু স্মৃতিপটে ভাসে
বিস্মরণের তীরে ভেসে ভেসে চ'লেছি যখন ।

আঁধারের পাখা ঢাকা আকাশের পানে চাই যবে
জানি না কখন আমি ব'সে আছি স্বপনের রথে !
তারার দলের মাঝে যাত্রা মোর যেন শুরু হবে—
বনানীর মায়া ছেড়ে স্বপ্ন চলে অজানার পথে ।

স্বদূরে রহস্তঢাকা মাটি-ছোঁওয়া দিগন্তের পারে
মন-তটিনীর কোন ছলো ছলো জোয়ারেতে ভেসে ;
মধুর বর্ণালীমাখা কল্পনা-স্বর্গের এক ধারে
ধীরে ধীরে সেইখানে স্বপ্ন এসে থামে মোর শেষে ।

ভুলের স্বর্গ

বটকুঞ্চ দে—ষষ্ঠ বর্ষ, রাজনীতি

এ-ও ভুল ? এ-ও যদি ভুল, তবে কেন হে হৃদয়,
ঘুরে-ঘুরে ছড়া কেটে ক্লান্ত হাওয়া ! এতোটা সময়
কেন মিথ্যে ছরাশার মুগ্ধ মূর্তির ধ্যান, বলো—
যদি-বা প্রাণের স্পর্শ নমিত চোখে-ও ছলোছলো
না হ'লো, তা' হ'লে আর কবিতার নায়িকার নাম
নৃপ্তরের মতো তার কানে-কানে যতো শোনালাম—
তা' দিয়ে কী হবে ? সেই ভোরের বিভোর বৈভবে
আঁকা ছবি, শিশিরের মুক্তো-মুখ, কী হবে ঐ সবে !

আমি যে আকাশ থেকে চুপি-চুপি আলতো ভীকু পা'য়
 ঝ'রে যাই, ঝ'রে গিয়ে তোমার ঘুমের মন ছুঁই,
 সারা রাত খুঁজে-খুঁজে তারাদের বাগানের জুঁই
 জড়ো করি, ক'রে দিই তোমায়, তবু কী নিরুপায়
 এক সে পথিক-প্রাণ তোমারই স্বপ্নের গানে কবি
 পারবে না হ'তে? তবে, সব ভুল? সত্য আর সবই!

এ-ও যদি ভুল, তবে আর কেন, কেন হে হৃদয়
 উপমার মিথ্যে রং-এ করো তাকে লীলা-রূপবতী,
 কেন আর সময়ের তীক্ষ্ণ তীরে তোমার সঞ্চয়
 ঢেলে যাও অরুপণ! তাতেই কী মৃত্যুর মহতী!

হয়তো। হয়তো নয়। সবই ভুল। তবু সে ভুলের
 তীরের পথের রেণু দুই হাতে কামনা কুড়ায়,—
 তারপর হিসেবের হ্রতৈশ্বর্ঘ্যে সন্ধ্যা-শিমুলের
 পায়ের প্রণাম লাভ। শান্তি, চুপ, শান্তির ছায়ায় ॥

ছুটির গান

সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়—পঞ্চম বর্ষ, বিজ্ঞান

আবার কলেজ ছুটি হলো, ফের দীর্ঘদিনের
 জগ্রে কলেজে শান্তি নামলো,
 দূরপথে যেতে শ্রান্ত কলেজ একটু থামলো
 নিঃশ্বাস নিতে, দরিয়ার বাঁকে
 একটু ভিড়লো নৌকো। অনেক যাত্রীজনের
 উচ্চ কণ্ঠ থামলো, তীরের ঘন অরণ্যে
 সন্ধ্যার মায়া নামে—সেই ফাঁকে
 নামলো সবাই মুক্তির হাওয়া পাবার জগ্রে—
 একটু শান্তি—
 থাকে যদি সেই ঘন বনানীর
 স্নিগ্ধ ছায়ার শান্ত নিবিড়

ভীকু অলুরাগে, দীর্ঘ পথের দাঁড় টেনে টেনে
 পাড়ি দিতে, এই শরীর-মনের জমানো ক্লান্তি
 একটু হারাতে, একটু ভুলতে
 জলের কান্না, নতুন রাতের তারা ছুঁয়ে-ছেন
 বনের ছায়ায় সবুজ পাতার কুটির তুলতে ।

তবু কি শান্তি এখানে ? এখানে
 বিজন বনের অলস সন্ধ্যা
 মুক্তির হাওয়া বারায় ? চপলা অলকানন্দা
 কি শান্তি ঢালে ?
 এখানে পাহাড়ী জ্যোৎস্না তাদের উন্ননা প্রাণে
 কতটুকু আলো ছড়ায় ? বলো তো মনের পাল্লা
 সরিয়ে হৃদয় ছোটো কিনা এই স্বরণের পালে
 হাওয়া দিয়ে সেথা—যেখানে অতীতে হাজার মাল্লা
 দাঁড় টেনেছিলো একসাথে, হাতে
 হাত রেখে, চোখে চোখ রেখে, এর গলায় ও গলা
 মিলিয়ে চলার গান গেয়েছিলো । সেই পথ চলা
 মনে ক'রে এই রাত্রির নীড়ে
 যদি উন্ননা হও আজ, যদি সেই একসাথে
 গান মনে পড়ে, যদি সে অতীতে ফিরে যেতে চাও,
 তবু দোষ দেবো তোমায় ? শান্ত গাছেদের ভীড়ে
 শ্রান্ত হৃদয় হয় যদি আজ এগিয়ে চলার স্বপ্নে উধাও ?

বিজ্ঞাপনের অর্থনীতি

অমর্ত্যকুমার সেন—চতুর্থ বর্ষ, অর্থনীতি

বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের যুগ না বলে বিজ্ঞাপনের যুগ বলাই উচিত। পথে ঘাটে, ল্যান্সপোষ্টের গায়ে, ট্রামের চুড়ায়, দেয়ালের মাথায় বিজ্ঞাপনের আজ ছড়াছড়ি। এখানে লাল আলো জ্বলছে নিভছে, ওখানে রামধনু দিয়ে ছবি আঁকা হচ্ছে, আবার ওপাশে হকারেরা গলা ফুলিয়ে চ্যাচাচ্ছে। খবরের কাগজের আন্ধেকই তো বিজ্ঞাপনে ভর্তি। কোলকাতায় রাস্তার পাশে এমন কোনো দেয়াল দেখেছেন কি, যার উপর বিজ্ঞাপনের ট্যাঁকশালের ছাপ এখনও পড়ে নি? চিংকার করে জিনিসের গুণাবলী কীর্তন করা, অথবা গুটিকয় লোককে সঙ্ সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এযুগে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব যে অস্বীকার করে তার অন্তর্দৃষ্টির হয়তো প্রশংসা চলতে পারে, কিন্তু তার বহির্দৃষ্টির তারিফ করতে আমি নারাজ।

বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক লোকেরই ভুল ধারণা আছে। তাঁরা মনে করেন বিজ্ঞাপনের খরচটা মূর্খতারই নামাস্তর, কারণ সেই টাকায় বেশী জিনিস তৈরী করলে লাভ হবে বেশী। তাঁরা ভুলে যান যে জিনিস তৈরী করা আর তা বিক্রী করা এক কথা নয়। আপনি হয়তো তিন হাজার টাকা দিয়ে হাজার বোতল তেল বানালেন এই ভেবে যে পাঁচটাকা করে বিক্রী করে অনায়াসে পাঁচ হাজার টাকা তুলে ফেলবেন। বাজারে ছেড়ে দেখলেন পাঁচ টাকায় কুড়িটা খদ্দেরও জোটে না। বাধ্য হয়ে দাম কমাতে লাগলেন,— শেষে হয়তো একটাকা সাড়ে তিন আনা করে সব বেচে দিতে হোল। আপনি লাল না হয়ে লালবাতি জ্বাললেন। এর জায়গায় যদি বিজ্ঞাপনের জ্ঞান কিছু খরচ করতেন তবে হয়তো প্রচুর লাভ করতে পারতেন। চাহিদা বাড়ানো হচ্ছে বিজ্ঞাপনের কাজ আর এর জন্মেই বিজ্ঞাপনের চাহিদা। চাহিদা বাড়ে ছুভাবে—অনেক লোকে নতুন করে জিনিসটা কেনা শুরু করে, আবার অনেকে রামের দোকান ছেড়ে দিয়ে শ্বামের কাছ থেকে জিনিসটা কেনা শুরু করে। প্রথমটাকে আমরা বলব “লোকজোটানো” বিজ্ঞাপন, আর দ্বিতীয়টাকে “লোকভাঙনো” বিজ্ঞাপন। লোকজোটানো বিজ্ঞাপনের ব্যবহার সব ধরণের বাজারেই (market) হয়ে থাকে। কিন্তু লোকভাঙনো বিজ্ঞাপনের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী হয় এমন সব বাজারে যেখানে অনেক লোকে মিলে একই ধরণের জিনিস বিক্রী করছে (Monopolistic Competition)। সেখানে প্রত্যেকের জিনিসের সঙ্গে অল্পের জিনিসের তফাৎ সামান্যই,—তাই বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারলে বিক্রী বাড়বে প্রচুর।

অর্থনীতির দিক দিয়ে বিজ্ঞাপনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হোল, তার সঠিক পরিমাণ ঠিক করা। বিজ্ঞাপনে কতটা খরচ করা হোল, তার উপরে অনেকাংশেই ব্যবসার ওঠা পড়া নির্ভর করে। বিজ্ঞাপনের অভাবে বিক্রী কম হতে পারে,—আবার বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়িতে দেনার দায়ে “ইন্সলভেন্সী কোর্টে” যাতায়াত শুরু করতে হতে পারে। সেইজন্মই বিজ্ঞাপনের তাকমাফিক পরিমাণটা জানা নিতান্তই দরকার। অর্থনীতিবিদেরা যে সমস্ত “ফরমুলা” বানিয়েছেন, তার একটি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

মনে করুন আপনি মাথার তেলের ব্যবসা করবেন—শ’খানেক টাকা খরচ করার ইচ্ছা। এই ১০০ টাকা আপনি নানাভাবে খরচ করতে পারেন। ৮০ টাকা তেল তৈরী করতে টেলে হয়তো ৪০ বোতল তেল তৈরী হোল। ২০ টাকা খরচ করলেন বিজ্ঞাপনের পিছনে। ধরুন তার ফলে ৪০ বোতল বিক্রী হল ৪ টাকা দরে ১৬০ টাকার। আপনার লাভ হোল নগদ ৬০ টাকা। এর বদলে ৮৫ টাকা তেল তৈরীতে খরচ করলে হয়তো হোত ৪২ বোতল। বিজ্ঞাপনে বাকী ১৫ টাকা খরচ করে বিক্রী হোল প্রতি বোতল ৩০ টাকা দামে। সব মিলে উঠল ১৪৭—আপনার লাভ হোল মোটে ৪৭ টাকা। ঐরকম নানাভাবে ঐ ১০০ টাকা খরচ করা চলে। স্মৃতিধার জন্ম কয়েকটি সম্ভাবনাকে ছকে গেঁথে ফেলা যাক। ধরে নেওয়া গেল যে ৫ টাকার কম খরচ বাড়ানো কমানো সম্ভব নয়।

| মোট খরচ | তেল তৈরীর খরচ | বিজ্ঞাপনের খরচ | জিনিসের পরিমাণ | দাম | মোট আয় | লাভ |
|---------|---------------|----------------|----------------|-----|---------|-----|
| ১০০ | ৮৫ | ১৫ | ৪২ | ৩০ | ১৪৭ | ৪৭ |
| ১০০ | ৮০ | ২০ | ৪০ | ৪ | ১৬০ | ৬০ |
| ১০০ | ৭৫ | ২৫ | ৩৮ | ৪০ | ১৫২ | ৫২ |
| ১০০ | ৭০ | ৩০ | ৩৫ | ৫ | ১৭৫ | ৭৫ |
| ১০০ | ৬৫ | ৩৫ | ৩২ | ৫০ | ১৬০ | ৬০ |

এই হিসাব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জিনিস তৈরী করতে ৭০ টাকা আর বিজ্ঞাপনে ৩০ টাকা খরচ করে লাভ হচ্ছে সবচেয়ে বেশী—গোটা ৭৫ টাকা।

মোট খরচের পরিমাণটা মনে করুন এবার কমানো হোল। আপনি ঠিক করলেন যে সব মিলে ২০ টাকা খরচ করবেন—তেল তৈরী আর বিজ্ঞাপন দেওয়া ওরই অন্তর্ভুক্ত। ১০০ টাকা খরচের যেমন একটা ছক উপরে বানানো হয়েছে, ২০ টাকারও ঐরকম একটা ছক বানানো যেতে পারে। তাতে হয়তো দেখা গেল যে ৬৫ টাকার জিনিস তৈরী করতে আর ২৫ টাকা বিজ্ঞাপন দিতে খরচ করে টাকা উঠছে সবচেয়ে বেশী—ধরুন ১৬০ টাকা। তাহলে ২০ টাকা সবচেয়ে সেরাভাবে খরচ করলে ৭০ টাকা অবধি লাভ করা যেতে পারে। আবার এইভাবে হিসাব কষে দেখলেন যে ১১০ টাকা যদি খরচ করেন, তবে তার থেকে ১২০ টাকা অবধি তুলতে পারেন। অর্থাৎ ১১০ টাকার সেরা লাভ হচ্ছে

৮০ টাকা। এই যে আলাদা আলাদা পরিমাণে খরচ করা হচ্ছে, এরও একটা তালিকা বানানো যেতে পারে।

| মোট খরচ | সবচেয়ে বেশী আয় | সবচেয়ে বেশী লাভ | জিনিস তৈরীর খরচ | বিজ্ঞাপনের খরচ |
|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| ৯০ | ১৬০ | ৭০ | ৬৫ | ২৫ |
| ১০০ | ১৭৫ | ৭৫ | ৭০ | ৩০ |
| ১১০ | ১৯০ | ৮০ | ৭৫ | ৩৫ |
| ১২০ | ১৯৫ | ৭৫ | ৮০ | ৪০ |

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যখন মোট খরচ ১১০ টাকা তখন লাভ হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। ৭৫ টাকা জিনিস তৈরীতে আর ৩৫ টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ করে নগদ আশিটি টাকা লাভ করা যাচ্ছে। এই হচ্ছে বিজ্ঞাপনের “বাস্তব” (Optimum) খরচ।

এই প্রক্রিয়ায় হিসাব ঠিক করা নিয়ে নানা আপত্তি উঠেছে। একদল অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছেন যে ৩৫ টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ করা হবে বলে কিছুই বলা হোল না। নানারকম বিজ্ঞাপন আছে—এক একটার এক এক রকম ফল। বিজ্ঞাপন তো আর হিন্দী সিনেমার গান নয় যে একটার সঙ্গে আরেকটার তফাৎ বের করা যাবে না। দেখে যতটা কঠিন মনে হয় আসলে কিন্তু সমস্যাটি তত বড় নয়। আমরা এতক্ষণ যে নিয়ম অনুসরণ করছি, তাতেই এর জবাব মিলবে। ৩৫ টাকার বিজ্ঞাপন বলতে আমরা বুঝিয়েছি ঐ টাকার সবচেয়ে বেশী ফলপ্রদ বিজ্ঞাপন। এমন অবস্থায় পৌঁছতে হবে যে, কোন বিশেষ ধরণের বিজ্ঞাপনের খরচ বাড়িয়ে অল্প ধরণের পিছনে খরচ কমিয়ে এর থেকে বেশী টাকা তোলা সম্ভব নয়। তাই এ সমস্যাটির সমাধান করা খুব কিছু কঠিন বলে ভুল হবে।

আরেকটা আপত্তি উঠেছে লাভের মূল্য নিয়ে। আমরা এতক্ষণ ধরে এসেছি যে শুধু লাভ বাড়ানোই ব্যবসাদারের লক্ষ্য। কিন্তু অল্পদিকেও তার নজর রাখা দরকার। ব্যবসায় বেশী দিন টিকে থাকা, বুঝি কমিয়ে ফেলা, স্থখে দিনযাপন করা—এসব দিকেও তার নজর রাখতে হয়। তার উপর লাভ বলতে শুধু এই মুহূর্তের লাভ বোঝায় না। আজকের বিজ্ঞাপনে হয়তো মাস ছয়েক বাদে কেনা বাড়তে পারে। লোকের মনের মধ্যে ছাপ রেখে যাওয়া বিজ্ঞাপনের কাজ, আর সেই ছাপের ফলে চাহিদা যেমন এফুণি বাড়তে পারে, ছমাস বাদেও তেমনি পারে। তাই আমাদের হিসেবে প্রচুর গলদের অবকাশ আছে।

এর থেকেও বড় প্রশ্ন করেছেন অনেকে। তাঁরা বলেন যে বিজ্ঞাপনের খরচ বলে আর্দো কোন আলাদা হিসাব নেই। বই বিক্রী করে যে ব্রাউন পেপারে দোকানদার সেটা মুড়ে দিল সেটাও তো একটা বিজ্ঞাপন। সাহেবী দোকানে “সেলস্‌গার্ল”টি যে ফিক করে একটু হাসল, এর মধ্যেও বিজ্ঞাপনের আমেজ আছে। এমন কি কোন জিনিসকে ভাল ভাবে তৈরী করাও তো তার একটা বিজ্ঞাপন। বইয়ের চক্চকে মলাট দেখে কেনার ইচ্ছা আমাদের সবারই হয় (“আনকাল্‌চর্ড” আখ্যা পাবার ভয়ে আমরা তা নাই বা স্বীকার করলাম)!

এমন কি গল্পের বইএর গল্পটা ভাল হওয়াও তো তার একটা বিজ্ঞাপন। তাই বিজ্ঞাপনের খরচ বলে আলাদা কোন হিসাব ঠিক রাখা সম্ভব নয়। যে খরচে লোকের চাহিদা বাড়ে তাকে যদি বিজ্ঞাপনের খরচ বলি, তবে প্রায় সব খরচই বিজ্ঞাপনের খরচ।

আবার অনেকে প্রশ্ন করেছেন ব্যবসাদারকে যে আমরা এতক্ষণ সবজান্তা বলে ধরে রেখেছি, তার ভিত্তি কতটুকু? বিজ্ঞাপনে কতটা খরচ করলে কি দামে জিনিসটা বিক্রী হবে, তা সে জানবে কেমন করে? তাই তার পক্ষে ভেবেচিন্তে সেরা হিসাবটা বের করা নিতান্তই অসম্ভব।

এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এতক্ষণ ধরে আমরা যে নিয়ম খাড়া করলাম তার মূল্য খুব বেশী নেই। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যবসাদারেরা এ নিয়ম মোটেই অল্পসরণ করে না। তারা দাম বা খরচ বাড়িয়ে কমিয়ে দেখে তার ফল কি হচ্ছে। এই “ট্রায়াল এণ্ড এরর” পদ্ধতিতেই তাদের হিসাব ঠিক হয়। আমাদের নিয়মটার মূল্য শুধু এইখানেই যে ব্যবসাদার যদি লাভটাকে চূড়ান্ত বানাতে চায় তবে তার ঠেকে শেখার মধ্যে দিয়েই নিজের অজান্তে সে এই নিয়মটি অল্পসরণ করবে।

এর পরে আসা যাক একটা বড় প্রশ্নে—বিজ্ঞাপন থেকে সমাজের কি লাভ হয়? অনেকে বলে থাকেন যে বিজ্ঞাপনের ভিতর দিয়ে আমরা অনেক খবর পাই। কোথায় কি সিনেমা চলেছে, কোন দোকানে জুতোর দাম কমেছে এসব খবর আমরা বিজ্ঞাপন মারফৎই পেয়ে থাকি। কিন্তু এর উল্টো দিকটাও আছে। বিজ্ঞাপনে খবরের থেকে “অখবর”ই আমরা বেশী পাই। বিজ্ঞাপনের কাজ নয় বিজ্ঞজনকে আপন করা—তার কাজ হচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ লোককে ধোঁকা দিয়ে বিক্রী বাড়ানো। “নিউ সান্ডুভ্যালী” যে নতুন সান্ডুভ্যালী নয়, “ফেমাস সান্ডুভ্যালী” যে সেই প্রসিদ্ধ সান্ডুভ্যালীর থেকে সংযোগমুক্ত, “অরিজিনাল সান্ডুভ্যালী” যে আসল সান্ডুভ্যালী থেকে বিচ্ছিন্ন,—সেকথা অনেকেই জানেন না। বলুন তো কোলকাতায় লক্ষ্মীবাবুর সোনা ঊর চাঁদিকো অসুলি দোকান কটা আছে? বিজ্ঞাপনের বহর দেখে দ্বিগুণ দাম দিয়ে আপনি যে হাত ঘড়িটা কিনলেন, বাড়ী এসে হয়তো দেখবেন সেটা দ্বিগুণ স্পীডে চলছে। জেফারসন্ যতই বলুন না কেন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনেই একমাত্র সত্যি কথা পাওয়া যায় (“Advertisements contain the only truth to be relied on in a newspaper”), আমরা জানি কল্পনাশক্তির উগ্রতার সেরা পরিচয় মেলে বিজ্ঞাপনে।

এ সব আলোচনা ছেড়ে এবার চোকা যাক খাম্ অর্থনীতিতে। কেম্ব্রিজের এক অর্থনীতিবিদ দেখিয়েছেন যে অযোগ্য ব্যবসাদারেরাই (inefficient producers) বিজ্ঞাপনে সবচেয়ে বেশী খরচ করে। এর ফলে লোকে অযোগ্য কোম্পানীর কাছ থেকে বেশী জিনিস কেনে। ফলে, ভাল প্রতিষ্ঠানের জায়গায় খারাপ প্রতিষ্ঠানই বাড়বার বেশী সুযোগ পায়। তাই বিজ্ঞাপনের ব্যবহারে সমাজের ক্ষতির পরিমাণ, লাভের অঙ্ক থেকে অনেক বেশী।

এর উত্তরে বিজ্ঞাপনের সমর্থকেরা বলে থাকেন যে বিজ্ঞাপনের একটা ভালো দিক লোকে অনেক সময়ে বুঝতে পারে না। বিজ্ঞাপনে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হয়। বিজ্ঞাপন তৈরীর কাজে কিছু লোক চাকরী পায়। এই সমস্ত লোক আবার এই অর্জিত টাকার কিছু অংশ খরচ করে। যে সব জিনিস কিনতে এ টাকা খরচ হয় সে সব জিনিস তৈরীতে লাভ বাড়ে—তৈরীও বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে। এতেও কিছু লোকের চাকরী জোটে। তারা আবার তাদের রোজগার কিছু খরচ করে। আবার কিছু নতুন লোকে চাকরী পায়। এই ভাবে বেড়ে চলে চাকুরে লোকের সংখ্যা (multiplier process)।

বেকার সমস্যার আর এক ভাবেও সমাধান হতে পারে। বিজ্ঞাপনের দরুণ লোকে জিনিস কেনে বেশী—ফলে সেই সব জিনিস তৈরীও হয় বেশী। কাজেই বেশী লোকের চাকরীর সংস্থান হয়।

কিন্তু ব্যাপারটাকে যতটা সহজ মনে হচ্ছে আসলে তা নয়। ব্যবসাদারেরা যদি লাভ বাড়া সম্বন্ধে একজোট হয়ে ঠিক করে, জিনিষ তৈরী বাড়ানো হবে না? এক্ষেত্রে বেশী জিনিস কেনার ইচ্ছার ফলে জিনিসের দামই শুধু বাড়বে, আর বাড়বে ব্যবসাদারের মুনাফা—বেকার সমস্যার কোনও সমাধান হবে না। যেখানে একটা ব্যবসাদারই কোন জিনিস তৈরী করছে (monopoly), অথবা যেখানে বেশ কয়েকজন ব্যবসাদারে মিলে ঠিক করেছে যে তারা একজোট হয়ে কাজ করবে (monopolistic combine), সেই সব বাজারে বিক্রী বাড়ার চেয়ে দাম বাড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। এই সমস্যাটি নিয়ে পুরো আলোচনা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে পড়বে,—তবে এটুকু দেখা গেছে যে সাধারণতঃ চাকরী বাড়াবার উপায় হিসাবে বিজ্ঞাপনের দান খুব সামান্যই।

আর তাছাড়া যদিই বা ধরে নিই যে “লোক জোটানো” বিজ্ঞাপনে জিনিস কেনা বাড়ে, “লোক ভাঙানো” বিজ্ঞাপনে তো আর তা হয় না। খাস্ কামড়াকামড়িতে দেশের লাভ কমই। তার উপর সত্যিই যদি অযোগ্য ব্যবসাদারেরা এতে সুবিধা পেয়ে যায়, তবে যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কাই আছে।

এইজগত্বেই আজ পৃথিবীর আর সব দেশেই বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এর একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে এই কাজের জন্ত। সেখানকার বিশেষজ্ঞরা বিবেচনা করেন কোনো বিজ্ঞাপনে অত্যাশ্রিতভাবে আত্মপ্রশংসা করা হয়েছে কিনা। একবার পৃথিবীবিশিখ্যাত এক গুঁড়ো দুধের কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যে সারাদিনের খাটুনের ফলে এক রকম অসুখ হয় (“Night starvation”) যাতে সারারাত ঘুমের মধ্যেই জীবনী-শক্তি (energy) ক্ষয় হতে থাকে। ফলে—ভোর বেলাতেই ক্লান্তি বোধ হয়, পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় ফেল করে, ইত্যাদি। এ অসুখ থেকে বাঁচার একমাত্র ওষুধ ঐ গুঁড়ো দুধ খাওয়া। ডাক্তারেরা এই রকম এক নতুন অসুখের খবর পেয়ে তো অবাক। খোঁজটোজ করে যখন বেরোল যে ঐ অসুখটি পরিপূর্ণভাবেই ঐ দুধের কোম্পানীর কল্পনা-প্রসূত, তখন ঐ ধরণের

বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হোল। আরেকবার এক নামকরা সিগারেট কোম্পানী দাবী করেছিল যে ঐ সিগারেট পান করলে গলার উপকার হয়। ডাক্তারেরা এই অভিনব আবিষ্কারটিকে অবিশ্বাস করায় এই ধরণের বিজ্ঞাপনও তুলে দেওয়া হয়। আবার ধরন পেটেন্ট ওষুধে অন্য় প্রচারের কথা। দু মিনিটে যক্ষ্মা আরোগ্য, তিন মিনিটে হাঁপানী নীরোগ,—এ সমস্ত বিজ্ঞাপনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটুকু তাতো জানাই আছে। বিলেত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে নিয়ম করা হয়েছে যে “পেটেন্ট” ওষুধের গায়ে তার রাসায়নিক “ফরমুলা” লিখে দিতে হবে। এই রকম নানা উপায়ে অসাধু বিজ্ঞাপন বন্ধের চেষ্টা চলছে। কিন্তু এই জাতীয় দু একটা নিয়মে আর কতটুকুই বা করা সম্ভব ?

ধনতাত্ত্বিক দেশে যতদিন বাজার নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকবে, ততদিন লোকভাঙানো বিজ্ঞাপন বন্ধ করা অসম্ভব। ঐ বিজ্ঞাপন বন্ধ করার চেষ্টা হলে ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে প্রচণ্ড প্রতিবাদ উঠবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জ্ঞ হইতো সেই প্রতিবাদ উপেক্ষা করা উচিত হবে, কিন্তু তা সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ধনতাত্ত্বিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদের মূল্য অনেক।

আরেকটা প্রশ্ন রইল—লোকভাঙানো বিজ্ঞাপনের সঙ্গে লোকজোটানো বিজ্ঞাপনের তফাৎ করবো কি করে? একটিকে বন্ধ করতে গেলে আরেকটিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। “জগুবাবুর রসগোল্লা—আহা, যেন অমৃত!”—এই বিজ্ঞাপনে রসগোল্লা কেনা হইতো অনেকে নতুন করে শুরু করতে পারে, আবার অনেকে দাণ্ডুবাবুর দোকান ছেড়ে জগুবাবুর থেকে কেনা আরম্ভ করতে পারে। তাই নিয়ম করে লোকভাঙানো বিজ্ঞাপন বন্ধ করার উপায় খুব সামান্যই। ধনতাত্ত্বিক সমাজে এই বাজে খরচটুকু বাঁচাবার উপায় নেই। সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্রে অবশ্য সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত সহজ। সরকার থেকে সেখানে কারবার চালানো হচ্ছে—তাই জনসাধারণের প্রতিনিধিরা নিজেরাই ঠিক করতে পারেন দেশের প্রয়োজনের জ্ঞ কতটা বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত। কিন্তু ধনতন্ত্রে সেই স্বেচ্ছাচারের অভাব স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। তাই বর্তমান সমাজব্যবস্থার পক্ষে বেশ খানিকটা অন্য় বিজ্ঞাপনকেও দরকারী বলে ধরে নিতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে কিছুটা বিজ্ঞাপন সমাজের পক্ষে দরকারী, আর কিছুটা অদরকারী বাজে খরচ মাত্র। কতটা প্রয়োজনীয় আর কতটা অপ্রয়োজনীয় নির্ভর করে বাজারের অবস্থা আর সমাজের ব্যবস্থার উপর।

সেদিন দেখছিলাম এক ইংরেজ লেখক বিজ্ঞাপনকে গালাগাল দিয়েছেন “অমাহুধিক” বলে। সারা পৃথিবী জুড়ে যখন লোকে খাবারের অভাবে ভুগছে, শীতে কাপড়ের অভাবে জমে যাচ্ছে, রোগে বিনা ওষুধে মারা যাচ্ছে, তখন রঙবেরঙের আলো দিয়ে মদের বিজ্ঞাপন দেওয়া তাঁর কাছে পাশবিক ঠেকেছে। তিনি বিজ্ঞাপনের ভালো দিকটা দেখতে পান নি। বিজ্ঞাপন মানুষকে দেয় সমাজচেতনা। না খেতে পেয়ে মরার সময়ে “নিয়ন লাইট”এ ভিনার এবং ভাস্কের বিজ্ঞাপন দেখে সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হওয়া যায়।

র্যান্ডম্ (RANDOM)

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়^১

‘র্যান্ডম্’ ইংরাজী শব্দ হলেও শব্দটির জনপ্রিয়তা বাংলায় ক্রমশই বাড়ছে এবং তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে পাড়ায় পাড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় ছেলেদের যে আড্ডা বসে তাইতে। “অমুক আজকাল ‘র্যান্ডম্’ মিথ্যে কথা বলছে” কিম্বা “লর্ডসে উমরিগর তখন র্যান্ডম্ পিটোচ্ছে” এই ধরণের কথা এই সব বড় সমাজসংস্কারক বা ক্রিকেট-সমালোচকদের মুখ থেকে হামেশাই শোনা যাবে। বস্তুতঃ এ রকম আরও অসংখ্য প্রয়োগ সহজেই উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ‘রাশিবিজ্ঞানে’ (Statistics) এই কথাটিই যে কতখানি মূল্যবান এবং কতখানি গুজন করে একে ব্যবহার করতে হয় জানলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

ওপরে যে কটি উদাহরণ দিয়ে শব্দটির অর্থ-সম্প্রসারণের একেবারে আধুনিক প্রগতির পরিচয় দেওয়া হল সেগুলি না হয় বাদ দেওয়া যাক। সাধারণ লোকে যখনই কতকগুলি জিনিষ একেবারেই এলেমেলো বা উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেছে নেন তখনই এ শব্দটির ব্যবহার করেন। কিন্তু রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে ওপর থেকে যা হয়ত একেবারেই পক্ষপাতবর্জিত নির্বাচন মনে হয়েছে অজ্ঞাতসারে তারই ওপর ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে—অর্থাৎ তারা যে অর্থে ‘র্যান্ডম্’ বলছেন সে অর্থে ‘র্যান্ডম্’ হয় নি।

উদাহরণ দেওয়ার আগে ‘সাম্পল্’ (sample) বলে আর একটি ইংরাজী শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকা ভাল। কোন সমষ্টি (population) সম্বন্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করার প্রয়োজন হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমষ্টির প্রত্যেককে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। যেমন যদি কোনও উপজাতির গড় উচ্চতা জানা দরকার হয় তাহলে তাদের প্রত্যেককে ধরে মাপ নেওয়ার ব্যবস্থা স্বেচ্ছাধের তো হবেই না, এমন কি সব সময় নিরাপদও নয়। তার চেয়ে তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে বেছে নিয়ে তাদের গড় উচ্চতাটা মাপলেই আমরা জ্ঞাতব্যবিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি। সোজা কথা—ভাত সিদ্ধ হল কিনা লোকে একটা ভাত টিপেই দেখে এবং ট্রেণে ‘তানসেন’গুলি কেনার সময় লোকে ছুটে “সাম্পল-গুলি” খেয়েই মন স্থির করে। সমষ্টি থেকে যে ক’জনকে পরীক্ষার জন্ত বেছে নেওয়া হয় তাদেরই বলে ‘সাম্পল্’।

সকলেই বুঝতে পারছেন এই ‘সাম্পল্’টা যে সমষ্টি থেকে নেওয়া হল সেটা তাদের প্রতিনিধিমূলক (representative) হওয়া উচিত। ‘রাশি-বিজ্ঞানের’ ভাষায় র্যান্ডম্

শব্দটির প্রয়োগ এইখানে—অর্থাৎ শ্রাম্পল্টি যদি ‘র্যান্ডম্’ হয় তবেই তাকে যথার্থ প্রতিনিধিমূলক বলে মেনে নিয়ে গ্রহণ করা হবে। ‘র্যান্ডম্’ শব্দটির অর্থ মোটামুটি এই রকম ভাবে নির্দেশ করা হয়েছে—যাদের ‘সমষ্টি’ থেকে শ্রাম্পল্টি নেওয়া হচ্ছে তাদের প্রত্যেকেরই যদি শ্রাম্পল্টিতে অন্তর্ভুক্ত হবার সম্ভাবনা সমান হয় তবেই শ্রাম্পল্টিকে র্যান্ডম বলা হবে।

তারপরেই কথা ওঠে—শ্রাম্পল্টি প্রকৃতপক্ষে র্যান্ডম হ’ল কি না কি করে বোঝা যাবে? আগেই যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে—একেবারেই এলোমেলোভাবে বা কোনও রকম নিয়মের ধার না ধরে নির্বাচন করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ‘র্যান্ডম্’ হয় না। ধরে নেওয়া যাক, অত্যন্ত সংখ্যালঘু কোনও উপজাতির সঠিক গড় উচ্চতাটা যেমন করেই হোক জানা আছে। একই ব্যক্তিকে দিয়ে বারবার শ্রাম্পল্ টানিয়ে অনেক জায়গাতেই দেখা যায় যে প্রতিবারেই শ্রাম্পল্টির গড় উচ্চতা সমষ্টির প্রকৃত গড়-উচ্চতার চেয়ে বেশী হচ্ছে। অর্থাৎ তিনি ‘র্যান্ডম্ শ্রাম্পল্’ টানতে যত চেষ্টাই করুন না কেন, নিজের অজ্ঞাতসারে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন। পক্ষান্তরে কেউ আবার অপেক্ষাকৃত খর্বকায়দের পছন্দ করতে পারেন। ‘তানসেন’গুলির ব্যাপারেও এই একই ঘটনা খুব সাধারণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকে শ্রাম্পলে সামান্য বড় ‘গুলি’ই বেছে নেন।

এখন ‘তানসেন’গুলির ব্যাপারে “উচ্চতা-সংক্রান্ত” উদাহরণের সঙ্গে একটা প্রভেদ সহজেই উল্লেখ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্বাদ-পরীক্ষার জন্তে শ্রাম্পল্ টানা হচ্ছে এবং আয়তন একটু বড় হল কি ছোট হল তাতে স্বাদের কি আসে যায়? বস্তুতঃ একথা ঠিক। যদি শ্রাম্পল্ র্যান্ডম্ না হওয়ার কারণে যে পক্ষপাত সেটা এমন কোনও দিকে হয় যার সঙ্গে পরীক্ষণীয় বিষয়ের কোনও সম্পর্ক নেই, তাহলে সত্যিই কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু মুন্সিল এখানেই যে, ওপর থেকে যা হয়ত একেবারেই সম্পর্কহীন অনেক মন দিয়ে ভাবলে বা পরীক্ষা করলে তারই ভেতর সম্পর্ক বার করা যায়। ‘তানসেন’গুলি সম্পর্কহীন হলেও অনেক খাবার জিনিষ আকৃতি-নিরপেক্ষ নয়। কিম্বা ধরুন—কলকাতা শহর থেকে পঞ্চাশ জনের একটা শ্রাম্পল্ চাই। এলোমেলোভাবে টেলিফোন ডিরেক্টরির গোটা দেশক পাতা খুলে তার প্রতি পাতা থেকে গোটা পাঁচেক করে নাম বেছে নেওয়া যেতে পারে। এখন টেলিফোন ডিরেক্টরিতে সাধারণতঃ যাদের নাম পাওয়া যায় তাদের আর্থিক অবস্থা বা আয় গড়পড়তার চেয়ে উঁচুতে এবং আমাদের পরীক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে আর্থিক অবস্থা বা অর্থের কোনও সম্বন্ধ থাকলেই শ্রাম্পল্ পক্ষপাতচুষ্ট হয়ে যাবে। আরও অসুবিধে এই যে অর্থের সঙ্গে বা আয়ের সঙ্গে যে কত জিনিষের অন্তর্নিহিত কত রকম সম্পর্ক থাকে তার হৃদিস নেই এবং ওপর থেকে তা বোঝা না গেলে পরীক্ষার ফলে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে।

আমেরিকার একটি ঘটনায় আর একটি স্বন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। ১৯৩৬ সালে

রুজভেন্ট ও রিপাবলিকানপ্রার্থী ল্যাণ্ডনের নির্বাচন-যুদ্ধের প্রাক্কালে লিটারারি ডাইজেস্ট (Literary Digest) বলে একটি কাগজ ১ কোটি লোকের একটি স্লাম্পল্ নিয়ে তাদের ব্যালটে ভোট গ্রহণ করেন। ফলাফল দেখে ল্যাণ্ডন জিতবেন বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু জিতলেন রুজভেন্ট। ফলে সাধারণ লোকে রাশি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সব কথা বলল তা কোনও হিসেবেই প্রশংসা বলা চলে না। তখন প্রকৃত রাশি-বিজ্ঞানীরা এর জবাব দিলেন। স্লাম্পল্টি মোটরগাড়ী ও টেলিফোনের লাইসেন্সধারীদের মধ্যে থেকে নেওয়া হয়েছিল। আমেরিকার শতকরা ৪০ থেকে ৫৫ জন লোক এর মধ্যে পড়েন। স্ততরাং বোঝাই যাচ্ছে বাকি লোকসংখ্যা (অর্থাৎ যাদের গাড়ী বা টেলিফোনের লাইসেন্স ছিল না) সম্পূর্ণভাবে বাদ পড়েছিলেন এবং এদের মধ্যে বেশীরভাগই রুজভেন্ট ও তাঁর 'নিউ ডিল' (New Deal)-এর সমর্থক ছিলেন। স্ততরাং এ স্লাম্পল্ থেকে উন্টো ফল পাওয়া একেবারেই বিচিত্র নয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, ঐ নির্বাচনেই 'ফরচুন' (Fortune) বলে আর একটি কাগজ প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাত্র ৩০০০ লোকের স্লাম্পল্ নিয়ে ঠিক ফল ঘোষণা করতে পেরেছিলেন।

এই সব দুর্ভাগ্য ও নিগূঢ় সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির মত দেওয়ার বামেলা কম নয় এবং রাশি-বিজ্ঞানে—যেখানে অনবরত এই সব স্লাম্পল্ নিয়ে কাজ হচ্ছে—এর পেছনে সময় নষ্ট করাও চলে না। স্ততরাং প্রায় সব রকম ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী অল্প উপায় বার করে এ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

যে সমষ্টি থেকে আমরা স্লাম্পল্ টানছি—সেই সমষ্টির প্রতিনিধি হিসেবে যদি অল্প কোনও স্ববিধাজনক জিনিষ দাঁড় করান যায় তবে হান্ধাম অনেক কমে যায়। যেমন, যে সব লোকের মধ্যে থেকে আমরা স্লাম্পল্ টানব তাদের প্রত্যেকের বদলে একটা করে তাস খাড়া করা যেতে পারে। হয়ত কোনও ক্লাসের ৪০ জন ছেলের মধ্যে থেকে পাঁচজনকে বেছে নেওয়ার দরকার। এক প্যাকেট তাস নিয়ে তার থেকে যে কোন ১২টা বাদ দেওয়া গেল। এখন প্রত্যেক ছেলেকে বাকি ৪০ খানা তাসের এক একটা দিয়ে বোঝান যেতে পারে—যেমন 'রাম-ইস্কাপনের টেক্কা', 'শাম—চিড়িতনের সাহেব', 'যহু—হরতনের বিবি', 'মধু—কইতনের বিবি' ইত্যাদি। যহু মধুর তাদের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আপত্তি করা এক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক, তবু বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তাদের কোনরকমে বুঝিয়ে ৪০টি তাস ভাল করে তাসিয়ে যে কোনও পাঁচটা টানা যেতে পারে এবং যহু ও মধুকে এই বলে আশ্বাস দেওয়া হবে যে হরতনের বা কইতনের বিবি উঠলেই তাদের স্লাম্পলে নেওয়া হবে।

এই কায়দা আরও নানা উপায়ে করা যেতে পারে। একটার সঙ্গে প্রায় সকলেই পরিচিত—সাধারণ লটারীর নিয়ম। এক রকম কাগজে সবগুলো নাম লিখে তারপর টানা। সমষ্টি বড় হলে এতে আপত্তি যথেষ্ট এবং সব ক্ষেত্রেই ইচ্ছে করলে স্ফল আপত্তি তোলা যেতে পারে। যেমন—লটারীর সব কাগজ অবিকল একরকম নয়, যাদের বড় কাগজ

তাদের স্ববিধা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের সাধারণ নিয়মগুলির মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করাই সবচেয়ে শক্ত যদিও চেষ্টা করলে টানা-সংক্রান্ত ব্যাপারে করা যায়। আর সবচেয়ে অস্ববিধা এই যে, প্রণালী র্যান্ডম্ কি না সে বিষয়ের কতকগুলো পরীক্ষা আছে এবং সেগুলি এদের ওপর প্রয়োগ করে দেখান খুব কঠিন অর্থাৎ আপত্তির হুজুগ তুললে ঠাণ্ডা করা মুশ্কিল।

এ সব-কিছুর হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাবার জন্তে রাশি-বিজ্ঞানীরা যা তৈরী করেছেন তার নাম র্যান্ডম্ স্যাম্পলিং নাম্বার। জিনিষটার চেহারায় বিশেষত্ব কিছুই নেই • থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি পর পর এলোমেলোভাবে পাতার পর পাতা এই রকম সাজান আছে :—

২৩ ১৫ ৭৫ ৪৮ ৮৩ ৭২ ৫৯ ৯৩ ৭৬ ২৪
৯৭ ০৮ ৪৮ ৯৬

এদের সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ এই যে এরা একেবারে একটানা—কোথাও স্তর বা শেষ বা বিরতি নেই—অর্থাৎ যেখান থেকে খুলী স্তর ধরে যেখানে খুলী শেষ করা যেতে পারে। মাঝে মাঝে যেটুকু ফাঁক দেখা যাচ্ছে সেটুকু শুধু ছাপা ও ব্যবহারের স্ববিধের জন্ত। প্রকৃতপক্ষে জিনিষটা এই রকম—

২৩ ১৫ ৭৫ ৪৮ ৮৩ ৭২ ৫৯ ৯৩ ৭৬ ২৪ ৯৭ ০৮ ৪৮ ৯৬

এক লাইনের তলায় আর এক লাইন বসান হয়েছে তার একমাত্র কারণ কাগজের প্রস্থের সীমাবদ্ধতা। আর প্রধানতঃ দুটি নিয়ম মেনে এগুলি তৈরী করা হয়েছে—(১) যে কোনও স্থানে—• থেকে ৯ পর্যন্ত অঙ্কের আসন লাভ করার সম্ভাবনা সমান এবং (২) একটি স্থান পূরণের সঙ্গে আর একটি স্থান-পূরণের কোনপ্রকার সম্বন্ধ নেই।

এগুলির ব্যবহার যত্ন মধুর উদাহরণ দিয়েই বোঝান চলতে পারে। ৪০ জন ছেলের প্রত্যেককে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট এক একটি সংখ্যা দিয়ে বোঝান যায়। যাদের সংখ্যা '১', '২' বা '৯' ইত্যাদি হবে তাদের যথাক্রমে ০১, ০২, ০৯ ইত্যাদি বলে ধরা হবে। র্যান্ডম্ স্যাম্পলিং নাম্বারের যে কোনও পাতা খুলে যে কোনও সংখ্যা থেকে কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। যদি ওপরে যেটুকু দেওয়া আছে তার '৮' থেকে কাজ শুরু হয় তাহলে—৮৮, ৩৭, ২৫, ৯৯—এমনিভাবে সংখ্যাগুলিকে নেওয়া হবে এবং ৮৮, ৯৯ ও ৪০-এর চেয়ে বড় অঙ্ক সংখ্যাগুলিকে বাদ দিয়ে ২৫, ৩৭ এগুলিকে গ্রহণ করা হবে অর্থাৎ তারা যে যে ছেলেগুলির নম্বর তাদের নেওয়া হবে। পাঁচটি ছেলেকে পাওয়া গেলেই স্যাম্পল্ গ্রহণের কাজ শেষ হবে।

দুই অঙ্ক বিশিষ্ট ১০০টি সংখ্যা আছে ০০—৯৯। এক্ষেত্রে আমরা মাত্র ৪০টিকে ব্যবহারের উপযোগী মনে করছি—ফলে গ্রহণযোগ্য নয় এমন সংখ্যা এখানে বড় বেশী দাঁড়ায়। এই অস্ববিধা নিবারণের জন্ত "ভাগশেষ নিয়মের" প্রবর্তন করা হয়। অর্থাৎ ৪১কে

আমরা বরখাস্ত করব না—৪০ দিয়ে ভাগ করব এবং ভাগশেষ যে ছেলেটির সংখ্যা (এখানে '০১' নং ছেলেটি) তাকে গ্রহণ করব। অর্থাৎ ৪৪ আর ০৪, ৫৪ আর ১৪ একই ছেলেকে বোঝাবে।

কিন্তু এত করেও গ্রহণের অযোগ্য সংখ্যা একেবারে নিশ্চূল করা যাবে না। কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে—প্রথম ছেলেটি তার প্রতিনিধি হিসাবে তিনটি সংখ্যা পাচ্ছে—১, ৪১, ৮১ এবং ১২নং ছেলেটি পর্যন্ত প্রত্যেকেরই তিনটি করে সংখ্যা আছে। কিন্তু তারপর থেকেই প্রত্যেকের মাত্র দুটি করে যেমন ৩০নং পাচ্ছে ৩০ ও ৭০। সুতরাং র্যান্ডম্ স্যাম্পলিং নাথার—যাতে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সব সংখ্যারই আসার সম্ভাবনা সমান—ব্যবহার করলে প্রথম ১২ জন ছেলের স্যাম্পলে আসার সম্ভাবনা বাকি সকলের চেয়ে বেশী হয়ে যায়। সুতরাং সাম্যের দোহাই দিয়ে ৮১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা পেলেই বরখাস্ত করতে হবে। একই কারণে ০০ ও ৮০-র মধ্যে একটিকে বাদ দিতে হবে।

কিন্তু “র্যান্ডম্ স্যাম্পলিং নাথার”-এর চেহারা যতই সাদাসিধে হোক না কেন, পূর্নোন্নিখিত দুটি সর্ভ পালন করে তৈরী করা খুব সোজা নয়। নানা রকম ভাবে তৈরী করা যেতে পারে—তবে বর্তমানে যে সব উপায় বেরিয়েছে তারই একটির উল্লেখ করা হচ্ছে। একটি গোল চাকাকে দশটি সমান ভাবে ভাগ করে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত, এক এক ভাগে বসান হয়। তারপর সেটি জোরে ঘোরান হয়। এই চাকার পাশে একটি কাঁটা থাকে। ঘুরন্ত চাকার উপর মাঝে মাঝে হঠাৎ এলোমেলো আলো ফেলা হয় এবং এত কম সময়ের জুগে যে চাকাটিকে স্থির মনে হয়। সেই মুহূর্তে ঐ কাঁটাটির সামনে যে সংখ্যাটি পড়ে সেটিকে লিপিবদ্ধ করা হয়। এইরূপে সমস্ত র্যান্ডম্ স্যাম্পলিং নাথার তৈরী করে ফেলা হয়।

কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধিমানেরা ধরে বলবেন—“বাপু, তোমার মাঝে-মাঝে হঠাৎ এলো-মেলো আলো ফেলার মানে কি?” ধরেছেন ঠিক। আসলে সত্যিই এগুলি “র্যান্ডম্ আলো-ফেলা” কথাটি চাকার প্রচেষ্টা। তাহলে গোড়ায় সেই গলদ থেকেই যাচ্ছে অর্থাৎ “র্যান্ডম্ স্যাম্পলিং নাথার” তৈরী করার সময়ই র্যান্ডম্ আলো ফেলার প্রয়োজন হচ্ছে। প্রকৃত বুদ্ধিমানের প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। শুধু এইকথাই বলা যায় যে, সাধারণ বা প্রচলিত অর্থে এলোমেলো আলো ফেলে যে র্যান্ডম্ নাথার তৈরী হয়েছে তা নানারকম পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সত্যিই র্যান্ডম্ এবং এইটেই সবচেয়ে বড় কথা। অর্থাৎ ফলাফল দিয়ে আলো ফেলার বিরুদ্ধে কোনও পক্ষপাত প্রমাণ করা যায় নি। র্যান্ডম্ স্যাম্পলিং নাথার তৈরীর প্রায় সব প্রণালীতেই এটুকু অভিযোগ থাকে এবং সর্বত্রই একই জবাব দিতে হয়।

এ প্রবন্ধ পড়ে কেউ যদি মনে করেন যে সবসময় র্যান্ডম্ স্যাম্পলিং নাথার পকেটে করে ঘোরা উচিত এবং ট্রেণে তানসেন গুলি খাওয়ার সময় পর্যন্ত এই করে গুলির সংখ্যা গুণে যথাযোগ্য অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা প্রত্যেক গুলিতে লাগিয়ে স্যাম্পল মুখে ফেলা উচিত তাহলে

আমায় সত্যিই ভুল বোঝা হবে। আমি শুধু বলতে চাই যে র্যান্ডম্ শব্দটির পাতার ছেলেদের মুখে যত 'র্যান্ডম্' ব্যবহারই হোক না কেন বা যতই হালকা বোধ হোক না কেন, এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে এর গুরুত্ব যথেষ্ট এবং কেবল এই একটি মাত্র শব্দকেই যথাযথ প্রয়োগ করার জন্য বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট কাঠ-খড় পোড়ান।

গ্রন্থ-পরিচয়

অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য

উড়ো চিঠির ঝাঁক : অশোকবিজয় রাহা ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ আড়াই টাকা ॥

কোনার্ক : জীবনকৃষ্ণ শেঠ ॥ ডি. এম. লাইব্রেরী ॥ দেড় টাকা ॥

ইয়ানের ভূমিকম্প, ফরমোসা থেকে আইসেনহাউয়ের ৭ম রণতরী বাহিনী অপসারণ, সিকিউরিটি বিল, উদাস্ত বেকার যুবকের রেলএঞ্জিনের তলায় আত্ম-নিষ্ক্ষেপ, শতাধিক চা-বাগান বন্ধ, হাজার হাজার বেকার শ্রমিক, রোজেনবার্গ দম্পতির প্রাণরক্ষার জন্য পোপের আবেদন—

এমন সময় পড়লাম অশোকবিজয় রাহার 'উড়ো চিঠির ঝাঁক' এবং জীবনকৃষ্ণ শেঠের 'কোনার্ক'। ছ'জনই কবি-ভ্রাম্যমাণ। একদিকে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তরেখা, আসাম-মণিপুরের রূপময় উল্লসিত হ্রদ, 'দূরে হ্রদের বুকে নোঙর-করা বড়াল-পর্বত' টিলা বাংলো, অশুদ্ধিকে কলিঙ্গ দেশের সমুদ্রকল্লোলমুখর বিজয় বালুকাবেলায়' অতীত ভারতের ইতিহাসের চিরজাগ্রত শিল্পদূত কোনার্কের সপ্তাশ্রবাহিত স্বর্ধমন্দির।

অশোকবিজয়ের চিঠিতে উল্লসিত হ্রদ, সেখানে' হ্রদের বুকে রঙের হোলিখেলা, ঘাসের উপর হীরে-পান্নার কুচি ছড়ানো, গোলমোর ডালে তোড়া তোড়া সোনালি রোল, পাখীর পাখায় রঙের রামধনু' সেই অপরূপ সৌন্দর্য-লোক এক মুহূর্তে যেন আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হোলো। অমিয় চক্রবর্তীর 'অভিজ্ঞানবসন্ত' কাব্যের কয়েকটি কবিতা এমনি বিচিত্র রূপ-মায়া একদিন রচনা করেছিল। অশোকবিজয়ের কাব্য পড়েও বলতে হল: "কী মায়া লাগল চোখে!"

আর জীবনকৃষ্ণের কোনার্ক সম্পর্কিত কবিতাগুলি পড়তে পড়তে উদ্ভাসিত হোলো রহস্যহার, চলে গেলাম স্তব্ধ অতীতের মহশ্ব স্মৃতিমুখর অর্কতীর্থে, বহু শতাব্দী পূর্বের বিশু মহারাণার পুত্র ধর্মপদের জগতে, তার মহান আত্মবিসর্জনের দৃশ্যকাব্যে। আর দেখলাম গৌরীস্বামীতরীর মত ছুটে-চলা 'নোয়ানহ', ভূতপাত্রীর দেশ, স্বর্ধ-ডোবার মাঠ, যেখানে 'অন্ধকার অবরোধী হয়, প্রেতলোকের ছায়া নামে, ঝিম আলোকে বালিগাড়ি দংশী বিকাশ করে।'

অশোকবিজয়ের কাব্যে মায়ায় বর্তমান, জীবনকৃষ্ণের কাব্যে স্বপ্নময় অতীত। অশোকবিজয় লিখেছেন

মনের চাষি হারিয়ে গেছে অনেক দিন

হঠাৎ সেদিন কুড়িয়ে পেলাম সকালবেলা

উল্লসিত হ্রদে।

সত্যিই তাই, প্রায় দীর্ঘ একষুগ আগে পড়েছিলাম :

তোমার দেশে আজ এসেছি মেয়ে,
এসেই দেখি বনের পাখা বৃষ্টি ঝেড়েছে
কচি পাতায় সোণালি রোদ খিল খিল,
ডালিম গাছে কাঠবিড়ালির ছুটোছুটি
ঢালুর ঘাসে হরিণ-শিশুর খেলা।

তোমার মুখে চেয়ে দেখছি মেয়ে,
তোমার কাণে দুটি লাল কাঞ্চনফুল
বেণীতে সোনালতা,
তোমার বুকে কমলা-রঙের কাঁচুলি
কটিতে মেঘ-ডগ্বরী,
তুমি কোথায় চেয়ে আছ কে জানে !

[জল উষ্মর পাহাড়]

আর আজ পড়ছি :

কিন্তু লালবাগের আরেকটি ঝর্ণাকে ভুলতে পারছি নে
একেবারে কাছে গিয়ে দেখেছি
পাহাড়ের বুক মুখ গুঁজে কাঁদছে
পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে এক রাশ এলোচুল
হু'পাশের চূর্ণ চুলগুলি হাওয়ায় উড়ছে।

[উড়ে চিঠির ঝাঁক, ৪১ পৃঃ]

ঝর্ণা, হৃদ, ঢালুপাহাড়, পাটল রঙের নদী যে এমন ঝর্ণাটুকু নিয়ে অশোকবিজয়ের কাব্যে আত্মপ্রকাশ করে তার মূলে তাঁর মন, তাঁর চোখ। জগতের ও দেশের বিভিন্ন সমস্যা যে তাঁর মনকে উদ্বেল করে না তা নয়, কিন্তু তাঁর মনের সহজাত প্রশান্তিতে আবার জেগে ওঠে ডিহাং-নদীর বাঁক, ভানুসতীর মাঠ, জল-উষ্মর পাহাড়, ডলুর হ্রদ। তিনি এই রূপনাথের দেশে আজন্ম মানুষ, তাই তাঁর কবিতা এমন সতেজ যাকে প্রাকৃত-বাংলায় বলা উচিত, তাজা, টাটকা। কোনও কৃত্রিমতা, বস্তব্য ও বাহনের কোনও গতানুগতিকতা তাঁর রচনাকে স্পর্শ করে না। তাঁর 'ইমেজ' বা রূপকল্প অভিনব, কিন্তু অবোধ্য নয়। তার কারণ তাঁর মন একেবারেই বুদ্ধিবিলাসী নয়, শ্রাণরসে তাজা। এই উজ্জ্বল শ্রাণরসেই অশোকবিজয়ের কাব্য ছ্যাপ্তিমান।

'উড়ে চিঠির ঝাঁক' আমার কাছে খুলে ধরল রঙ-ভরা ছবির ঝাঁক। ছবির পর ছবি, কথার তুলিতে কী এত রঙ ধরে? কথার বীণা কী অনন্তধরা? আমি পাতা ওলটাই। আর :

“চোখ বুজি—হাওয়ার ফিস্‌ফিস, মোঁমাছিদের গুঞ্জন, পাখির শিশু
চোখ খুলি—হৃদ, পাহাড়, সোনালি রোদের সকাল
পাহাড়ি সকাল—পাহাড়ি ‘মোঁ’—

আবার চোখ বুজি

—পানকোড়ি ?

চোখ খুলি—

ইরিনি !

—কানে কাঙ্কন ফুল

—কোলে তরমুজ

ইরিনি !

হালকা চুল

পাতলা ঠোঁট

নীল চোখ

ইরিনি !

[পৃঃ ৪-৫]

অশোকবিজয় যাত্রার শিল্পী। তিনি তাঁর তুলির টানে টানে যে রঙ-রেখা বিছাশ করেছেন, তার মধ্যে সহজ বর্ণাঢ্যরূপের সঙ্গে সার্থক রস-ব্যঞ্জনার হরগৌরীভ হৃষ্ট হয়েছে। স্বরাঙ্কর কয়েকটি শব্দের কী আশ্চর্য শক্তি :

চুলে উড়ে মেঘ

চোখে নীল পাহাড়

খিলখিল ঝর্ণার হাসি—

বন-পরি।

মংরকে পরিত্যে পেয়েছে।

পাহাড়ী মেয়ের ছবি। পাহাড়ের মেঘ আর ঝর্ণায় উপমিত এমন জীবন্ত মেয়ের ছবি অশোকবিজয়ের তুলিই আঁকতে পারে।

‘উড়ে চিঠির ঝাঁক’ কাব্যে কবি শুধু নিসর্গের মায়াবিনী রূপের চলচ্চিত্র রচনা করেই ক্ষান্ত হননি। সেই নিসর্গের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে নর-নারী, চুমকি-ঝামঝাম তাদের টুকরো টুকরো ছবি সহজ বর্ণনার চেয়ে অথচ তুলন্ত রেখায় অঙ্কিত :

চুমকিকে দেখেছি সেদিন

দাঁড়িয়েছিল গেটের কাছে

পিঠে এলিয়ে পড়েছে আঙুরগুচ্ছের মতো একরাশ এলোচুল

শিরীষ গাছে অনেকক্ষণ ধরে কী দেখছিল

হয়তো কোনো পাখি,

গেটের ওপাশে

ছুরি হাতে তুরন্ত কাটার বেড়া ছাঁটছিল ঝামঝাম।

[পৃঃ ১১]

দক্ষশিল্পিত্ত রেখার বলিষ্ঠতা অশোকবিজয় আয়ত্ত করেছেন। ইরিনি, ধনেশ সিং, চুমকি, সিংজি, বাঘ-সর্দির

দেশমুখ প্রভৃতির ছবি ছু একটি কথার আঁচড়ে এমন উজ্জ্বল পরিপূর্ণতা পেয়েছে যে অন্ততঃ একটি উচ্কৃতি দেবার লোভ সংবরণ করা হুঃসাধ্য :

হঠাৎ চোখে পড়ে বাঁধের ওপারে পাথর টিলায়
বর্শা হাতে ও কে দাঁড়িয়ে ?
জঙ্গী খাঁ পাঠান
মস্ত পাগড়ি মাথায়
মেহেদি-রাঙানো দাড়িতে হুর্বাস্তের আলোর রঙের আঁশুন লেগেছে
তুই চোখে ঈগল-দৃষ্টি । [পৃঃ ৫২]

অথবা রাস-নৃত্য শেষে ধনেশ সিংহের বোড়কর স্তম্ভ মূর্তি ।

কিন্তু ডলুর হুসে আরও আছে হাইড্রো-ইলেকট্রিক গ্লাস্ট । আধুনিক যুগ যদিচ বহুযুগ, আমাদের কবিতা এতই স্পর্শকাতর যে বহুযুগের মনোযুতি তার প্রকৃতিতে সক্রিয় হলেও যন্ত্রের রূপায়ন প্রায় বর্জিত বলা চলে । শক্তিমান কবির হাতে নিসর্গ ও যন্ত্র উভয়ই শিল্পরূপ লাভ করতে সক্ষম । অশোকবিজয়ের রোমান্টিক মানস বহুকেও রোমান্টিক করে তুলেছে :

প্লুইস-গেট--
বড়ো বড়ো চাকার দাঁতে আটকানো লোহার শিকল
তাতে ঝুলছে অনেকগুলো ভারি কার্ঠের কপাট
নিচের ফাঁক দিয়ে হুদের জল ছুটে পালাচ্ছে
জলের চিকনির মতো
অথবা
উদ্বাহ ফ্লাই-হইল ঘুরছে—তা-বিন্ তা-বিন্
কোটি চলন্ত চাকা
অসংখ্য বেস্ট পাখা ঝাপটাচ্ছে ঝটপট
ঘুরে ঘুরে মাতালের মতো টলে টলে নাচছে ব্লোলিং মেশিন
ড্রায়ারের আনন্দ-উত্তাপ কত ডিশ্রি উঠেছে কে জানে ।
অবাক্ কাও !
ঐ তো সিফটিং মেশিনের সিঁড়ি বেয়ে
লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে চায়ের ঝর্ণা— [পৃঃ ১৫]

যে কবির মন এমন রূপরসিক, রূপাঞ্জন যাঁর চোখের পাতায় পাতায়, তাঁর স্বপ্নলোকও বিচলিত হয়েছে । অবশু অশোকবিজয় দেশ ও দেশের সমগ্রাকীর্ণ জগত থেকে কোনদিনই পলায়ন করতে চাননি । তাই তিনিও স্বপ্ন দেখেন :

হুরবিন টিলার ওপর দিয়ে ক্যারাভান যাচ্ছে
অনেকগুলো ট্যাক্স আর সাঁজোয়া
আকাশে চলেছে জঙ্গী বিমানের টহল
পাহাড়ের এখানে ওখানে ধোঁয়া উড়ছে

বোমা আর শেল ফাটছে
 ঝুঝুঝু ক'রে ধূলি হয়ে ঝরছে পাথর
 একটা পাথর-টিবির আড়াল থেকে ব্রহ্ম-গান ছুঁড়েছে ও কে ?
 নংথু সর্দার !

যুদ্ধ ও গণ প্রতিরোধের কী মহান ছবি ! কিন্তু তারপরেও কবি আশা করেছেন উজ্জ্বল স্বর্ণপ্রশু দিনের .

ডলু নদীর তীরে মাঠের মাঝখানে একটা মস্ত ট্রাকটর
 কে চালাচ্ছে ?
 হ্রদের বুক থেকে উড়ে আসে এক লাল পরি
 পাখা মেলে ট্রাকটরে বসে—
 ইরিনি ।

‘লাল পরি’ শব্দটি গভীর সংকেতবহু । এই স্বপ্ন দেখার পেছনে আছে কবির স্বস্থ, যৌথ ও মুক্ত সমাজের
 বলিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ।

*

*

*

‘কোনার্ক’ জীবনকৃষ্ণের প্রথম কবিতার বই । ১৩৪১ থেকে ১৩৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি যেসব কবিতা
 লিখেছেন সেগুলি থেকে বাছাই করে মোট ২১টি কবিতা এই কাব্যে প্রকাশ করেছেন । ‘কোনার্ক’ নামে
 গ্রন্থের যে অংশ বিশেষরূপে চিহ্নিত তার অন্তর্গত কবিতাগুলির সঙ্গে অগ্ৰাণ্য কবিতাগুলির শুধু যে কালগত
 ব্যবধানই আছে তা নয়, কবি মনের পরিণতির দিক থেকেও সেই ব্যবধান লক্ষ্য করবার মতো । ‘শেষানন্দ’,
 ‘অপর্ণা’, ‘বুদ্ধদেব’ প্রভৃতি কবিতা—‘প্রেম’, ‘আনন্দ’ প্রভৃতি সনেট আমার কাছে গতানুগতিক বলেই মনে হয়েছে ।
 ঐ কবিতাগুলিতে তিনি প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেছেন । কোথাও বা মোহিতলালের স্পষ্ট ছায়াপাত ।
 যে কয়টি কবিতা আমার মনোহরণ করেছে যথা, জন্মান্তর, ধর্মপদ, কোনার্ক স্বর্ধমন্দির ও ময়ূরাক্ষী—রচনাগুলিতে
 কবি নিজের গোত্রধর্ম খুঁজে পেয়েছেন এবং স্বকীয়তার উজ্জ্বল অভিজ্ঞান উল্লেখিত কবিতাগুলিতে স্বাক্ষরিত ।

‘কোনার্ক’ এক ‘স্মৃতিত পাষণ্ডা’ । এর ভগ্ন-মন্দিরের স্তম্ভে, খিলানে, প্রাচীরে, চূড়ায় কতো বিম্বৃত কাহিনীর
 মহাকাব্য স্তব্ব হয়ে রয়েছে । স্মরণেবতার যে রসোচ্ছল নৈবেদ্য একদিন মহাশিল্পী সাজিয়েছিল, পিতৃসম্মান
 রক্ষার জন্ম যে শিল্পিপুত্র আপন প্রাণ বিসর্জন করেছিল তারা সবাই কবি-যাত্রিনয়নে কায়মূর্তি ধরে যেন আবিভূত
 হয়েছে । সেই ভয়-মধুর রোমাঞ্চকর অনুভূতিটি, অননুসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে জীবনকৃষ্ণ রূপায়িত করেছেন :

কে যেন এসে দাঁড়ায় মন্দির লগ্ন কূপতটে
 অশ্রুগলিত চোখে নিচের দিকে চেয়ে—চেয়ে থাকে
 কে জ্যোতির্ময় কিশোর দেবতা যেন তলিয়ে যাচ্ছে,
 আরও—আরও নিচে যায় তলিয়ে
 গুহারাঙ্কসীর নীরঞ্জ অন্ধ অতলান্ত গভীরে ।
 প্রেতায়িত সেই ছায়া অসহায় আর্ত চীৎকার করে ওঠে
 “মুক্তি দাও, মুক্তি দাও !”

[কোনার্ক স্বর্ধমন্দির]

আমি কাব্যে মিশ্রণতত্ত্বের পক্ষপাতী । রবীন্দ্রনাথের হাতে এর সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটেছে । কড়িকোমলে, সংস্কৃত-
 লৌকিকে যে সংগীত জন্ম নেয় তার ঐশ্বর্য আমি জীবনকৃষ্ণের কাব্যে লক্ষ্য করে খুশি হয়েছি । এই মিশ্রণে
 জোর-জবরদস্তি নেই, কৃত্রিমতা নেই, যমজ ভ্রাতার মতই এরা অঙ্গলগ্ন :

এক বলক আলো, একটা কলকণ্ঠ উল্লাস,
 বাতায়ন পথে চোখে পড়ল একখানি আনত সুন্দর মূর্তি,
 কানে হীরার ঢুলটি ঝকঝক করছে
 যেন ময়ূরাক্ষীর প্রতিহত-রাশ্মি অতল স্বচ্ছতা,
 উতলা ময়ূরাক্ষী ।
 মুহূর্তে সবার মাঝে এসে দাঁড়ালেম ।

[ময়ূরাক্ষী]

এই প্রসঙ্গে মনে হোলো অশোকবিজয়ের শব্দচয়ন ও উপমাভয়ন তাঁর রোমান্টিক মানসের স্পর্শবহ। বেশির ভাগই তুলি ও রঙের কাজ। কোথাও বা রেখা ছাড়িয়ে ইসারা। জীবনকৃষ্ণের লেখায় ক্লাসিকাল রীতিই সার্থকতর। উদ্ভূত হ্রদ, সূর্য-ভাঙা কুমকুম বার জলে, তার রূপচিত্র রোমান্টিক। কিন্তু শত শত শতাব্দীর কল্পিত সমুদ্রতীরের 'শিলামস্তব ওঙ্কারধ্বনি'কে ধ্বনিত করতে ক্লাসিকাল রীতিই সার্থকতর বাহন। একদিন ধ্যানমগ্ন শিল্পী ঝক প্রসুর গায়ে জাগিয়েছিল রূপশ্রী, প্রসুররূপ ফোঁদিত ক'রে রচনা করেছিল সৌন্দর্যের আদিহৃৎ নৃত্যপরা নারীর হস্ত-লাস্ত-কটাক্ষছটা, সূর্যের ধাবমান সপ্তাধ—আর কবি জীবনকৃষ্ণও তাঁর নিপুণ কলমের-বাটালিতে সংস্কৃত শব্দের অদ্বৈত মূষম বিছানো সৃষ্টি করেছেন গম্ভীর মহান নব-কোনার্ক :-

এমন সময় এল ধর্মপদ, বিশু মহারাণার

ফেলে-আসা-সন্তান ।

নারী বুঝি পাঠালে তার শেষ নিশ্বাস—শেষতম অর্ঘ্য ।

আজ সে তরুণ, নবাবুগছাতি ধর্মপদ,

সুদীর্ঘ সূর্যম দেহ, অগ্নিরসে-ঢালা, শ্যামবহি শিখা,

প্রতিভার নিঃসংশয়িত স্বাক্ষর দৃষ্টিতে ।

তাপসী মার কাছে তার শিল্প দীক্ষা,

সে দীক্ষা অগ্নিদীক্ষা ।

দিনের পর দিন সে তার মাকে—তপঃকুশা পার্বতীকে দেখেছে

কখনও মনে হয়েছে সঞ্চাঙ্গিনী দীপশিখা

ললাটে সিন্দূরবিন্দু, মূর্তিময়ী কল্যাণ

কখনও মনে হয়েছে তীক্ষ্ণদীপ্তি বিদ্যুৎস্রোত, মূর্তিমতী তপস্রা ।

আঠেশব সে স্তম্ভপান করেনি, পান করেচে অগ্নিরস,

তাই মূর্তি তার অনলার্কছাতি—অতুলনকাস্তি ।

[ধর্মপদ]

মস্তুর মত এর সংগীত, ফোঁদিত এর শব্দচিত্র ।

জীবনকৃষ্ণের রচনায় মাঝে মাঝে সংস্কৃত কাব্যপংক্তি বা রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরণ যোজনা তাঁর পণ্ডিত-রসিক মনের পরিচয় দান করে। কিন্তু সর্বত্রই যে তাঁর শিল্পকৌশল সার্থক হয়েছে একথা আমি বলবনা, যেমন :-

দেখতে পেলুম এই পাষাণীকে ঘিরে বয়ে চলেছে

নিত্য কালব্যাপী আনন্দরূপমমৃতম-এর অবিরল প্রবাহ

মকরকেতু উড়ছে মধুপবনে

জলছে উন্নত কামনার লোলুপ লেলিহাশিখা

রক্তি-বিলাসের উচ্চত, উদ্ধত বিজয় নিশান ।

[কোনার্ক সূর্যমন্দির]

আমার কাছে রেখাঙ্কিত পদটির বিস্তার ভালো লাগেনি। রবীন্দ্রনাথের এই পদটিতে ক্লাসিক্যাল ব্যঙ্গনা মোটেই ফুটে ওঠেনি।

জীবনকৃষ্ণ ও আশাবাদী কবি। বর্তমানের বুকে দাঁড়িয়ে তিনি অতীতকে অনুভব করেছেন আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছেন। সে-স্বপ্ন স্বর্ষ-বন্দনার স্বপ্ন :

দূরপথ অতিক্রম করে আসছে তারা

উদয়াচলের পথে জ্যোতিষ্মান পথিক,

ললাটে তাদের অর্ক-আশীর্বাদ,

বলকিত হ্যুতি যার প্রতিহত হয়ে

অজানিত অন্ধকার পথ অব্যাহিত করেছে তাদের সামনে।

হুঃখব্রত পাছ—আজীবন তপস্বী তাদের পথ।

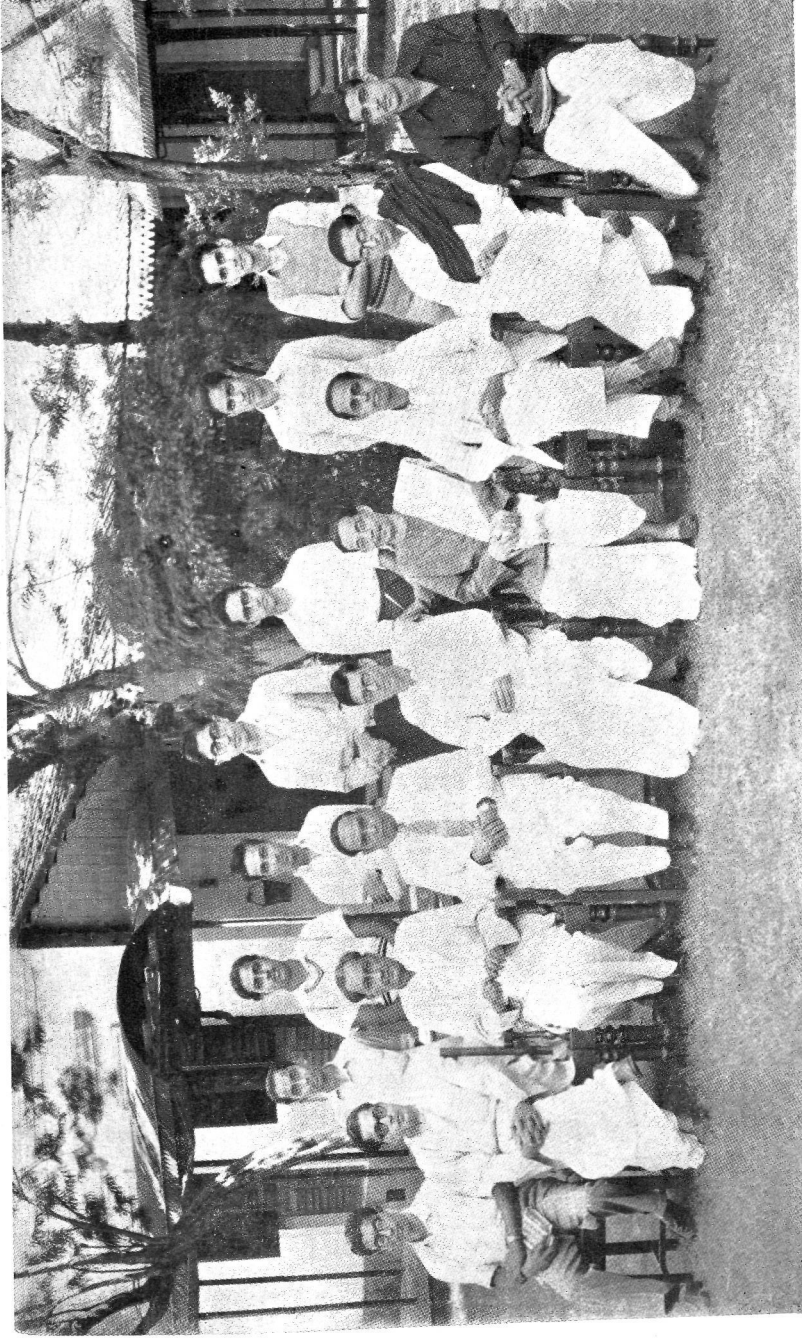
তারা সমাপ্ত করবে তাদের ব্রত—

আর প্রতিষ্ঠিত করবে তোমার মহিমা।

[শুল্কবেদী]

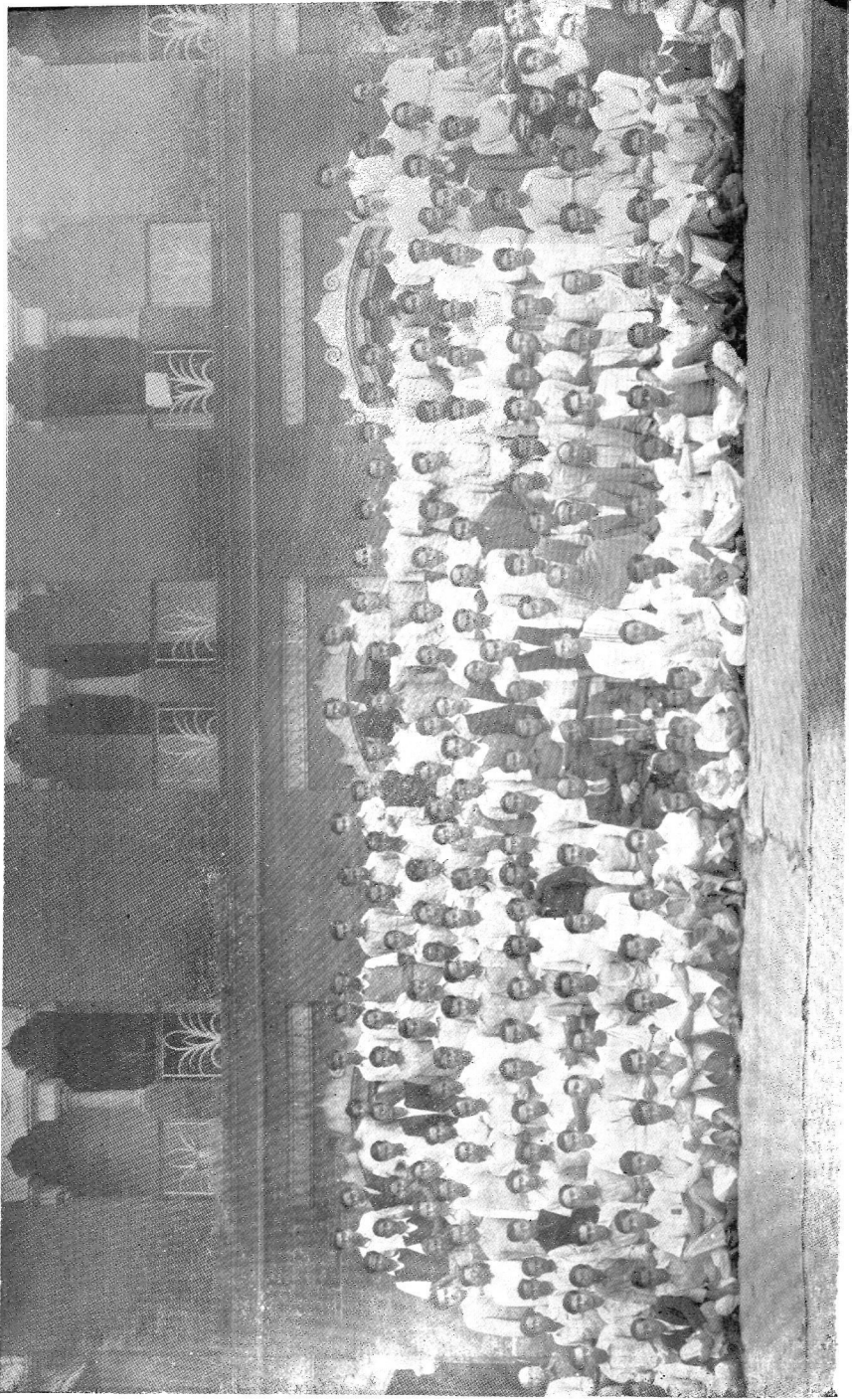
কাব্য ছুখানি আমাকে আনন্দ দান করেছে এই আমার সুখ্য কথা ॥ আপনারা পড়ে দেখুন ॥

PRESIDENCY COLLEGE STUDENTS' UNION COUNCIL
EXECUTIVE COMMITTEE, SESSION 1951-52



Front Row (Left to right)—Bata Krishna De (Vice-President), Prof. A. Mazumdar Prof.-in-Charge, Debate), Prof. S. C. Sarkar, Dr. J. C. Sen Gupta (Principal), Prof. J. Chakravarty (Prof.-in-Charge, Social Service), Dr. M. Ghosh (Prof.-in-Charge, Drama), Prof. S. Roy (Bursar), Prof. D. Bhattacharya (Prof.-in-Charge, Rabindra Parishad), Sumiti Bhose (Gen. Secy.).

Back Row (Left to right)—Kalyan Das Gupta (Publication Secy.), Sanjib Biswas (Jr. Treasurer), Ranjit Chatterji (Asst. Gen. Secy.), Barun De (Debate Secy.), Arup Roy (Rabindra Parishad Secy.), Kajal Dutta Gupta (Jr. Common Room Secy.), Sambit Chatterjee (Social Service and Acting Drama Secy.).



Rastrapati Dr. Rajendra Prasad with the Principal, the Superintendent and boarders, past and present, of the Eden Hindu Hostel during his visit there on the 24th October, 1952.

আমাদের কথা

রাষ্ট্রপতির শুভাগমন :

গত ২৪শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ আমাদের কলেজে পদার্পণ করেন। স্বাধীনতালাভের পর এই প্রথম দেশের অধিনায়ককে কলেজের পুরাতন ছাত্ররূপে অভ্যর্থনা করার সুযোগ হল আমাদের। রাষ্ট্রপতিও প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে তাঁর ছাত্রজীবনের সাধনক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের শুভ অবকাশ প্রাপ্ত হলেন। ১৯০২ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ইডেন হিন্দু হস্টেলের আবাসিকও ছিলেন। তাই এই দিন সর্বপ্রথম তিনি তাঁর পুরাতন ছাত্রাবাস পরিদর্শন করেন। তাঁর আসার নির্দিষ্ট সময় ছিল সকাল নাড়ে ন'টা, কিন্তু তার কিছু আগেই তিনি এসে পৌঁছান। ছাত্রাবাসের প্রবেশদ্বারে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ ডক্টর যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ছাত্রাবাসের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানার্দন চক্রবর্তী এবং ছাত্রাবাস-সম্পাদক শ্রীমুগালকান্তি মল্লিক। একজন আবাসিক রাষ্ট্রপতিকে মাল্যভূষিত করেন। তারপরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় একতলায় যে ঘরে তিনি একসময় কিছুদিনের জন্ম বাস করেছিলেন। বর্তমানে এই ঘরটি Visitors' Room-এ পরিণত হয়েছে। দোতলায় বা এনং ওয়ার্ডে তিনি যে সব কক্ষে দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন, শারীরিক কারণে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পুরাতনস্মৃতিবিজড়িত ঘরটিতে রাষ্ট্রপতি তাঁর সমসাময়িক আবাসিকদের মধ্যে যাঁরা এই উপলক্ষে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেকার দিনের মত বিশ্রান্তালাপ করলেন। অতীতের আবাসিকদের সঙ্গে মিলনের পর ছাত্রাবাসের বৃহৎ প্রাঙ্গণের এক কোণে বর্তমান আবাসিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির একত্রে ছবি তোলা হয়। তারপর প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করার সময় রাষ্ট্রপতি ছাত্রাবাসের আধুনিক পবিত্রনগুলি লক্ষ্য করেন। পরিশেষে ছাত্রাবাসের প্রবেশদ্বারে খোদিত স্মৃতিফলকটি দেখে রাষ্ট্রপতি কলেজের দিকে অগ্রসর হন।

ইতিমধ্যে যথাবিধি অভ্যর্থনার জন্ম অধ্যক্ষ মহোদয় কলেজে চলে এসে আল্পনাশোভিত সোপানের পাশে সনদলবে অপেক্ষা করতে থাকেন। অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রপতি প্রধান প্রবেশদ্বারে অবতরণ করলেন। শঙ্খনি দ্বারা অভ্যর্থনার শুভসূচনান্তে অধ্যক্ষ মহাশয় কলেজের বর্তমান পরিচালকসমিতির সদস্যবর্গ, বিভিন্ন বিভাগের মুখ্যাধ্যাপক এবং ছাত্রপরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কর্মসচিবদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির পরিচয় করিয়ে দেন। বর্তমান কলেজের সঙ্গে পরিচয়ের পর অতীতের সমসাময়িকদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্ম রাষ্ট্রপতি আর্টস লাইব্রেরীর পাঠকক্ষে প্রবেশ করলেন। সেখানে তাঁর জন্ম অপেক্ষা করছিলেন 'প্রাক্তন'-সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, 'প্রাক্তন'র কয়েকজন সুপ্রাচীন সদস্য এবং তাঁর বয়েকজন সহপাঠী। অভ্যর্থনাদির পর তাঁরা সবাই একটি বড় টেবিলের চারপাশে রাষ্ট্রপতিকে ঘিরে বসলেন। গ্রন্থাগারের গভীর পরিবেশে স্নানমধ্য পরলোকগত অধ্যাপকদের চিত্রের সান্নিধ্যে রাষ্ট্রপতি সমসাময়িকদের সঙ্গে একত্রে কিছুক্ষণ অতীতস্মৃতিমহনের সুযোগ পেলেন। সেদিনের উৎসবের অগাছ অংশে ছিল অনুষ্ঠানের শাসন, কিন্তু লাইব্রেরিতে অন্তরঙ্গ পরিবেশে এই দুর্লভ মিলনমূহুর্ত অতীত স্মৃতির সহজ উচ্ছ্বাসে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল। সহপাঠীদের সঙ্গে আলাপের পর রাষ্ট্রপতি পরলোকগত H. M. Percival, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, মনোমোহন ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

১ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইডেন হিন্দু হস্টেলের সংযোগের স্মৃতিচিহ্নরূপে এই মর্মরফলক স্থাপন করেছেন প্রাক্তন আবাসিক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রাধাকুমল মুখোপাধ্যায়।

প্রভৃতি তাঁর পুরাতন অধ্যাপকদের লাইব্রেরিতে রক্ষিত চিত্রগুলি দেখেন। অধ্যাপক Percivalএর ছবিটি তিনি বিশেষভাবে কিছুক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করেন।

লাইব্রেরি থেকে রাষ্ট্রপতিকে এবার কলেজের মাঠে সুসজ্জিত বিরাট প্যাণ্ডলে নিয়ে যাওয়া হ়। প্রবেশকালে কলেজের ছাত্রীরা শঙ্খধ্বনি দ্বারা আবার তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এখানে বর্তমান এবং অতীতে সমবেত অভিযানের আয়োজন। কলেজের বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপকের বৃহৎ সমাবেশ উৎসবকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছিল। উপস্থিত স্বধীমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে স্নিত, বিনম্র অভিযাদনাতে রাষ্ট্রপতির আসন গ্রহণের পর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সমবেত বৈদিক স্তোত্রগানে। তারপর দুজন ছাত্রী তাঁকে মালাভূষিত করলেন। এইবার সম্ভাষণের সূচনা হল অধ্যক্ষের অভ্যর্থনাবাহী পাঠে। পাঠান্তে অধ্যক্ষ রাষ্ট্রপতির “প্রাক্তনী”র অত্যন্ত মজাদার সমস্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। পরবর্তী বক্তা শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ‘প্রাক্তনী’র সভাপতিরূপে রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানান। ছাত্রাবাসিকদের তরফে মানপত্র পাঠ করেন ছাত্রাবাস-সম্পাদক শ্রীমৃগালকান্তি মল্লিক। এই মানপত্র একটি বিশেষ আধারে উপহার দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতিকে। কলেজের ছাত্রগোষ্ঠীর পক্ষে অভ্যর্থনা জানান ছাত্রপরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রদীপ দাস। পাঠিত মানপত্রটি একটি মনোজ্ঞ আধারে স্থাপন করে রাষ্ট্রপতিকে উপহার দেওয়া হয়। তারপর অধ্যক্ষ উপহার দেন ছাত্রাবহার অধ্যাপক পার্শ্বভালের সঙ্গে একত্রে গৃহীত রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর কয়েকজন সহপাঠীর সমবেত আলোকচিত্রের একটি মূল্যবান অনুকৃতি’ এবং কলেজ রেজিস্ট্রারের একটি বিশেষভাবে বাঁধানো খণ্ড। বর্তমান কলেজের স্বর্ধর্না জ্ঞাপনের পর কলেজ জীবনে রাষ্ট্রপতির কয়েকজন বিশিষ্ট সমসাময়িক অভিভাষণ দেন। প্রথমে অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতির অত্যন্ত পুরাতন শিক্ষক, ইতিহাসের ভূতপূর্ব মুখ্যাধ্যাপক শ্রীবেদেন্দ্রনাথ সেন। তারপর বলেন রাষ্ট্রপতির দুজন সহপাঠী এবং সহ-আবাসিক শ্রীঅবিনাশ মজুমদার এবং শ্রীমায়াকর হালদার। তাঁদের অতীত স্মৃতির সরস বিবৃতি সভায় এক অন্তরঙ্গ পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে সভার শেষভাগে শ্রীমুক্ত মজুমদারের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—তিনি ছাত্র পরিষদের সাধারণসম্পাদককে জানান যে তাঁদের সময়ে ছাত্রপরিষদের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় এবং তাঁর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন আমাদের রাষ্ট্রপতি। জাতির নির্বাচন তাঁদের অতীতের অভিমত সমর্থন করেছে। এঁদের পরে বলেন রাষ্ট্রপতির সহপাঠী এবং University Law Collegeএ সহকর্মী শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর রাষ্ট্রপতি পরিকার, শুদ্ধ বাংলায় তাঁর নিজস্ব অভিভাষণ দেন।

বহুদিন পরে তাঁর কয়েকজন সতীর্থ এবং অন্ততঃপক্ষে একজন শিক্ষকের সঙ্গে মিলনে আনন্দ প্রকাশ করে তিনি এই কলেজ সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ এবং সক্রিয় স্মৃতির উল্লেখ করেন। এখানে সকলের কাছেই তিনি কিছু না কিছু পেয়েছেন এবং সেই বা পেয়েছেন তাই তাঁর জীবনের সম্বল—এই বিনীত স্বীকৃতির অকৃত্রিম আবেগ আমাদের মনকে গর্বে ও আনন্দে ভরিয়ে তোলে। তাঁর সহাধ্যায়ীরা সভাস্থ অভাগতবর্গের মনোরঞ্জন

১ এই আলোকচিত্রটির আর একটি অনুরূপ অনুকৃতি আর্টস্ লাইব্রেরির পাঠাগারে রক্ষিত হয়েছে। এই চিত্রে আছেন অধ্যাপক পার্শ্বভাল এবং ১৯০৬-৭ সালের ইতিহাস এবং ইংরাজী সাহিত্যের এম. এ ক্লাসের ছাত্রগণ।

মূল আলোকচিত্রটি ১৯৪৮ সালে কলেজপত্রিকায় প্রকাশের জন্ত রাষ্ট্রপতির সহপাঠী এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক পরলোকগত অধ্যক্ষ শ্রীবিনয়কুমার সেন প্রেরণ করেন। ১৯৪৯ সালে আলোকচিত্রটি কলেজপত্রিকায় পুনঃপ্রকাশিত হয়। আলোকচিত্রটির অনুকৃতিসহ একটি সংবর্ধনা-পুস্তিকা রাষ্ট্রপতির শুভাগমন উপলক্ষে মুদ্রিত ও বিতরিত হয়েছিল।

ক্রম্বে সব কাহিনী বিবৃত করেছিলেন তার উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি নিজে তাঁর কলেজজীবনের প্রথম দিনের একটি কৌতুকপূর্ণ অধ্যায় বর্ণনা করেন। জীবদ্দশাতেই ঘোবনের স্বাধীনতা স্বপ্নের সার্থক উপলব্ধির কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যচিত্রের সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, যে প্রেম এবং উৎসাহ বর্তমান ছাত্রসমাজ প্রদর্শন করেছেন সে মনে রাখবার কথা, বলবার নয়।...ছাত্রপরিষদের সাধারণ সম্পাদকের ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে 'জনগণমন' গানে এই দিনের স্মরণীয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল।

নিম্নে ইন্ডেন হিন্দু হস্টেলের আবাসিকদের এবং কলেজের ছাত্রদের পক্ষে প্রদত্ত মানপত্র দুটি মুদ্রিত হল। অধ্যক্ষের সধ্বর্না-বাণী ইংরাজী অংশে সন্নিবেশিত হল। এই সংখ্যার পুরোভাগে রাষ্ট্রপতির আগমন-সম্পর্কিত কতকগুলি ছবি প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রাবাসে গৃহীত আলোকচিত্রটি “আমাদের কথা”র পুরোভাগে প্রকাশিত হল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কলেজের কয়েকজন ছাত্র কতৃক গৃহীত রাষ্ট্রপতির শুভাগমনের চলচিত্র গত জানুয়ারী মাসে Physics theatre-এ প্রদর্শিত হয়।

ভারতের রাষ্ট্রপতি

ইন্ডেন হিন্দু হস্টেলের প্রাক্তন আবাসিক

ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের

পুরাতন আবাসে শুভাগমন উপলক্ষে

—বিজয়শ্রী-সংবর্ধনা—

হে সত্যসন্ধ,

শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাচ্য ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্বোত্তম স্নাতকরূপে বঙ্গ-বিহার উৎকল-আসামের বিদ্যার্থী-স্বন্দর অভিনন্দন লাভ করিয়া যেদিন তুমি বাংলার নবীন বিদ্যাসাধনার আদিপীঠে উপনীত হইয়াছিলে আমাদের এই ছাত্রাবাস সেদিন তোমাকে একান্ত আপনায় জন বলিয়া বরণ করিয়া গ্ৰাণা অতুল্য করিয়াছিল। সেদিনকার সেই প্রতিভাদীপ্ত কিশোরকে অধর্শতাব্দীর ব্যবস্থানে আজ স্নিগ্ধ-জনানুকূল অরতভাগ্যবিধাতা রূপে লাভ করিয়া স্বাগত জানাইব আমরা কোন্ ভাষায়? মৈথিল কবির অনুকরণ করিয়া আমরা বলিব, “আজু মবু গেহ গেহ করি মানলু”।

আমরা মানস প্রত্যক্ষ করিতেছি একটি দিন যেই শুভদিনে তোমাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আমাদের শ্রামলা স্মৃতি জন্মীর মুখখানি প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। আর একটি দিন মনে পড়ে যেদিন বাংলার কথাশিল্পীর হৃদি-মর্ষ-বিহারিণী জন্মনী সন্তানকণ্ঠে তাঁহার প্রথম বন্দনা শ্রবণ করিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিদ্যার্থীবশে তোমার আগমনের অত্যল্প কাল মধ্যে বাংলার বিধা-বিদীর্ণ হৃদয়কন্দর হইতে সমুখিত জাগরীগাথা ত্রিংশ-কোটি-কণ্ঠ-কলকল-নির্দার-করালে উদগীত হইয়া আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের স্তুতিভঙ্গ করিয়াছিল। সারস্বত-সাধনায় মগ্ন কিশোর তুমি বারংবার উৎকর্ণ হইয়া সেই মর্মবিদারী রব শ্রবণ করিয়াছিলে। বাণী বিদ্যাদায়িনীর সাধনায় অনুগম সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্যবহারাজীব-অধ্যাপকরূপে তোমার কর্মজীবনের শুভসূচনা করিয়াছিলে বঙ্গদেশে। অমলা অতুল্য বঙ্গবাণীর স্বরপুত্র জন-গণ-মন-অধিনায়ক ভারত-ভাগ্যবিধাতার জয়গান করিয়া ধরণীকে ভরিয়া তুলিলেন। ক্রান্তদর্শী কবির মন্ত্র আজ সজীব হইয়া উঠিয়াছে তোমার প্রতিভা-ভাষার সাধন-সমুদ্র জীবনকে আশ্রয় করিয়া।

বাংলার এক জীবমুক্ত সন্ন্যাসীর আনন্দ-বিবেক একদিন দেশপ্রেমে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। নিখিলভারতে

একটি বিরাট হিয়া জাগাইয়া তিনি ভারতবাসীকে কটমাত্রবস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে বলিতে আবাহন করিয়াছিলেন, মূৰ্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবর্ষের অঞ্জ মুচিমেথর আমার ভাই, আমার রক্ত। সন্ন্যাসীর দিব্য দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিয়াছিল ভাবী কালের একটি মানুষের মূর্তি, সর্বাঙ্গে যাঁহার অন্নহীন বগ্নহীন ভারতবাসীর দারিদ্র্যের স্বীকৃতি। ভাবিতে স্নোমাঞ্চ হয়, অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে ভারতবর্ষ সত্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল মানবতার কটমাত্র-বস্ত্রাবৃত একটি সজীব বিগ্রহ। আমরা বহুপূর্বে একবার শুনিয়াছিলাম,—

ত্মিমির দিগ্‌ভরি যোর যামিনী অখির বিজুরি পাঁতিয়া।

বিদ্যাপতি কহে কৈসে গমায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।

নিখিল-ভারতীয় রাষ্ট্রচেতনার অগ্রদূত নবজাগরিত ভারতের আর্তি কণ্ঠে ধরিয়া নূতন করিয়া যেন গাহিয়া উঠিলেন, “‘হরিজন’ বিনে কৈসে গমায়বি দিন রাতিয়া”। সেদিন তাঁহার পার্শ্বে যে সর্বভাগী সত্যাগ্রহীর দ্বিতীয় মূর্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেটি তোমারই বিশ্ববন্দিত কুলিশকণ্ঠের কুহুমহুকোমল মনুগুমূর্তি।

তোমার নামের সঙ্গে আমাদের স্মরণ ও মননপথে উদ্ভিত হয় একটি চিরশ্রুত নাম, “রাজেন্দ্র সত্যসঙ্ঘ দশরথতনয়...বন্দে লোকাভিরামং,” যাহার তাৎপর্য-সংকেত করিতে গিয়া বিশ্বকবি তাঁহার অনুপম ভঙ্গীতে মনুগুমহিমার প্রকটন করিয়া বলিয়াছেন,—

কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করেনি অতিক্রম,

কাহার চরিত্র ঘেরি’ সুকঠিন ধর্মের নিয়ম

ধরেছে হৃন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মত,

মহৈশ্বর্যে আছে নয় মহাদৈত্বে কে হয়নি নত।

সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,

কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,

কে লয়েছে নিজ শিরে, রাজভালে মুকুটের সম,

সবিনয়ে সর্গোরবে ধরামারে ছুঃখ মহত্তম।

স্বাধীন ভারতের হে প্রথম রাষ্ট্রপতি, ভারতীয় মনুগুম্ব-সাধনার এই ধারা তোমাতে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। তোমার সারস্বত সাধনার পরিত্যক্ত পীঠের উত্তরাধিকার আমাদের উপর বর্তিয়াছে। কিন্তু আমাদের তপশ্চা আজ বহু-বিস্ত্রিত। যে বাংলাকে একদিন তুমি সাধন-পীঠ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলে সেই বাংলাকে ভালবাসিয়া হৃদয়ে আবার তুমি আসিয়াছ। আমাদেরই ঘরের মানুষ আমাদেরই স্বজন বান্ধব, অগণিত নরনারী ভূগের মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সেহে মনে আঙ্গিকভাবে বাঁচিবার এবং বাড়িবার অধিকার তাহাদের জন্ত আমরা চাহিতেছি। মানুষকে এই অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত তোমাদেরই প্রবর্তিত দুঃখের তপশ্চা যেন আমরা হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে পারি, তোমার মনুগুম্ব-সাধনার আদিপীঠে বসিয়া আজ তুমি আমাদের সেই আশীর্বাদ করিয়া যাও।

বন্দে মাতরম্।

ইডেন হিন্দু হস্টেল,

৩, প্যারীচরণ সরকার স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

চক্রিশে ডিসেম্বর, ১৯৫২।

শ্রদ্ধা-সমত

ইডেন হিন্দু হস্টেলের আবাসিকবন্দ

ডক্টর রাজেশ্বর প্রসাদ এম এ., ডি. এল.,
মাননীয়েষু।

হে বরণ্য অতিথি,

তুমি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাণ গ্রহণ কর।

এই বিদ্যালয়তে যে সকল কৃতী ছাত্র ভারতীয় আশীর্মালা লাভ করেছেন তুমি তাঁদের অগ্রণী। আজ তোমার শীর্ষ গৌরবে উজ্জ্বল, জনগণের অর্হণীয় তোমার পাদপীঠ ভাষাজ্ঞান। এই মাতৃসমা বিদ্যালয় তোমার গৌরবের অংশভাগিনী। হে মহাভাগ, তোমাকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

তুমি যে শুধু মেধাবী ছাত্র হিসাবেই যশোলাভ করেছিলে তাই নয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে যদেগী আন্দোলনে বঙ্গভূমি অনুরণিত হয়েছিল তুমি ছাত্রাবস্থায় তাতে যোগদান করেছিলে। সেদিন যে স্বদেশীর মস্তে তুমি দীক্ষা লাভ করেছিলে, তা আজীবন তোমাকে উদ্বোধিত করেছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে ভারতবাসী স্বাধীনতা অভিযান আরম্ভ হয় তুমি সর্বথ ত্যাগ করে সেই মহাসংগ্রামের ব্রত গ্রহণ করেছিলে; হে স্বাধীনতার ঋদ্ধিক, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

আজ সেই মহাব্রত উদ্বাপিত হয়েছে; ভারতভূমি আজ শৃঙ্খলমুক্ত। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা শতাধিক বর্ষ ধরে এই বিদ্যায়তনে প্রবাহিত হয়েছে। যুগমানব রামমোহন এর প্রতিষ্ঠাতা; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র এখানে শিক্ষালাভ করেছেন। আজ তাঁদের সবাঙ্কার সাধনার পরিসমাপ্তি হয়েছে; এই বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ভারতের একছত্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তোমার মধ্যে সেইসব পূর্বগামী মহাপুরুষদের সাধনার সফলতা মূর্তি পেয়েছে; হে স্বাধীনতার পুরোহিত, তুমি তাদের হয়েও আমাদের প্রদ্বার অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

আমরা ছাত্র ভবিষ্যতের নাগরিক। তোমার নেতৃত্বে আমাদের জীবনযাত্রা সুখসম্পদে উজ্জ্বল হবে আমরা এই আশা পোষণ করি। সর্বোপরি আমরা এই কথা স্মরণ করে আনন্দ ও গর্ব অনুভব করি যে তুমি আমাদেরই একজন; তোমার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শুধু ভারতবাসী হিসাবে নয়, এই পুণ্য বিদ্যায়তনের সর্গীর্ষ হিসাবে। হে মহাদ, তুমি আমাদের খ্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ কর।

প্রেসিডেন্সী কলেজ

কলিকাতা, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫২।

ইতি—

প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবস :

প্রতি বৎসরের মত এবারও ২০শে জানুয়ারী কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবস উদ্বাপিত হয়। এই বৎসর ঐ দিনেই সর্বস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হওয়াতে আশঙ্কা হয়েছিল এবার সভায় জনসমাগম কিছু বিরল হবে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরেই Physics Theatre প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীর সমাবেশে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল—এমন কি সভার মধ্যেই কয়েকজন স্থানাভাব দেখে অভিযোগের হুরে মন্তব্য করেন—‘কলেজের নূতন সভাগৃহ প্রয়োজন।’

এই দিনে সভাপতি ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে আমাদের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন তাঁরই সমসাময়িক শ্রীনরেন্দ্রকুমার বহু। অষ্টাশ্ব বিশিষ্ট অভ্যাগতের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বহু, রাজ্যপালের সহপাঠী শ্রীসতীনাথ রায়, কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীভূপতিমোহন সেন, শ্রীঅপূর্বকুমারচন্দ্র এবং শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। সভা আরম্ভ হয় অধ্যক্ষের ভাষণে। তিনি সে দিনের বিশিষ্ট অতিথি ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপান্নালাল বহু এবং শ্রীনরেন্দ্রকুমার বহুকে কলেজের এই মহৎ

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানান। হিন্দুকলেজের ১৩৬তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের এই পূণ্য স্মৃতিদিবসে কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করে তিনি অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদারকে কলেজ প্রাসঙ্গিকী পাঠ করতে অনুরোধ করেন। প্রাসঙ্গিকীটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকী পাঠের পর বিগত বৎসরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার এবং পদক বিতরণ করা হয়। 'প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবস' সভায় পুরস্কারবিতরণের প্রথা আয়-ব্যয় প্রভৃতির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের উদ্বোধনে এই প্রথম প্রবর্তিত হল।

এর পর শ্রীনরেন্দ্রকুমার বহু মহাশয়ের অভিজ্ঞাষণ বিশেষ উপভোগ্য হয়। পরবর্তী বক্তা শ্রীপান্নালাল বহু মহাশয়ের ছাত্রজীবনের স্মৃতি-সমৃদ্ধ আলোচনায় আমরা অধ্যাপক পার্দিভালের সন্মুখে কয়েকটি মনোজ্ঞ কাহিনী শোনবার সুযোগ পাই। সর্বশেষে রাজ্যপালের ভাষণে সভার অন্তরঙ্গ ভাবটি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর বক্তৃত্যর শেষভাগ পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক ছর্দশার রিত স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এই কলেজই একদিন দেশবহু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বহুর মত জননায়ককে জাতীয় সংগ্রামে দান করে—একথা স্মরণ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন আজ পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বের অভাব এই কলেজের ছাত্রগণ পূর্ণ করবেন।

সভার শেষে ছাত্রপরিষদের সাধারণসম্পাদক রাজ্যপাল, অস্থায়ী বিশিষ্ট অতিথি এবং সমাগত প্রাক্তন ছাত্রদের ধন্যবাদ জানান।

প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহে অস্থায়ী বৎসরের মত এবারেও বার্ষিক খেলাধুলার প্রতিযোগিতা, বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মিলিত বিতর্কসভা, বর্তমান ছাত্রদের বিরুদ্ধে প্রাক্তন ছাত্রদের ক্রিকেটখেলা, ছাত্রপরিষদের উদ্বোধনে বিচিত্রানুষ্ঠান, 'প্রাক্তনীর' বার্ষিক মিলনোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাক্তনছাত্রসমিতির সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী :

১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে আরম্ভ 'প্রাক্তনী' তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। বর্তমান সদস্যসংখ্যা প্রায় সাতশত। বহু বৎসর পরে গত বৎসর প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবসে 'প্রাক্তনী'র সদস্যদের একটি মিলনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আসরে বর্তমান ছাত্রদের কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতিনিধিও নিমন্ত্রিত হন। তারপর গত ৭ই সেপ্টেম্বর একটি সাক্ষাৎসঙ্গীতজলসার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেষণ করেন 'শিল্পীচক্র', উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীকানন এবং শ্রীজ্ঞানপ্রসাদ ঘোষ এবং বঙ্গসঙ্গীত পরিবেষণ করেন শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র। ১৭ই সেপ্টেম্বর University Instituteএ নাট্যানুষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্রেরা 'কমলাকান্তের জীবনবন্দী' এবং ৩০কুমার রায় রচিত 'চলচিত্তচঞ্চরী' অভিনয় করেন। সেপ্টেম্বর মাসের এই দুটি অনুষ্ঠানেই বহু প্রাক্তন ছাত্র উপস্থিত থাকেন।

এই বৎসর ২৩শে জানুয়ারী প্রাক্তন ছাত্রসমিতি আবার একটি বার্ষিক মিলনানুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

প্রাক্তন ছাত্রসংবাদ :

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক উল্টের অরবিন্দ বহু Durham বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের Visiting Professor নিযুক্ত হয়েছেন। ১৯৩৪-৪০ সালে তিনি এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

শ্রীপ্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের Final Attorneyship পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করে Belchamber পদকপ্রাপ্ত হয়েছেন। ১৯৪৩-৪৭ সালে তিনি এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

এবার লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত Indian Science Congress এবং গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত Indian History

Congress-এ সভাপতিত্ব করেন বথাক্রমে Bose Research Institute-এর পরিচালক বংশী বৈজ্ঞানিক ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বহু এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তাঁরা দুজনেই আমাদের কলেজের বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্র—(১৯০৩-৬) ও (১৮৯৭-১৯০৩)।

সপ্রতি আমাদের কলেজের শারীরবৃত্তবিভাগের গবেষক ছাত্র শ্রীচণ্ডীচরণ দেব ডি, ফিল্ উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর thesis ছিল : Vitamin C in Carbohydrate metabolism। ১৯৪৮ সালে তিনি এই কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীর এম্, এস্, সি উপাধি লাভ করে সরকারের একটি গবেষণা বৃত্তি অর্জন করে শারীরবৃত্ত বিভাগে গবেষণা কার্যে নিযুক্ত হন।

পরীক্ষার ফলাফল :

১৯৫২ সালের বি. এ ও বি, এন্স সি পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের কলেজ থেকে যাঁরা প্রথমশ্রেণীর অনাস পেয়েছেন নিম্নে তাঁদের নাম প্রকাশিত হল। এঁদের স্থানানুক্রমের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া সম্ভব হয় নি, তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থাননির্দেশের চেষ্টা করা হয়েছে।

বি, এ—ইতিহাস : অশিনরঞ্জন দাশগুপ্ত (১ম) ; হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (২য়) ; দীপেন্দ্রমোহন বন্দ্যোঃ (৩য়)।

অর্থনীতি : তরুণচন্দ্র দত্ত (১ম) ; কাননকুমার মজুমদার (২য়) ; নবেন্দু সেন (৩য়)।

দর্শন : প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত (১ম) ; কমলা বহু (২য়)।

গণিত : অমিতাভ গুপ্ত।

বি, এন্স সি—গণিত : সুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় (১ম) ; অমিতাভ গুপ্ত (২য়) ; অনাদিশঙ্কর গুপ্ত, আশিসকুমার মজুমদার, লক্ষ্মীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র প্রসাদ।

ভূতত্ত্ব : শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী (১ম) ; দীপক রায় এবং নিরঞ্জনদেব চট্টোপাধ্যায় (২য়) ; প্রণব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৩য়) ; অশোককুমার মুখোপাধ্যায় (৪র্থ) ; সুপ্রিয়মোহন সেনগুপ্ত (৫ম) ; প্রমেনজিৎ সাহা (৬ষ্ঠ)।

শারীরবৃত্ত : দেবজ্যোতি দাস (১ম) ; অসীমকুমার সরকার (২য়) ; হেলেন রায় (৩য়)।

সংখ্যাবিজ্ঞান : নিখিলেশ ভট্টাচার্য (১ম)।

পদার্থ বিজ্ঞান : পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় (৩য়)।

১৯৫২ সালের বি, এ এবং বি, এন্স সি পরীক্ষার ফলাফলের উপর আমাদের কলেজের নিম্নলিখিত ছাত্রছাত্রীগণ সরকারী বৃত্তি লাভ করেছেন :

আর্টস্ : কাননকুমার মজুমদার, দীপেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ গুপ্ত, কমলা বহু, শান্তা দাস।

বিজ্ঞান : দীপককুমার রায়, অসীমকুমার সরকার, নিরঞ্জনদেব চট্টোপাধ্যায়, ভাগবত দাশগুপ্ত, দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, সাধনজ্যোতিঃ বর্মণ, সূসীমমুকুল দত্ত।

অছাত্র বৃত্তিলাভের বিষয় আমরা এখনও অবগত নই।

১৯৫২ সালের এম্ এ এবং এম্, এন্স সি পরীক্ষায় আমাদের কলেজ থেকে যাঁরা প্রথমশ্রেণীতে স্থান পেয়েছেন নিম্নে তাঁদের নাম প্রকাশিত হল। অবশ্যই এই বিবরণ অসম্পূর্ণ। স্থাননির্দেশেও ভ্রম থাকার সম্ভাব্য।

এম্ এ—ইতিহাস : শিপ্রা সরকার (১ম) ; অমিতাভ মুখোপাধ্যায় (২য়)।

অর্থনীতি : শিপ্রা সেন (১ম) ; গৌরী সেনগুপ্ত (২য়)।

- দর্শন : অপালা মুখোপাধ্যায় (৫ম) ।
 জ্ঞান : সত্যেশ চক্রবর্তী (১ম) ; বিমলেন্দু ভট্টাচার্য (২য়) ।
 এম্, এন্, সি— ভূতত্ত্ব : প্রতীপকুমার মুখোপাধ্যায় (১ম) ; রবীন্দ্রনাথ বহু (২য়) ।
 উদ্ভিদবিদ্যা : স্মিত্রা তালুকদার (১ম) ।
 সংখ্যাবিজ্ঞান : সমরেন্দ্রনাথ মিত্র (১ম) ।
 শারীর যুত : ধুর্জিৎপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (২য়) ।
 পদার্থবিদ্যা : রেখা চলিহা (৫ম) ।

গত ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমাদের কলেজের যে সব ছাত্রছাত্রী ১৯৫১ মালের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফলের উপর বিভিন্ন পদকপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের নাম এবং প্রাপ্ত পদকের তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হল :—

- এম্, এ— অর্থনীতি : অলক ঘোষ (বঙ্কুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্ণপদক) ।
 উদ্ভিদবিদ্যা : চিত্রা ঘোষ (বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক, কমলরাণী স্বর্ণপদক এবং অজিতকুমার মিত্র স্বর্ণনেমি রৌপ্যপদক) ।
- এম্, এন্, সি—রসায়ন : অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (মতিলাল মল্লিক স্বর্ণনেমি রৌপ্যপদক) ।
 ভূতত্ত্ব : বিমলেন্দু রায়চৌধুরী (বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক) ।
 সংখ্যাবিজ্ঞান : রাধাগোবিন্দ লাহা (বিশ্ববিদ্যালয় রৌপ্যপদক) ।
 সৃজিতকুমার মিত্র (বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক) ।
- বি, এ— দর্শন : শ্রীলা মহলানবিশ (কেশবচন্দ্র সেন স্বর্ণপদক, হেমন্তকুমার সেন স্বর্ণপদক, গঙ্গামণি দেবী স্বর্ণপদক, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বর্ণনেমি রৌপ্যপদক) ।
 ইতিহাস : শঙ্করকুমার দত্ত (ঠাকুরদাস কর স্বর্ণপদক) ।
 অর্থনীতি : প্রহ্লাদকুমার বহু (এন্, এন্, ঘোষ স্বর্ণনেমি রৌপ্যপদক) ।
 দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (Quinlan রৌপ্য স্মৃতিপদক) ।
 সংখ্যাবিজ্ঞান : অতীন্দ্রমোহন গুণ (শুভেন্দুশেখর বহু স্বর্ণপদক) ।
 সংস্কৃত : সন্ধ্যারাণী দে (বিদ্যাসাগর স্বর্ণনেমি রৌপ্যপদক) ।
 ইংরাজী : অরুণকুমার দাশগুপ্ত (মানাকজী রোসুমজী স্বর্ণপদক, প্রিয়নাথ ঘোষ এবং গগনতারা দাসী রৌপ্যপদক, অবিলাশচন্দ্র রৌপ্যপদক) ।
- বি, এন্-সি— ভূতত্ত্ব : ক্ষিতীন্দ্রমোহন নাহা (হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত রৌপ্য পদক) ।
 পদার্থবিদ্যা : বিশ্বরঞ্জন নাগ (মোহিনীমোহন রায় রৌপ্য স্মৃতিপদক) ।
 গণিত : অম্বরীষ ঘোষ (মনুখনাথ ভট্টাচার্য স্বর্ণনেমি রৌপ্যপদক, Herschel স্বর্ণপদক, দেবেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় রৌপ্যপদক, সরোজ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণ স্মৃতিপদক) ।
 কমলেন্দু দাস (McCann রৌপ্যপদক) ।
 রসায়ন : সমীর সরকার (রমণীমোহন মজুমদার স্বর্ণনেমি রৌপ্যপদক) ।
 পদার্থবিদ্যা : জুহিনা ঘোষ (বাসন্তী দাস রৌপ্যপদক) ।

১৯৫২ সালের আই, এন্-সি পরীক্ষার ফলাফলের উপর আমাদের কলেজের ছাত্রদের পদক, প্রাইজ প্রভৃতি প্রাপ্তির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল :—

দেবীচরণ খাঁ—Stephen Finney রৌপ্য পদক, কে, বি, দাশগুপ্ত স্বর্ণপদক, সারদা প্রসাদ প্রাইজ,
ডাক্তারি (পদার্থবিজ্ঞায় কৃতিত্বের জন্ত) ।
মহম্মদ আসগর আলি—সারদা প্রসাদ প্রাইজ ।
অনিলকুমার ঘোষ—রায়বাহাদুর রথিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রাইজ ।

এই বৎসর গত ২০শে জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত 'প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবস' সভায় ১৯৫২ সালের এক (আংশিকভাবে)
১৯৫১ সালের বিদ্যবিজ্ঞান এবং কলেজের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলের উপর কলেজ থেকে যেসব পদক এবং প্রাইজ
বিতরণ করা হয় তার বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হল :—

আই, এ এবং আই, এন্-সি :

সিঙ্ক্রিয়া স্বর্ণপদক এবং গোল্ডমিডেল প্রাইজ (সামগ্রিক কৃতিত্বের জন্ত)

বিজ্ঞান : দেবীচরণ খাঁ (১৯৫২)

আর্টস : প্রদীপকুমার দাস (১৯৫২) ।

চারুচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি প্রাইজ (ইংরাজী অনার্স তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীভুক্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট
পরীক্ষায় ইংরাজীতে সর্বাধিক কৃতিত্ব-প্রদর্শনকারীর প্রাপ্য)—গীতা গুহরায় (১৯৫১) ।

বিখনাথ ভট্টাচার্য (১৯৫২) ।

অরণ সরকার স্মৃতি পদক (বাংলায় কৃতিত্বের জন্ত)—শঙ্কর সেন, মুগেন্দ্রনাথ পোদ্দার (১৯৫২)

হরিশচন্দ্র কবিরত্ন প্রাইজ (সংস্কৃতে কৃতিত্বের জন্ত)—বতিকুমার সেনগুপ্ত (১৯৫১) ।

অরুণকুমার ভাদুড়ী (১৯৫২) ।

কলেজ প্রাইজ (ভূজ্ঞানে কৃতিত্বের জন্ত)—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৯৫২) ।

চন্দ্রনাথ নৈত্র পদক (ভূতত্ত্বে কৃতিত্বের জন্ত)—তারাপদ ভট্টাচার্য (১৯৫০) ।

সোহনলাল আগরওয়াল (১৯৫২) ।

বি, এ এবং বি, এন্-সি :

Cunningham স্মৃতি প্রাইজ (রসায়ন অনার্সে কৃতিত্বের জন্ত)—সুসীমমুকুল দত্ত (১৯৫২)

কলেজ প্রাইজ (পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণীভুক্ত ছাত্রদের মধ্যে অনার্সে রসায়নে কৃতিত্বের জন্ত)—সচ্চিদানন্দ
দত্ত (১৯৫২) ।

যোগেশচন্দ্র নাগ স্মৃতি পদক (উদ্ভিদবিজ্ঞায় কৃতিত্বের জন্ত)—অশোককুমার সিংহ (১৯৫১) ।

দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী (১৯৫২) ।

এম্ এ এবং এম্ এন্-সি :

চন্দ্রনারায়ণ স্বর্ণপদক (ইতিহাসে কৃতিত্বের জন্ত)—কমলকুমার ঘটক (১৯৫১)

Cunningham স্মৃতি প্রাইজ (রসায়নে কৃতিত্বের জন্ত)—অমরেরথর চট্টোপাধ্যায় (১৯৫১) ।

অরুণকুমার বড়ুয়া (১৯৫০) ।

কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা (১৯৫২ এবং ১৯৫১) :

আন্তত্যাগ মুখোপাধ্যায় প্রাইজ (আই, এন্-সি ক্লাসে সামগ্রিক কৃতিত্বের জন্ত)—সুনীলকৃষ্ণ পাল ।

আন্তত্যাগ চৌধুরী প্রাইজ (আই, এ ক্লাসে সামগ্রিক কৃতিত্বের জন্ত)—শ্রীমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ।

কৃষ্ণবিহারী বসাক পদক (তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে রসায়ন প্র্যাকটিক্যাল কৃতিত্বের জন্ম)—তৃপ্তি দাসগুপ্ত (১৯৫১-৫২) ; হেলেন রায় (১৯৫০-৫১) ।

নিস্তারিণী দাসী প্রাইজ (আই, এন্স সি ক্লাসে পদার্থবিজ্ঞান প্র্যাকটিক্যাল কৃতিত্বের জন্ম)—অনিতা গুপ্ত (১৯৫১-৫৩) ; অসীমরঞ্জন সেন (১৯৫০-৫২) ।

ছাত্রপরিষদ :

কাজ করার অফুরন্ত উৎসাহ আর উদ্দীপনার মাখে একদিন আমরা পেয়েছিলাম পরিষদের কার্যভার। সংগঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে কলেজের ছাত্রপরিষদের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়রচনার স্বপ্ন ছিল তখন আমাদের চোখে—যেমন থাকে প্রতিবছরের নবনির্বাচিতদের কল্পনায়। কিন্তু আজ দীর্ঘ একবছরের পর পরিষদের সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনরচনায় বসে ছুগথের সঙ্গে মনে হচ্ছে—কল্পনার সামগ্রিক বাস্তব রূপায়ণ তো সম্ভব হন না! সেদিনের সম্ভাব্য-ভবিষ্যতের অনেক স্বপ্ন আজ পেছনে ফেলে-আসা বছরের পটভূমিকায় ব্যর্থতার রূপ ধরে ফুটে উঠেছে। আমাদের ব্যক্তিগত অক্ষমতা এর জন্মে আংশিক ভাবে দায়ী হলেও আরও অনেক কারণ আছে এর পেছনে।

বড়রকম নতুন কিছু করার আশা সার্থক না হলেও পরিষদের ধরা-বাঁধা জীবন-নাট্যের কোন জংশই আমরা অবহেলা করি নি; বরং কয়েক বিষয়ে আমরা নতুনত্ব ও সৃষ্টিতার দাবী করতে পারি। প্রতিবারের মতো প্রতিষ্ঠা-সপ্তাহের মধ্যে দিয়ে এবারও আরম্ভ হয় পরিষদের জীবন। কলেজ-পত্রিকার গত সংখ্যাতে এই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ একবার বেরিয়ে যাওয়ায় এবার আর তা নিয়ে আলোচনা করলাম না।

নতুন জিনিষের মধ্যে আমাদের শান্তি-সপ্তাহ-উৎসব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রথমবার বলে আমরা এই অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গ-স্বন্দর করে তুলতে পারি নি। গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে আরও একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

‘দেয়ালী’ : কলেজ-দেয়ালীর পূর্বতন সম্পাদকর পরত্যাগ করায় পরিষদ পার্থসারথি গুপ্ত এবং ভুবানকান্তি ঘোষকে দেয়ালী পরিচালনার ভার দেয় এবং বলাবাহুল্য এঁদের দুজনের পরিচালনাগুণে সমস্ত কলেজের ছাত্রছাত্রীর প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রথমবর্ষের ছাত্রদের আত্মহাতিশয্যে পরিষদ থেকে প্রথমবর্ষের জন্মে বিশেষ একটি দেয়ালী করে দেওয়া হয়—এর নাম হল ‘প্রথমা’। এছাড়া ‘স্ফুজিং’ নামে আরও একটি ‘দেয়ালী’র আবির্ভাব হয় এবছর।

সমাজসেবা বিভাগের পূর্ব-নির্বাচিত সম্পাদক আমাদের কলেজ ছেড়ে চলে যাওয়ায় তাঁর স্থানে সখিৎ চ্যাটার্জি নির্বাচিত হন। দরিদ্র ছাত্রদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা ছাড়া অনেক ছুঃস্থ ভঙ্গসন্তানের চিকিৎসার জন্ম দুর্মূল্য ঔষধপত্রাদির ব্যবস্থাও করা হয় এই বিভাগের নেতৃত্বে।

বিতর্ক-বিত্তাগ : বরুণ দে’র পরিচালনায় বেশ ভালই কাজ করে এবার। বাংলা-বিতর্কের একটি ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতা হয় কলেজের ছাত্রদের মধ্যে।

রবীন্দ্র-পরিষদ : শেষদিকে বেশ তাড়াতাড়ি কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।—তার মধ্যে ‘নিউএম্পায়ারে’ যে অনুষ্ঠানটি হয় তার জন্মে পরিষদ-সম্পাদক অরুণ রায় কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

নাট্য : সম্পাদক অনিবার্য কারণ-বশতঃ কলেজ থেকে অকস্মাৎ বিদায় নেওয়ার এবারের নাট্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি হয়। অবশু ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব সখিৎ চ্যাটার্জি, সূধীর চক্রবর্তীর সহযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন। নিউএম্পায়ারে আমাদের নাট্যানুষ্ঠান উপস্থিত সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে এবং এই অনুষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর নিজের সৃষ্টিতার সঙ্গে

পরিচালনা করে অধ্যাপকদের প্রশংসাজ্ঞান হয়। এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই সেলিমা প্রধানকে ; তিনি একাধিক ছবি একে দিয়ে আমাদের সাফল্যের পথে সাহায্য করেছেন।

ছাত্র পরিষদের সক্রিয় সাহায্যে এবার দ্বিতীয়বর্ষ ও তৃতীয়বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা একটি করে আলাদা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। কলেজের ছাত্র-পরিষদের ইতিহাসে এধরণের অনুষ্ঠান বোধহয় এই প্রথম।

নতুন পরিষদ নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর একটি নতুন পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের সম্পাদকবৃন্দ নবনির্বাচিত সম্পাদকদের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মিলিত হয়। সেখানে আমরা আমাদের একবছরের সমস্ত অভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত উপদেশ ও নানাবিধ কার্যপরিচালনা দান করি নতুন সম্পাদকদের এবং তাঁরা এতে যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করেন। পরিষদের সহসম্পাদক রঞ্জিত চ্যাটার্জি সমস্ত ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। মাননীয় অধ্যক্ষ যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় সর্বকার্যে আমাদের উৎসাহ দান করেছিলেন। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

সবশেষে আমি ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যের জন্তে ধন্যবাদ জানাই আর পরিষদের সমস্ত ক্রেটি-বিচ্যুতির জন্তে তাঁদের ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সুনীতিকুমার বসু—সাধারণ সম্পাদক

প্রকাশনা বিভাগ :

দায় এবং দায়িত্ব, তাড়া এবং তাড়নার ছন্দ-দীর্ঘ ফলশ্রুতি রূপে অবশেষে কলেজ পত্রিকা সত্যি প্রকাশিত হলো, যদিও নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় তিনমাস পরে। তবে এই অহেতুক বিলম্বের জন্তে মূলতঃ কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই দায়ী কারণ তাঁদের রচনা এবং সেমিনার-রিপোর্ট প্রভৃতি যথাসময়ে এসে পৌঁছায় নি। তাঁদের কাছে আমাদের আরেকটা অনুরোধ যে বছর বলা সত্ত্বেও তাঁরা সময়মত পত্রিকা গ্রহণ করেন না। তাই পুনর্বীর অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁরা সময়মত পত্রিকা গ্রহণ করে কর্মসচিবকে যেন ভারমুক্ত করেন।

পত্রিকা প্রকাশ ছাড়া “দেয়ালী”র ভারও আমাদের ওপর চ্যুত হয়েছে। পূর্বতন সম্পাদকদ্বয় শ্রীধীর রায়চৌধুরী ও শ্রীগগন দত্ত বিশেষ কারণবশতঃ “দেয়ালী”র সম্পাদনার ভার পুনর্বীর গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হওয়ায় অস্থায়ী মুখসম্পাদক শ্রীপার্থসারথি গুপ্ত ও শ্রীতুষারকান্তি বোষ কলেজের ছাত্রপরিষদ কর্তৃক স্থায়ী মুখসম্পাদকরূপে নির্বাচিত হন। আশা করি তাঁরা তাঁদের সম্পাদন-দক্ষতা এবং লেখনী-বৈদগ্ধ্য প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের তথাকথিত সাহিত্য-মনন রসতৃপ্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের কর্মকুশলতার জন্তে ধন্যবাদ!

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাঃ শ্রীভবতোষ দত্ত এবং শ্রীধীর রায়চৌধুরী, শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরথীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছাত্রবৃন্দের বিভাগীয় কাজে সহযোগিতা করার জন্তে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যদিও তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে লৈখিক ধন্যবাদের বহু উর্ধ্বে।

সর্বশেষে, কলেজপত্রিকার ঐতিহ্য-প্রদীপ্ত স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্তে আমার আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা রইল।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত—সম্পাদক

বিতর্ক-পরিষদ :

এ বছরের প্রথমাধে আমাদের কলেজে তিনটি বিতর্ক-সভা অনুষ্ঠিত হয় ও আমরা একটি প্রতিযোগিতামূলক বিতর্কে যোগদান করি। কলেজ পত্রিকার গত সংখ্যায় বিতর্ক-পরিষদের যে কার্য-বিবরণী দিয়েছিলাম, তাতে জুলাই মাস থেকে পাক্ষিক বিতর্ক-সভা আয়োজন করার আশা প্রকাশ করি। এই প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ করার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে গ্রীষ্মাবকাশের পর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতর্ক-সভাগুলিতে শ্রোতা

এক বক্তার সমাগম ক্রমবর্ধমান—অবশ্য ছাত্রীদের বিতর্কে অংশগ্রহণ করার কোন আশা তো এবারেও দেখতে পাওয়া যায় নি। বিতর্ক সম্বন্ধে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পুনরায় যে মনোযোগ দেখিয়েছেন তাতে আমার আর একটি ইচ্ছাও পূর্ণ হয়েছে—এটি হোল প্রতি শ্রেণীতে বিতর্ক-গোষ্ঠী প্রবর্তন করে অনভিজ্ঞ ছাত্রছাত্রীদের বিতর্ক-রীতিতে পরিচিত করা। এই কার্যটির জন্য প্রতি শ্রেণীর ছাত্রেরা আমাদের ধন্যবাদভাজন। একটি প্রদর্শনী সভায় কয়েকজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ বিতর্ক-বিশারদদের আলোচনা শোনবার দৌভাগ্যও আমাদের হয়েছে। আমার ভরসা আছে যে আমার পরবর্তী সম্পাদক যে উৎসাহ ও বিতর্কানুরাগ নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, তাতে তিনি পাক্ষিকের স্থলে হয়তো সাংগঠিক বিতর্কানুষ্ঠান করতে পারবেন।

গত জুলাই মাসের ১১ই তারিখে ১নং ঘরে “In the opinion of the house, reorganisation of the country by parliamentary means, and not by revolution, is desirable”—এই প্রস্তাবটি নিয়ে একটা বিতর্কের আয়োজন করা হয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণের মধ্যে শ্রীঅমিয় মজুমদার সভাপতি ছিলেন এবং শ্রীরমেশ ঘোষ ও জনাব মামুদ বিচারকরূপে উপস্থিত ছিলেন। বিতর্ক-বিষয়টি তুমুল উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। ভোটদান কালে বিষয়ের বিরুদ্ধ মতই গৃহীত হয়। তৃতীয়বর্ষ কলাশ্রেণীর প্রদীপ দাশ প্রথমস্থান অধিকার করেন ও চতুর্থ বর্ষের পার্থসারথি গুপ্ত ও রণবীর দাশ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এর পরে ২৫-এ জুলাই, ৩নং ঘরে একটি বিতর্ক-সভার অনুষ্ঠান হয়। বিতর্কবিষয়টি ছিল “A Communist society cannot produce art of the best type”। সভাপতিত্ব করেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত। অজ্ঞাত বিচারকর্তা ছিলেন শ্রীঅমিয় মজুমদার ও শ্রীঅমল ভট্টাচার্য। চতুর্থ বর্ষের পার্থসারথি গুপ্ত ও অমর্ত্য সেন এবং তৃতীয়বর্ষ কলাশ্রেণীর প্রদীপ দাশ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রতি শ্রেণী থেকেই ছাত্রেরা এ বিতর্কে যোগদান করেছিলেন এবং প্রথম বর্ষের অশোক চ্যাটার্জি বিচারকমণ্ডলীর মতে সেদিনকার সভায় অজ্ঞাতম কৃতী বক্তা হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। কলেজে এই তাঁর সর্বপ্রথম বিতর্কে যোগদান। এ সভাতেও ভোট বিয়ের বিরুদ্ধমতই গৃহীত হয়।

গ্রীষ্মাবকাশের পর প্রথম প্রদর্শনী বিতর্কসভার আয়োজন করা হয় ১২ই আগস্ট ফিজি বক্তৃতাকক্ষে। “The Choice in India lies between Communism and Right Totalitarianism” ছিল বিষয়বস্তু ও এর উপর আলোচনা করেন Bengal Debating Society’র পক্ষ থেকে শ্রীহৃৎগুপ্ত দাশগুপ্ত, শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদীপক রায় ও কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেন অমর্ত্য সেন, পার্থসারথি গুপ্ত, প্রদীপ দাশ ও অশোক চ্যাটার্জি। বিষয়টি ভোটাদিক্যে গৃহীত হয়। সভাপতি ছিলেন শ্রীঅমিয় মজুমদার।

২৫এ আগস্ট পুনরায় ফিজি বক্তৃতাকক্ষে বাংলা ভাষায় একটি সাধারণ বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়। বিষয়বস্তু “বাংলা কবিতা ক্রমশঃই অবনতির পথে” নিয়ে সভায় ও বক্তাদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই দিনের সাধারণ বক্তৃতার মান বেশ উঁচু ছিল। অমর্ত্য সেন ও পার্থসারথি গুপ্ত যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করে পুরস্কার পান ও দ্বিতীয়বর্ষ শ্রেণীর শিশির দাস তৃতীয়স্থান লাভ করেন। শ্রীঅমিয় মজুমদার সভাপতিরূপে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বিচারকর্তা ছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকশ্রয় শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভূদেব চৌধুরী ও শ্রীক্ষুদিরাম দাস।

১৩ই সেপ্টেম্বর ৩ই একই স্থলে শেষ বিতর্কসভার আয়োজন হয়। বিষয়বস্তু ছিল “Under the present economic set-up, India is still a colony,” এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅমিয় মজুমদার। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক শ্রীশিশির চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীঅরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীঅন্ধান দত্ত। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এই সভাটি সার্থক করা হ্রস্ব হয়ে উঠতো।

গত মার্চ মাসে আমাদের কলেজ থেকে একটি দল শিবপুর বি. ই. কলেজের একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতায়

যোগদান করেছিল। খেট ব্রিটেনে যে ভারতীয় বিতর্কনল পাঠাবার কথা ছিল তার জন্ম জুলাই ১৮ই তারিখে বিদ্যবিভাগে এক প্রাথমিক নির্বাচনী সভা হয়। সভাতেই বক্তাদের বিষয়বস্তু বলে দেওয়া হয়েছিল। কলেজের তরফ থেকে বলেন স্বাতন্ত্র্যের শ্রেণীর সুধাংশু দাশগুপ্ত এবং পার্থসারথি গুপ্ত ও শ্রীপ দাশ। তাঁদের মধ্যে থেকে যদিও কেউ প্রথম স্থান অধিকার করেন নি, তবুও তাঁদের বক্তৃতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে সেদিন কাঙ্ক্ষিতই দ্বিমত ছিল না।

কলেজের প্রাচীর পত্রিকা 'দেয়ালী'তে আমি বলেছিলাম যে একটি আন্তঃকলেজীয় বিতর্ক ও একটি অধ্যাপক বনাম ছাত্র বিতর্কের অনুষ্ঠান করার আমার ইচ্ছা আছে। দুঃখের বিষয় যে সময়ের অভাবে ও অজ্ঞাত গুরুতর কারণে এই সভাগুলির আয়োজন করা সম্ভব হয়ে উঠল না। আশা করি আমার পরবর্তী সম্পাদক এই কাজগুলি করে যেতে পারবেন।

গ্রীষ্মকালের পর থেকে প্রতি শ্রেণীর বিতর্কসভাগুলি, যথাক্রমে প্রবুদ্ধ রায় ও ভারতী সেনগুপ্ত (তৃতীয় বর্ষ), শ্রীপ গাঙ্গুলী ও শ্রীমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্বিতীয় বর্ষ) ও প্রথমবর্ষের অশোক চ্যাটার্জির সম্পাদনায় খুবই কার্যতৎপরতা দেখিয়েছে। তৃতীয় বর্ষ পাঠক্রম "India's foreign policy is out and out neutral" ও "Communism cannot solve the problems of India" সম্বন্ধে দুটি বিতর্কসভার অনুষ্ঠান করেন। দ্বিতীয় বর্ষের বক্তারা "Poetry declines with the progress of civilization" সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রথম বর্ষে "Violation of order is not the right way to solve the food problem of W. Bengal" ও "Third World War is the only way to establish peace on earth" সম্বন্ধে বিতর্কসভার ব্যবস্থা করা হয়। "Nationalism is an international danger" সম্বন্ধে তৃতীয় ও প্রথম বর্ষের মধ্যে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয় ও বিরুদ্ধবাদী তৃতীয়বর্ষকেই জয়ী ঘোষণা করা হয়। এই সভাগুলিতে অনেক নবীন বক্তা বিতর্ক ব্যাপারে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। যে ক'জন কলেজেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তাঁরা ছাড়া তৃতীয়বর্ষের অজিত রায় ও দ্বিতীয়বর্ষের অনির বাগচী ও প্রথম বার্নার্ডী ও প্রথমবর্ষের অরুণাভ দাশগুপ্ত ও অর্জুন সেনগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

এ বছর বিতর্কপরিষদের কার্যে যদি কিছুমাত্র উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তার প্রধান কারণ হবে কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয় ও কয়েকজন অধ্যাপকের সহায় প্রেরণা। ছাত্রবন্ধুদের মধ্যে অনেকেই আয়োজন ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করেছেন। এঁদের মধ্যে অমর্ত্য সেন, নীতিশ সেনগুপ্ত ও পার্থসারথি গুপ্তের সেংদাহ সহযোগিতার জন্ম আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সুধীর চক্রবর্তী, বিমল বর্মন ও রণেন গুপ্তও আমাকে অকুণ্ঠভাবে তাঁদের সাহায্যদান করে ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। বিতর্ক পরিষদের কার্যবর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি তারশাণ্ড অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদারের প্রতি আমরা সন্মত ধন্যবাদ না জানাই। কয়েক বছর ধরে বিতর্ক পরিষদকে তিনি বেরূপ অক্লান্তভাবে নির্দেশদানে সম্বুদ্ধ করেছেন, তা না পেলে বোধহয় আমাদের কাজ দুঃসাধ্য হয়ে উঠতো।

বরণ দে—বিতর্ক-সম্পাদক

[এই প্রসঙ্গে কলেজের বাইরেও বিতর্কানুষ্ঠানে আমাদের ছাত্রদের কৃতিত্বের নির্দর্শনরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর শ্রীঅমর্ত্যকুমার সেন বহরমপুরে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এবং প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর শ্রীঅর্জুন সেনগুপ্ত University Institute-পরিচালিত বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন। স. প্র. ক. প.]

রবীন্দ্র পরিষদ :

গতবারের সংখ্যায় 'নবীন' নাটকটি পরিষদের মঞ্চস্থ করা সম্পর্কে কিছু লেখা হয়েছিল। কিন্তু পরিষদের দায়িত্ব থাকলেও সেটা বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেসের সভ্যদের জেই বিশেষভাবে অভিনীত হয়েছিল।

এবারের বিবরণীর মধ্যে যে-সব অনুষ্ঠানের পরিচিতি পড়ে সেগুলো সবই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের কাছে পরিবেশিত। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই, আমাদের কলেজে গানবাজনা ছাড়া অন্য কোনো অনুষ্ঠানে ততটা সামগ্রিক সহানুভূতি ও প্রত্যক্ষ সহায়তা পাওয়া যায় না, তবে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের আগ্রহে অনেক সময়ে সত্যিই এ ধরনের কাজে উৎসাহ পাওয়া যায়।

‘নবীনের’ পরে সবার প্রথমে হয়েছিল সংলাপ ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতের সহযোগে ‘স্বদেশ’ এই পর্বায়ে একটি অনুষ্ঠান। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহটি আমাদের কলেজে শান্তিসপ্তাহ হিসাবে পালিত হয়েছিল; তার কিছু পরেই এটি অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত এই অনুষ্ঠানটি নতুনবে ও সার্থকতায় প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল।

এর পরের অনুষ্ঠান ২৬শে জুলাই তারিখে সন্ধ্যায় একক সংগীতানুষ্ঠান। ‘স্বদেশের’ মত এটিও কলেজের আর্টস লাইব্রেরি হলে হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, যেটা দ্বৈত ও মৃৎনক সংগীতের মধ্যে বেশি সম্ভব নয়। সংগীত পরিবেশন করেছিলেন বীথিকা রায়, স্নত্রত দত্ত, রবীন মুখোপাধ্যায়, রাজর্ষি মজুমদার, দ্ব্যাতীশ দাশগুপ্ত, শংকর সেন ও অরূপ রায়। নিমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে গান গেয়েছিলেন রত্না সেনগুপ্ত।

নিউএম্পায়ার রক্ষমঞ্চে গত ১২ই সেপ্টেম্বর সকালে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান। ‘ঋতুরঙ্গ’ নামে এই সংগীতালেখ্যটি পূজোর বন্ধের ঠিক আগেই অনুষ্ঠিত হয়, এবং তাতে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যেরকম উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তা অনেকদিন পাওয়া যায় নি। সংলাপাংশ রচনা করেছিলেন অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র-সংগীতের ধারায় বড়ুখতুর লীলাময় প্রকাশ এই অনুষ্ঠানটির বিষয়বস্তু ছিল। সংগীত নির্বাচন ও তার সংযত পরিবেশনা আকর্ষণীয় হয়েছিল। আবৃত্তির অংশ একটু দুর্বল হয়ে পড়লেও সংগীতগুলি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন বীথিকা রায়, গীতা গুহরায়, দীপালী গুপ্ত, চিত্রা সরকায়, দীপালী ঘোষাল, মাধুরী বড়ুয়া, সেলিমা প্রধান, জয়ন্তী চক্রবর্তী, পূরবী বসু, বেলা ভট্টাচার্য, বেলা ঘোষ, শংকর সেন, রবীন মুখোপাধ্যায়, অমিত মিত্র, গগন দত্ত, অমল মুখোপাধ্যায়, অরূপ রায়—সংলাপাংশে অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, কল্যাণ দাশগুপ্ত, অমর্তা সেন, পার্থসারথি গুপ্ত, সন্মীর রায়, অর্জুন সেনগুপ্ত এবং সংগীতাংশে নিমন্ত্রিত শিল্পী ছিলেন অমিয়া রায়, তরুণ মিত্র ও বিমল নাগ।

যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে শেষের অনুষ্ঠানটির বাবস্থাপনায় সহায়তা করেছিলেন তাঁদের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আর শ্রীতরুণ মিত্রের কাছে সংগীতাংশের মহড়ার তত্ত্বাবধানের জন্তে আমি ঋণী। আমার কার্যকাল শেষ হ’ল। অনুবর্তী সফলতর হোন এই কামনা করে বিদায় নিচ্ছি।

অরূপ রায়—সম্পাদক

সমাজসেবা বিভাগ :

যদিও সমাজসেবা বিভাগের প্রাক্তন সম্পাদক মহাশয়ের ‘অনেককিছু’ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বিশেষ কিছু কাজ করার আগেই তাঁকে কার্খোপলক্ষে অন্তত্ৰ চলে যেতে হয়েছে। তাঁর বিদায়ের পর ছাত্রপরিষদ যখন আমাকে নির্বাচিত করেন তখন আর আমাদের হাতে এমন সময় অবশিষ্ট ছিল না যাতে অনেককিছু করা যেতে পারে। স্তত্রাং ছোট ছোট কিছু কাজ করেই আমাদের এবারকার মত সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই ছোট ছোট কার্খগুলির মধ্যে বহু ছুঃস্থ দরিদ্র নিরন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য, রোগাক্রান্ত বহু ব্যক্তিকে ঔষধ ও অর্খের দ্বারা সাহায্য, উল্লেখযোগ্য বিষয়। যে সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা হয়েছে তাঁর মধ্যে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ছাত্রের সংখ্যাই বেশী। এছাড়া T. B. Seal বিক্রয়ের জন্তে এবার কলেজে অভিযান শুরু করা হয়েছিল এবং ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে এই

অভিনয় শিক্ষানুষ্ঠান করে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য আর বিশেষ কিছু সমাজসেবা বিভাগ করে উঠতে পারেনি। আমরা জানি, আরও অনেককিছু আমাদের করা উচিত ছিল কিন্তু সমযাভাবে করা সম্ভব হয়নি। এর জন্তু ও আমাদের আরও বহু ক্রটিবিচ্যুতির জন্তু ছাত্রছাত্রীরা আমাদের ক্ষমা করবেন। সবশেষে আমাকে আমার কাজ সাহায্য করার জন্তু ধন্যবাদ জানাব শ্রীবীরেন পালচৌধুরী, শ্রীঅশোক চ্যাটার্জি, শ্রীদুর্গাদাস রায়, শ্রীশঙ্কর সেন, শ্রীব্রজেননাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী গৌরী দাসগুপ্তকে। এঁদের ঐকান্তিক সাহায্যের জন্তু আমি কৃতজ্ঞ। এই উপলক্ষে অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীকে জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। তাঁর সাহায্য ও উপদেশ সবসময় আমাদের উৎসাহ দিয়েছে।

সম্বন্ধিকুমার চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক, সমাজসেবা বিভাগ

নাট্যপরিষদ :

এ বছরের নাট্যানুষ্ঠান বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। গত ১০ই সেপ্টেম্বর 'নিউ এম্পায়ার' রঙ্গমঞ্চে নাট্যপরিষদের পরিচালনায় বনফুলের 'নবসংস্করণ' ও পরশুরামের 'বিরিকিবাবার' নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়। কলেজের ছাত্রেরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এবারকার নাট্যানুষ্ঠানে অভিনয়, পরিচালনা, আর সঙ্গীত রচনা ইত্যাদিতে যে সামগ্রিক নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বে বহু বছর নাট্যানুষ্ঠান এ বছরের মত সাফল্যলাভ করেনি। নাটকের বিভিন্ন বিভাগে ও ভূমিকায় যারা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শুধু নাট্যানুষ্ঠানে নয়, এবার ঐ দিনই একটি বিচিত্রানুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়। কেশাদারী শিল্পীদের বর্জন করে কলেজের শিল্পীরাই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিচিত্রানুষ্ঠানটিও ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট আনন্দ দেয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের কাছ থেকে বিশেষ আগ্রহ, ধৈর্য ও ভক্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানে বহু ক্রটিবিচ্যুতি হয়েছিল। সব অনুষ্ঠানেই ক্রটিবিচ্যুতি হয় এবং আমাদের অনুষ্ঠান তাহার ব্যতিক্রম নয়। এই সকল ক্রটিবিচ্যুতির জন্তু ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সবশেষে, ধন্যবাদ জানাব তাঁদের, যাঁদের আন্তরিক সাহায্য ও উপদেশ আমাকে কার্যসম্পাদনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীযতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়কে। তাঁর উপদেশ ও উৎসাহ সব কাজেই আমরা পেয়েছি। অধ্যাপক শ্রীমনোমোহন ঘোষ মহাশয়কেও এই উপলক্ষে ধন্যবাদ জানাই। ছাত্রদের মধ্য থেকে যাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্য ব্যতীত আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হ'ত না, তাদের সকলকার নাম এই অল্পপরিমিত জায়গায় উল্লেখ করা সম্ভব হবে না, কিন্তু তাঁদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। ছাত্রদের মধ্যে শ্রীহনীতি বসু, শ্রীহরী চক্রবর্তী, শ্রীদুর্গাদাস রায়, শ্রীপ্রদীপ দাস, শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুচিত্র চক্রবর্তী, শ্রীশেখর দত্ত, শ্রীবরুণ দে, শ্রীবিমল বর্মণ ও শ্রীবীরেন পালচৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরবর্তী নাট্যসম্পাদকের পরিচালনায় নাট্যপরিষদ আরও উন্নতি ও প্রগতিশীলতার পথে এগিয়ে যাক এই কামনা করে আজকের মত আমার বিবরণ শেষ করব।

শ্রীসম্বন্ধিকুমার চট্টোপাধ্যায়—নাট্যসম্পাদক

ছাত্রাবাস :

বর্তমান বৎসরে ইডেন হিন্দু হোস্টেলের আবাসিক সংখ্যা ১৮০। আবাসিকদের অধিকাংশই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। কিছুসংখ্যক সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং কিছুসংখ্যক মধ্যকলিকাতা কলেজের ছাত্রও আছে। নাই শুধু প্রেসিডেন্সী কলেজের স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রগণ, বাহাদের অভাব আজ প্রতিটি আবাসিকের কাছে

বেদনাদায়ক। ছাত্রাবাসের আবাসিকগণ আজ শুধু বেদনাক্লিষ্টই নয়, কর্তৃপক্ষের এ ব্যবস্থায় রীতিমত ক্ষুব্ধ। আবাসিকগণের এই ঐতিহাসিক ক্ষোভদমনে প্রথমেই কর্তৃপক্ষের সহায় দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ছাত্রাবাসের পরিচালনার ভার শুভ আছে, আবাসিকদের দ্বারা গঠিত কয়েকটি কার্যনির্বাহক সমিতির উপর। সমিতির সদস্যগণ সকলেই আবাসিকদের দ্বারা নির্বাচিত। ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী ছাত্রপরিষদের সভাপতি। শ্রীহৃদয় চক্রবর্তী এবং শ্রীমৃগালকান্তি মল্লিক বর্তমান ছাত্রপরিষদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

আবাসিকগণের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং কার্যনির্বাহক সমিতির সুযোগ্য পরিচালনায় এবং সর্বোপরি ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তীর স্নেহময় তত্ত্বাবধানে আমাদের কয়েকটি কার্যকে ছাত্রাবাসের অতীত ঐতিহ্যরূপ বলিয়া দাবী করিতে পারি।

আমাদের ছাত্রাবাস কর্তৃক পরিচালিত কলিকাতা আন্তঃছাত্রাবাস ফুটবল প্রতিযোগিতায় আমরা অংশগ্রহণ করি। ছাত্রাবাসের আন্তঃওয়ার্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায় ৪র্থ এবং ৫ম ওয়ার্ড একযোগে চ্যাম্পিয়ান হয়। আন্তঃওয়ার্ড ভলিবল প্রতিযোগিতায় ১ম ওয়ার্ড অতি উচ্চাঙ্গের খেলা প্রদর্শন করিয়া ফাইনালে ৪র্থ ওয়ার্ডকে পরাজিত করে। প্রতিযোগিতা অস্ত্রে অধ্যাপক চক্রবর্তী পুরস্কার বিতরণ করিয়া আবাসিকদের আনন্দ বর্ধন করেন।

আবাসিকগণের মননশীলতার ক্ষেত্ররূপে এ বৎসর আমাদের দেয়াল পত্রিকা 'স্কুলিঙ্গের' উদ্বোধন করি। অধ্যাপক চক্রবর্তীর নিকট হইতে আবাসিকগণ মননশীলতার উদ্দীপক যে স্কুলিঙ্গ লাভ করিয়াছে তাহা এখনও নির্বাচিত হয় নাই।

শারদীয়াপূজার পূর্বে এ বৎসর বিশিষ্ট সাংবাদিক ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে আমাদের হোস্টেলে এক বিতর্কসভার অনুষ্ঠান হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল—'Under the present political set-up, the stand taken by the Kashmir Constituent Assembly is unjustifiable.'

শুধু তাহাই নহে আবাসিকদের মননশীলতার ক্ষেত্ররূপে আরও রহিয়াছে কমনরুমের বিচিত্র ব্যবস্থা ও লাইব্রেরী। এ বৎসরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাত্রাবাসের প্রাক্তন আবাসিক ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের ছাত্রাবাসে শুভাগমন। বর্তমান আবাসিকগণ তাহাদের একজন প্রাক্তন আবাসিককে ভারতের রাষ্ট্রপতি রূপে পাইয়া ছাত্রাবাসে তাঁহার আগমন উপলক্ষে বিপুল সংবর্ধনা জানায় এবং এক মানপত্র প্রদান করে। পুরাতন আবাসিকের স্মৃতিচিহ্নরূপ তিনি ছাত্রাবাসের বর্তমান আবাসিকদের প্রদান করেন তাঁহার নিজের এক হৃদয় প্রতিকৃতি আর ছাত্রাবাস কর্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত হয় তাঁহারই সহিত গৃহীত একটি সমবেত আলোকচিত্র। 'আমাদের কথার' পুরোভাগে এই আলোকচিত্রটি প্রকাশিত হইল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বাইতে পারে যে আবাসিকগণ যখন এই ছবিটি উপহার দিতে রাজত্ববনে তাঁহার সহিত দেখা করে তখন তিনি ছাত্রাবাসের বার্ষিক সরবতী পূজার জন্য একশত টাকা চাঁদা দেন।

রাষ্ট্রপতির আগমনের পূর্বদিন এক মনোজ্ঞ পরিবেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেশ্বরকুমার মুখোপাধ্যায় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সম্মানার্থে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ছাত্রাবাসের দ্বারে স্থাপিত মর্মর ফলাকের আবির্ভাব উন্মোচন করেন।

গতবৎসর আমাদের ছাত্রাবাস হইতে শ্রীমৃগালকান্তি করগুপ্ত আই, এন্স সি পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করে। এতদ্ব্যতীত বি, এন্স-সি পরীক্ষায় তিনজন ছাত্র প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করিয়াছে।

সম্প্রতি শীতের সমাগমে অধ্যাপক চক্রবর্তী তুমুল হর্ধধরনির মধ্যে হোস্টেলে ক্রিকেট ক্লাবের উদ্বোধন করেন। তাছাড়া ভলিবল, টেনিসকে প্রভৃতি খেলাও বিশেষ উৎসাহের সহিত চলিতেছে।

শ্রীমৃগালকান্তি মল্লিক—সাধারণ সম্পাদক, ইন্ডেন হিন্দু হোস্টেল ছাত্রপরিষদ।

ছাত্রীসংবাদ :

গার্লস্ কমন্সরুমটা সেই বস্ত—যেটা না থাকলেও চলেনা, থাকলেও চলেনা। উপরন্তু তার কর্ণধার যদি দার্শনিক হন তবে তো মাননদীতেই তরী বানচাল হবার আশংকা। তবু তরী পৌঁছন গিয়েছে।

কমনরুম সেক্রেটারীর কাজের সীমারেখা যদিও বহুখা বিস্তৃত, কার্যতঃ তা শুধু মেয়েদের পানীয়ের ব্যবস্থা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবু এবার একটা নতুন প্রয়োজনীয় কাজ আমরা করতে পেরেছি। সেটা হচ্ছে মেয়েদের খাবার ব্যবস্থা। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ শ্রীযতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও ইউডেন হিন্দু হস্টেলের ক্যাট্টানের কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কাজ করতে গিয়ে দুটো বিষয়ে অভাব অনুভব করতে হয়েছে। প্রথমতঃ ইউনিয়নে ছাত্রীদের জন্ম কোন পৃথক অর্ধভাগুর নেই, এবং দ্বিতীয়তঃ ছাত্রীদের স্বার্থরক্ষা করার জন্ম উপযুক্ত ছাত্রীপ্রতিনিধি নেই ইউনিয়নে। এর ফলে যখন নানা বিষয়ে ছাত্রীদের কাছে আহ্বান আসে বিশেষ ভাবে কিছু করার বা করাবার তখন অর্থ ও সহযোগিতার অভাবে পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হয়ে উঠেনা। যুথের কথা, এবছর ইউনিয়নে একজন ছাত্রী প্রতিনিধি গিয়েছেন। আশা করছি অচিরেই ছাত্রীবিভাগের অহবিধা গুলি দূর হবে।

বরণা সেন—সম্পাদিকা, গার্লস্ কমন্সরুম

জুনিয়র কমন্সরুম :

প্রতিবছরের মত এবারেও জুনিয়র কমন্সরুমের তরফ থেকে 'স্ট্রীমার-পার্টি'র ব্যবস্থা করা হয় এবং অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী মিলে প্রায় পাঁচশো জন এতে অংশগ্রহণ করেন।

এবারে একটা আন্তঃবিভাগীয় টেবিলটেনিস টুর্নামেন্ট খেলার ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা হয়। পরিষদ থেকে এবারে এই বিভাগে যে অর্থ দেওয়া হয়েছিল, তা' প্রয়োজনের তুলনায় যথোপযুক্ত নয়। আশা করি, এবার থেকে আরও বেশী টাকা দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

অধ্যাপক মামুদ সবারকম উৎসাহ ও পরামর্শ দানে কাজের সাহায্য করেন—এজন্ম আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

কাজল দত্তগুপ্ত—সম্পাদক, জুনিয়র কমন্সরুম

খেলাধুলা বিভাগ :

এ বছরের কর্মকর্তৃমণ্ডলী যথারীতি নির্বাচিত হবার পর পরিষদের প্রথম অধিবেশন অধ্যাপক শ্রীমনীগোপাল চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সাধারণ সম্পাদক এবং বিভাগীয় সম্পাদকগণ নির্বাচিত হন, ফুটবল সম্পাদক ইতিপূর্বেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। ছাত্রীরা নিজেরা একজন প্রতিনিধিকে নির্বাচন করেন। এই পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে এই বছরের বাজেট গৃহীত হয়—সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক শ্রীমনীগোপাল চক্রবর্তী। এই বছরের কাজের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দিলাম।

ফুটবল : এই বিভাগের সম্পাদক ছিলেন শ্রীমনীগোপাল দত্ত এবং অধিনায়ক ছিলেন শ্রীকাজলকুমার দত্তগুপ্ত। নিয়মিত Practice-এ অনেক ছাত্র যোগদান করেন এবং যথারীতি 'ট্রায়াল মাচ' খেলার পর কলেজ টীম গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃকলেজ লীগে আমরা আমাদের গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি। হেরথ মৈত্র শীল্ড খেলায় দ্বিতীয় রাউণ্ডে আশুতোষ কলেজের নিকট ১—০ গোলে পরাজিত হই। ১৫ বৎসর বাদে পুনরায় এবছর আমরা হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ডের ফাইনালে উঠেছিলাম। সিন্টিকে ৪—০, বিছাঙ্গাগরকে ২—০ এবং বঙ্গবানীকে ২—০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে গ্র্যাশনাল মেডিকেল কলেজের নিকট ৩—০ গোলে পরাজিত

হই। সেদিন ৬ জন কলেজ টিমের নিয়মিত খোলোয়াড় অনুপস্থিত ছিলেন। এবার নতুন করে আন্তঃবার্ষিক লীগ খেলার প্রবর্তন করা হয়। চতুর্থবর্ষ সর্বাধিক পয়েন্ট পেয়ে লীগবিজয়ী হন আর বি. এম. সেন কাপে চতুর্থবর্ষ স্নাতকোত্তরের নিকট পরাজিত হন। এবারকার প্রদর্শনী ফুটবল খেলা ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে হয়। খেলাটি খুব আনন্দজনক হয়। খেলাটি শেষপর্যন্ত অসামান্যভাবে শেষ হয়। মোটের উপর এ বছরকার ফুটবল খেলায় গতবারের চেয়ে উন্নতি লক্ষিত হয়েছিল।

ক্রিকেট : এই বিভাগের সম্পাদক শ্রীতান্ত্রী ভট্টাচার্য এবং অধিনায়ক ছিলেন শ্রীধীরেন নিয়োগী। এবার আমরা কলিকাতার যে কয়েকটি বড় বড় ক্লাবের সহিত আমাদের মাঠে খেলেছিলাম তার মধ্যে মোহনবাগান, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ভবানীপুর ক্লাব উল্লেখযোগ্য। স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে আমরা ৬ উইকেটে জয়লাভ করি। মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে বাংলার প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় পি. সেন, মর্টু সেন, জ্যোতিষ মিত্র খেলেছিলেন। যাদবপুর কলেজের সংগে খেলায় আমরা পরাজিত হই। এবার আমাদের ক্রিকেটদল শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল। শান্তিনিকেতনের সহিত খেলাতে অরুণ রায় ৩৮ রান করে এবং বিমল বর্মা ১৮ রানে তিনটি উইকেট লাভ করে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এ বছর ব্যাটিংএ শ্রীপ্রদীপ দাস এবং বোলিংএ নারায়ণ গাঙ্গুলী উৎকর্ষের পরিচয় দেন।

হকি : এবারকার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীপ্রবীর গুহঠাকুরতা। হকির মরশুম এখনও আরম্ভ হয়নি তবে আশা করি শ্রীপ্রবীর গুহঠাকুরতার পরিচালনায় এবারকার হকিখেলা ভালভাবে সম্পন্ন হবে।

নৌ-চলনা : এই বিভাগের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীমনোমী চাটার্জি আর অধিনায়ক নির্বাচিত করবার কোন দরকারই পড়েনি কারণ এবছরের Resolution অনুযায়ী ১২ জন সভ্য না হওয়ার এই বিভাগটি এই বছরের মত উঠে গেছে। ভবিষ্যতে আরও অধিক উৎসাহ না পেলে ছাত্রগণ Rowing করবার এইরূপ স্থূর্ণ সুযোগ চিরকালের জন্ত হারাবেন।

টেনিস : এই বিভাগের সম্পাদক শ্রীসঞ্জীবকুমার বিশ্বাস। এবার এই বিভাগের সভ্য আছেন মোট ৮ জন। আন্তঃকলেজ টেনিস প্রতিযোগিতাতে যেসকল ট্রফি আগে আমাদের কলেজ লাভ করত আজ কয়েকবছর যাবৎ তাদের কোনটি আমাদের কলেজে আসে নি। ছাত্রদের নিকট থেকে আবার অধিক উৎসাহ না দেখা গেলে Rowing Section-এর মত এটাও হয়তঃ অচিরে উঠে যাবে।

স্মল এন্ট্রিয়া গেম্‌স্ : এই বিভাগের সম্পাদক শ্রীশঙ্কর সেন। আমাদের আন্তঃকলেজ Volley Ball প্রতিযোগিতা শীঘ্রই আরম্ভ হবে। Badminton খেলা নিয়মিত হচ্ছে কিন্তু কলেজে কোন ঘেরা জয়গা না থাকার দরুন সত্যিই অনুবিধা হচ্ছে।

ব্যায়ামাঙ্গণ : মোটামুটি ১৫ জন ছাত্র নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করেন।

ছাত্রীবিভাগ : এই বিভাগের সম্পাদিকা মল্লি ঘোষের পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীরা মাঝে মাঝে ব্যাডমিন্টন ও টেনিসখেলে খেলেন।

এবার বাৎসরিক প্রতিযোগিতার দিন ২৭ জানুয়ারী নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার বিস্তৃত বিবরণী পরে সংক্ষেপে শেষ করব।

আমাদের অভাব ও দাবী : প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের মূল্যবৃদ্ধির জন্ত আমাদের খরচে কুলানো হ্রাসনাথ হয়ে উঠেছে। আমাদের সরকারী বরাদ্দ ১০০০ টাকাকে ২০০০ করার জন্ত আমরা বছরের পর বছর দাবী করে আসছি কিন্তু Red tape-এর কল্যাণে তা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। পরিশেষে আমাদের অধ্যক্ষ, পরিদর্শক শ্রীযুক্ত চাটার্জী, বিভাগীয় সভাপতি, সম্পাদক ও অধিনায়কদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি।

প্রতিপদে তাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না।

কাজলকুমার দত্তগুপ্ত—সাধারণ সম্পাদক

বাংলা পাঠগোষ্ঠী :

গতবারের পত্রিকায় পাঠগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। গত-সংখ্যায় সংবাদপ্রেরণের অব্যবহিত পরে বাংলা-অনাস-বিভাগের ছাত্রছাত্রীগণ ও অধ্যাপকদের নিয়ে একটা 'গ্রুপ ফোটা' তৈরী হইয়াছে এবং ফোটাখানি 'এনলার্জ' করে বাংলা-গোষ্ঠীর জন্ম নির্দিষ্ট ঘরটিতে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে।

খাতনামা কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার-এর মৃত্যু উপলক্ষে বিশেষভাবে বাংলা-পাঠগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে একটা শোকসভা আহ্বান করা হয়। গত ১লা আগস্ট অপরাহ্ন ৩-৩০ মিনিটে কলেজের ১নং ঘরে এই বিষয়ে বাংলা-গোষ্ঠীর তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় অধ্যাপকগণ এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সকলে দু'মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান হয়ে মৃত কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিপনের পর অধ্যাপক শ্রীদেবীপাল ভট্টাচার্য কবি মোহিতলালের উপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সভায় সম্পাদক নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কবি মোহিতলাল মজুমদার' শীর্ষক স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। এরপর সভায় বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীরা মোহিতলালের উপরে প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন এবং মোহিতলালের কবিতা আবৃত্তি করেন।

গত ১১ই আগস্ট অপরাহ্ন সাড়ে তিনটের সময়ে কলেজের ১নং ঘরে বাংলা-পাঠগোষ্ঠীর চতুর্থ অধিবেশন হিসাবে 'রবীন্দ্র-স্মরণ-দিবস' উদ্দেশ্যে পিত্ত হইয়াছিল। কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও বিভাগীয় অধ্যাপকবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা এই উৎসবে পর্যায়ক্রমে রবীন্দ্র-সংগীত, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ ও স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সভাপতি অধ্যক্ষ-মহোদয় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে হৃচিন্তিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

এটিই বাংলা-পাঠগোষ্ঠীর বর্তমান বছরের শেষ অধিবেশন। এবার আমাদের বিদায় নেবার পালা। আশা করি, নবগত তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা আগামী বৎসরে বাংলা-পাঠগোষ্ঠীর প্রভূত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবে।

শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক

ইতিহাস সেমিনার :

প্রেসিডেন্সি কলেজ ইতিহাস সেমিনার পোস্ট-গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েট এই দুই বিভাগে বিভক্ত। তবে প্রথমোক্ত বিভাগটির কাজ কেবল এক আলমারী বই নিজেদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করাতে সীমাবদ্ধ হওয়ায় সেমিনারের ঐতিহ্যরক্ষার দায়িত্ব বর্তেছে দ্বিতীয় বিভাগটির ওপর। ইতিহাসসেমিনার বলতে তাই সাধারণতঃ দ্বিতীয় বিভাগটাই বোঝাত। চলতি বৎসরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ এই দুই বিভাগের মধ্যে যতদূর সম্ভব একত্রীকরণ কোরে সেমিনার পুনর্গঠন করার প্রচেষ্টা। অধ্যাপক শ্রীমুশোভনচন্দ্র সরকারের সভাপতিত্বে এই দুই বিভাগের এক যুক্ত অধিবেশনে পুনর্গঠন সংক্রান্ত নানা আলোচনার পর ব্যাপারটি সাময়িকভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় সভাপতি ও চারজন সদস্যের এক সমিতির হাতে। বর্তমান বিবরণী লেখার সময় এই সমিতি এক চূড়ান্ত পরিকল্পনার কাজে হাত দিয়েছে। সেমিনারের পরবর্তী অধিবেশনে এই পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা হবে।

কলেজ-পত্রিকার পূর্ববর্তী সংখ্যাপ্রকাশ এবং বর্তমান সময়ের মধ্যে এছাড়াও সেমিনারের তিনটি অধিবেশন বসেছিল। এই তিনদিন নিম্নলিখিত প্রবন্ধত্রয় পঠিত হইয়াছিল।

- ১। History—A Vital Study of the Day—বিনয় চৌধুরী।
- ২। Role of Religion in History—নীতিশ সেনগুপ্ত।
- ৩। Nature and Development of the Athenian Democracy—স্বধীর সরকার।

তিনদিনের অধিবেশনেই সেমিনার সভা-সভ্যাগণ এবং ইতিহাসের অধ্যাপকবৃন্দ অনেকে উপস্থিত ছিলেন এবং

পাঠান্তরিক আলোচনা যোগ দেন। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের আলোচনার তীব্রতা অনেকের মনেই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এ ছাড়া এক বিশেষ অধিবেশনে কেণ্টাকী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ টমাস ব্লার্ক যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইতিহাস পাঠ ও গবেষণা সম্বন্ধে এক ভাষণ দেন।

সেমিনার লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা বর্তমানে একশোরও বেশি কিছু বেশী। বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের ত্রৈমাসিক মূখপত্র 'ইতিহাস' এবং 'History' নামক একটি ইংরিজিপত্রিকা নিয়মিত আসে। তবে গত বৎসরখানেকের মধ্যে দ্বিতীয়টির একটি সংখ্যাও আমাদের হাতে পৌঁছয়নি। অন্যদিকে ছাত্রদের অবশু প্রয়োজনীয় আরো কয়েকখানি বই সেমিনারলাইব্রেরীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে কলেজলাইব্রেরী থেকে। তবে ইতিহাসের ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং সেমিনারের পরিমিত বইর সংখ্যার কথা স্মরণ করে কিছুটা উদ্বিগ্ন না হয়ে থাকার বায় না। সভ্যদের চাঁদার প্রস্তাব গৃহীত হোলে সেমিনার প্রয়োজন অনুযায়ী নানান বই কিনে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে পারবে বলে মনে হয়।

সেমিনারের ঐতিহ্য অক্ষয় রাখবার জন্ত অনেক বড় বড় পরিকল্পনা আমাদের ছিল—বেশীর ভাগই কার্যে পরিণত করা যায়নি। যে সব ছাত্রবন্ধু ও পুজনীয় অধ্যাপক বিগত বৎসরের কর্মচঞ্চল দিনগুলিতে তাঁদের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদে তাঁদের সাহায্যের পরিমাপ হয় না। কতদূর সাফল্য আমরা অর্জন করেছি সে বিচার করবেন অন্তের। তবে আমাদের দিক থেকে আশ্বাস দিতে পারি যে, চেষ্টার কোন ক্রটি হয়নি।

নীতিশ সেনগুপ্ত—সম্পাদক

অর্থনীতি দপ্তর :

সেমিনার আংশিকভাবে লাইব্রেরী, আবার রুটিনের 'কলোকিয়ম'। লাইব্রেরীর কাজে যথারীতি বই দেওয়া নেওয়া চলেছে, তৃতীয় আর চতুর্থবর্ষের সম্মিলিত সহযোগে। আর অধিবেশনও হরহে গোটা কয়েক। প্রথম হস্ত হয়, স্বথময় চক্রবর্তীর রচনা Theory of Economic Planning নিয়ে। ভারতীয় পরিবেশে প্ল্যানিং-এর বাস্তব রূপ ও সমস্যা নিয়ে সভাপতি অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। দ্বিতীয় রচনা তুবারকান্তি ঘোষের Small Industries in India—A Retrospect অনেক নতুন কথা শোনায়। তৃতীয় বৈঠক বসে যতীকুমার সেনগুপ্তের রচনা 'Community Development Project in India : Its Pros and Cons' নিয়ে। আলোচনার শেষে সভাপতি অধ্যাপক শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য Community Project-এর অর্থনীতিগত বিশ্লেষণ করেন। ব্যক্তিগতভাবে রচয়িতাদের আসি ধন্যবাদ জানাই। তবে, প্রেরণার উৎস হিসাবে, অমুরোধ ও উপরোধও করতে হয়েছে। আমাদের সেমিনারের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাবার ধৃষ্টতা থেকে বিরত রইলাম।

এবারে সেমিনারের মধ্যেই একটা ছোট পাঠগোষ্ঠী কাজ করেছে। প্রথম প্রথম সেমিনার-অধিবেশন অনেকদিন পর পর হত বলে, কয়েকজন ছাত্র মিলে একটা 'TRIO'-গোষ্ঠী করেন। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির আলোচনা হত বলে এর নাম হয় ত্রয়ী-গোষ্ঠী। এই পাঠ-গোষ্ঠীতে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছে। যেমন—(১) 'The Five Year Plan is a feat of economic wizardry', (২) Political democracy without economic equality cannot thrive in modern times. (৩) The American President and the British Prime Minister ইত্যাদি। এই 'বরোয়া' অধিবেশন গুলোতে সভাপতিত্ব ও সহযোগিতা করেছে ছাত্রদের অনেকেই। বাদল চৌধুরী, সুনীল বিশ্বাস, জ্ঞান লাহিড়ী, তুবার ঘোষ, অরুণ দত্ত, সুনীল মিশ্র, কল্লোল দাশগুপ্ত, সুনীতি বোস ও মানস দাশগুপ্ত এদেরই মধ্যে কয়েকজন। ত্রয়ী-গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীযতীকুমার সেনগুপ্ত—অর্থনীতি-সেমিনার-সম্পাদক

রাজনীতি সেমিনার :

যে কোন সেমিনারের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সুযোগদান। সেদিক দিয়ে রাজনীতি সেমিনার সাফল্যলাভ করেছে বলে মনে করি।

যে দু'টি প্রবন্ধের ওপর আলোচনা হয় সে দু'টি হ'ল শ্রীজয়ন্ত রায়ের "The Role of Political Parties in the Working Constitutions of England, the U. S. A. and India", এবং শ্রীবাদল চৌধুরীর "World Peace and the U. N. O."। প্রথম অনুষ্ঠানের আলোচনায় অনেকে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু শেষোক্ত প্রবন্ধটির আলোচনা অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক হয়েছিল।

সেমিনারের বই আদান-প্রদানের কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটে নি। এক্ষেত্রে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদেরও সুবিধাদানের ব্যবস্থা আমরা করেছি। কয়েকটি প্রয়োজনীয় বই তাঁদের জন্তে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

বর্তমান সেমিনারের কার্যকালের মধ্যে আরও দু'টি অধিবেশনের অনুষ্ঠান সম্ভব হবে বলে মনে হয়। একটির আলোচ্য বিষয় হ'ল Democracy and the Individual", এবং আর একটির হ'ল "Federalism in India." প্রথম প্রবন্ধটি পাঠ করবেন শ্রীমানস দাশগুপ্ত।

পরিশেষে সকল সন্তোষের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও বিভাগীয় অধ্যাপকদের উপদেশ আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারিত করেছে। এইজন্তে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রণবীর দাশ—সম্পাদক

দর্শন পরিষৎ :

বৎসরের উত্তরাধে' পরিষদের কার্যনির্বাহে যে বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে কার্যবিবরণী হিসেবে তা নিবেদনযোগ্য কিনা এ নিয়ে সংশয় অনুভব করেছি। পরিসংখ্যানের উপর তাঁদের দৃষ্টি নিবন্ধ তাঁদের সামনে আমাদের নিষ্ক্রিয়তার হেতু ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অপ্রতিভ হতে হবে, কেননা এ ধরনের প্রয়াসে তাঁরা শুধু কোঁতুক অনুভব করবেন। তবু কয়েকটি কথা না বললেই নয়।

'অজ্ঞেয়বাদ' বিষয়ে শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘস্থগিত আলোচনা এবার অবশেষে আরম্ভ হয়ে বিবিধ কারণে উপক্রমণিকা পর্যায়েই পরিত্যক্ত হয়েছে—পরবর্তী অধিবেশনে 'বাস্তববাদের অননুভবিত ভিত্তি' বিচার করবার প্রস্তাবও নির্বাচিত প্রবন্ধকার শ্রীপ্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায় পূর্বাক্বে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অথচ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোন প্রবন্ধ বা আলোচনার ভার গ্রহণ করতে কেউ ইচ্ছুক নন।

পরিমাণবিচারে এতে পরিষদের কার্যাবলীর অপকর্ষ ত সূচিত হয়ই, উপরন্তু আগ্রহাতাবের অপবাদও সম্ভব পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেন না। প্রধান দর্শনাধ্যাপক মহাশয় এবার পরিষদ-গ্রন্থাগারের জন্ত সমস্ত সমস্ত গ্রন্থ নির্বাচন করে দিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে নিতান্ত কয়েকখানা পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর কিছুতে কেউ আকৃষ্ট হলেন না, এর ইঙ্গিতও অশুভ।

তথাপি পরিষদের অল্পতম সভা হয়ে যা অনুভব করেছি, এ প্রসঙ্গে তাঁর অনুলেখে কর্তব্যাহানি ঘটবে। তত্ত্বাভিলাষীর প্রাথমিক সাধনা অবিচারিত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করবার। বহিঃসংবিচারে তাঁর মৌন নিষ্ক্রিয় হলেও সমানমর্গা উপলব্ধি করেন তার শ্রেষ্ঠরূপ। জিজ্ঞাসুর নীরবতা তাঁর পক্ষে শুধু সহনীয় নয়, প্রত্যাশিতও। তা ছাড়া পরিষদের সম্মেলনে বিশেষ আকর্ষণ যে নীরবতা যুক্তিবিচার, তা যদি গভী অতিক্রম করে বিদ্যায়তনের নিয়মিত অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় প্রসারিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে নির্বিশেষ পরিষৎ-সম্মেলনের প্রতি বিশেষ অনুরাগের নূনতাপ্রাপ্তি হুঁসুধ নয়।

উপসংহারে পরবর্তী পরিষৎ-সম্পাদক এবং বর্তমান ও ভাবী সভ্যবৃন্দের অভ্যুদয় প্রার্থনা করি। সতীর্থবর্গের আন্তরিক শ্রীতি ও শুভাকাঙ্ক্ষা আমাদের সকলকে নিত্য শ্রেয়ঃপথে উদ্বুদ্ধ করুক।

শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদক

গণিত সেমিনার :

গত কয়েকবছর ধরে গণিতসেমিনার ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই উন্নতির মূলে আছে আমাদের ছাত্রবন্ধুদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও অধ্যাপকমণ্ডলীর সহায়তা।

গণিতসেমিনার আমাদের হাতে আনার পর কাজ বা হয়েছে তাতে গর্কিত নই, তবে ভবিষ্যতের দিক নজর রাখলে নিরাশ হবারও কিছু নেই।

আমাদের প্রথম অধিবেশন—চিরপরিচিত প্রধান অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস ভড় মহাশয়ের বিদায়সম্ভাষণ ছিল খুব মর্মস্পর্শী। অধ্যক্ষ জ্যোতিষচন্দ্র সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে ফিজিক্স লেকচারথিয়েটারে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় অধ্যক্ষ, ডক্টর সনৎকুমার বহু ও বিদ্যায়ী অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস ভড় ভাষণ দেন। ছাত্রদের পক্ষ থেকে শ্রীআশিসকুমার সাখাল মানপত্র পাঠ করেন ও সভাশেষে বিদ্যায়ী অধ্যাপককে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি পুস্তক শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ দেওয়া হয়। অধ্যাপকমণ্ডলী, বিদ্যায়ী ও নবাগত সেমিনারের সভ্যদের ও অত্যন্ত বিতাপের ছাত্রদের একত্র সমাবেশে আন্তরিকতাময় এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যা উপস্থিত সকলেরই মনে গভীর রেখাপাত করে। অধ্যাপক ভড়ের অভাব যে অপূরণীয় তা আমরা আজ অনুভব করছি অন্তরে অন্তরে।

পূজাবকাশের আগে অধ্যাপক শ্রীকামিনীকুমার দে জ্যোতির্বিজ্ঞানের “Nebulae and the Vastness of the Universe” সম্বন্ধে বাংলায় এক হৃদয় বক্তৃতা দেন। শ্রীহইন্ডের সাহায্যে বিষয়টিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়।

সেমিনার লাইব্রেরীতে পুস্তকসংখ্যা কিছু বেড়েছে, তাছাড়া অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস ভড় তাঁর পুস্তকগুলি আমাদের ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

কিছুদিন হ'ল ডক্টর নন্দলাল ঘোষ এসেছেন আমাদের বিভাগে স্বরেশ্রনাথকলেজ থেকে। আমরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তার নির্দেশে ডক্টর দেবেন্দ্রনাথ মিত্র খড়্গপুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে স্থানান্তরিত হয়েছেন। যদিও আমরা তাঁর অভাব বেশ উপলব্ধি করছি তবুও তাঁর উন্নতির জন্তে আমরা আনন্দিত।

ছাত্রছাত্রীদের তরফ হ'তে সহযোগিতা ও সাহচর্য এবং শ্রদ্ধাপদ অধ্যাপকমণ্ডলীর অনুপ্রেরণা আমাদের স্মরণীয়।

শ্রীহেমন্তকুমার বহু—সম্পাদক

শারীরবৃত্ত পরিষদ :

বয়সের দিক দিয়ে দেখলে আমাদের পরিষদ এখনো শিশু—মাত্র তিন বৎসর আগে এর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেরকম দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে এর কর্মচাঞ্চল্য, তাতে পরিষদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করাটা হুরাশা হবেনা।

গত ডিসেম্বরমাস (১৯৫১) থেকে আজ পর্যন্ত পরিষদের উত্তোগে নিম্নলিখিত বক্তৃতা এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা হয়েছে সাপ্তাহিক আলোচনা-সভাতে।

Symposium on “Mammary gland”

অংশগ্রহণ করেছিলেন—শ্রীহৃদীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীরণজিৎ দাশ, শ্রীদেবজ্যোতি দাস, শ্রীবিধান রঞ্জন দাশগুপ্ত

২। “Yeast as food.” বক্তা—ডাঃ ডি. কে. রায়

৩। “Muscle.” বক্তা—ডাঃ এন. কে. সরকার

৪। Symposium on “Adrenal Cortex”

অংশগ্রহণ করেছিলেন—শ্রীশঙ্কর চাঁদ দে, শ্রীস্বখময় লাহিড়ী, শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, শ্রীমুকুল বিকাশ দাশ

৫। “What a diabetic should eat.” বক্তা—অধ্যাপক শ্রীসচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। Symposium on “Life”

অংশগ্রহণ করেছিলেন—শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবজ্যোতি দাস এবং শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী

৭। “My experience about American Universities”

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীসচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮। “Prolongation of Life.” বক্তা—শ্রীপুলক কুমার ঘোষ

৯। Symposium on “Our excursion.” অংশগ্রহণ করেছিলেন—শ্রীঅমিয় দত্ত, শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

শ্রীরাজর্ষি মজুমদার, শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, শ্রীকমলশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্কর চাঁদ দে

১০। “Human brain—its supremacy.” বক্তা—ডাঃ অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

১১। “Isotopes in the study of Physiology.” বক্তা—ডাঃ দুলাল পদ সাধু

চলচ্চিত্র প্রদর্শনীও হয়েছে U. S. I. S. এবং B. I. S.-এর সহযোগিতায়।

১। B. I. S.-এর সহযোগিতায়—Blood transfusion ; Conquest of a germ ; Wonder Jet ; Achievements in the air.

২। U. S. I. S.-এর সহযোগিতায়—In the beginning ; Green mountainland.

৩। B. I. S.-এর সহযোগিতায়—Development of rabbit ; History of writing.

চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিদায় সম্বর্ধনা জানান হয় পরিষদের একটি সভায়। অত্র একটি সভায় ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের বিদায়সম্বর্ধনা জানান হয়। নতুন তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ‘স্বাগত’ জানান হয় একটি সভায়। এই তিনটি সভাতেই টি পার্টি এবং প্রমোদানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল।

একটি বিতর্ক-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে পরিষদের উদ্যোগে। বিতর্কের বিষয় ছিল “In the opinion of the house, vegetarian diet is nutritionally preferable to non-vegetarian diet.” প্রস্তাবের পক্ষে বলেছিলেন ডাঃ অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীস্বখময় লাহিড়ী, শ্রীদ্ব্যতীশ দাশগুপ্ত, এবং শ্রীঅমিত রঞ্জন গুহরায় ; এবং প্রস্তাবটির বিপক্ষে বলেছিলেন শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবেশ্বর সিং, শ্রীরণজিৎ দাশ এবং শ্রীরবিপ্রসাদ দাশ। প্রচুর উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয় বিতর্ক-সভাটি।

নববর্ষ এবং বিজয়া-সম্মিলনী উপলক্ষে দুটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয় পরিষদের উদ্যোগে।

এই তো গেল বক্তৃতা এবং সাপ্তাহিক আলোচনার দিক। পরিষদের কার্যাবলীর আরও অনেক দিক আছে। পরিষদের একটি মেয়াল-পত্রিকা আছে, তার নাম “প্রাচীরিকা”। পরিষদের সদস্যদের লেখা গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা এবং স্কেচ এতে বার হয়।

গত আংষ্ট মাসে পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে যে কার্যনির্বাহকসমিতি গঠিত হয়েছে, আগামী আংষ্ট মাস পর্যন্ত এই সমিতি পরিষদের সমস্ত কার্য পরিচালনা করিবেন। কার্যনির্বাহক সমিতিতে আছেন :—অধ্যাপক শ্রীসচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি), শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় (সহ-সভাপতি), শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ), শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী (সম্পাদক), শ্রীবেত্তনাথ দে (সহ-সম্পাদক),

ত্রিভূতীশ দাশগুপ্ত (ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর প্রতিনিধি), শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন (পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর প্রতিনিধি), শ্রীশঙ্কর চাঁদ দে (চতুর্থ বর্ষ সম্মান শ্রেণীর প্রতিনিধি) এবং শ্রীঅমিয় দত্ত (তৃতীয় বর্ষ সম্মান শ্রেণীর প্রতিনিধি)।

এবারে আসা যাক ভ্রমণের কথায়। প্রতি বৎসর পুজোর ছুটিতে আমাদের একটি শিক্ষা-ভ্রমণ (educational excursion) হয়। এবারকার ভ্রমণে আমাদের পাঁচ জনকে দুই দিনের। অজন্তা-ইলোরা-পুণা-বাম্ব-আগ্রা-দিল্লী হয়ে কলিকাতা—এই প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইল ভ্রমণ আমরা সাজ করেছি পনের দিনে। পুণায় দেখে এসেছি National Chemical Laboratory এবং Poona Medical College. বম্বয়ে দেখেছি Haffkins Institute এবং Teddington Chemical Factory.

এবারকার বার্ষিক সম্মিলনী আসন্ন। আগামী ২০শে এবং ২১শে ডিসেম্বর হবে এই অনুষ্ঠান*। তারই আয়োজনে ব্যস্ত সকলে। এই সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করবেন পাটনা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ বাহুদেব নারায়ণ এবং প্রধান অতিথি হবেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীশঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানটী সুন্দর করে তোলার জন্ত সকল সদস্যের সক্রিয় সহযোগিতা পাচ্ছে পরিষদ এবং পরিষদের প্রত্যেকটি কাজে এই সহযোগিতার ভাব বজায় আছে বলেই পরিষদের উন্নতি হচ্ছে এত দ্রুত, কর্মের পরিধি হচ্ছে ক্ষীণতর আর সবশেষে কলেজ-ম্যাগাজিনে পরিষদের রিপোর্ট হচ্ছে দীর্ঘতর।

প্ৰকাশন চক্রবর্তী—সম্পাদক

[* এই বিবরণী গত ডিসেম্বর মাসে প্রাপ্ত হয়। স. প্র. ক. প।]

আয় ব্যয় :

১৯৫১-৫২ সালের কলেজ ইউনিয়নের বাজেট ১১ই জানুয়ারী পরিষদের সভায় উপস্থিত করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন সিনিয়রট্রেজারার অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস ভট্ট। বিস্তৃত আলোচনার পর বাজেটটি পরিষদ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৯৫১-৫২ সালের ইউনিয়ন বাজেটটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আয় :

কলেজের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীই বার্ষিক ১১ টাকা সেসন্ ফি বাবদ দিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে ৪।০ টাকা এথলেটিক ফণ্ড-এর জন্ত, ৩ টাকা কলেজপত্রিকার জন্ত এবং বাকি ৩।০ টাকা ইউনিয়নের জন্ত নির্দিষ্ট থাকে। ইহা হইতে এবারকার মোট আয় ৪১১২ (চারি হাজার একশত বার টাকা)।

ব্যয় :

কলেজের বিভিন্ন বিভাগগুলিতে নিম্নলিখিতভাবে অর্থবণ্টন করা হইয়াছে :

| | |
|-----------------------|-------|
| নাট্য পরিষদ— | ৯০০ |
| বিজ্ঞান-গীটিকা— | ৭৫০ |
| সমাজ সেবা— | ৩৫০ |
| রবীন্দ্র পরিষদ— | ৭৫০ |
| বিতর্ক বিভাগ— | ৩৫০ |
| প্রকাশনী বিভাগ— | ১২ |
| (প্রাচীর পত্রের জন্ত) | |
| সাধারণ সম্পাদক— | ১,০০০ |

মোট— ৪১১২ (চারি হাজার একশত বার টাকা মাত্র)

আমাদের কথা

সাধারণ সম্পাদকের ফণ্ড হইতে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত ব্যয় ধার্য হইয়াছিল :—

| | |
|----------------------------------|-------|
| প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান— | ৫৫০ |
| শান্তি সপ্তাহ „ „ — | ১৫০ |
| নানাবিধ — | ৩০০ |
| (ছবি তোলা, সম্বর্ধনা ইত্যাদি) | |
| মোট— | ১,০০০ |

প্রতিষ্ঠাদিবস ও শান্তিদিবসের আয়-ব্যয়ের বিস্তৃত হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

প্রতিষ্ঠাদিবস :

| আয় | ব্যয় | |
|---|--------------------|-----|
| রবীন্দ্র পরিষদ হইতে— | ৫০ | |
| বিতর্ক বিভাগ „ — | ৫০ | |
| সাধারণ সম্পাদক — | ৫৫০ | |
| ছায়াছবি প্রদর্শন উপলক্ষে টিকিট বিক্রয় „ — | ১০০ | |
| মোট— | ৭৫০ | |
| | ছায়াছবি প্রদর্শন— | ২৫০ |
| | বিচিত্রানুষ্ঠান — | ৩৫০ |
| | পতাকা উত্তোলন | |
| | উপলক্ষে — | ৩০ |
| | বিতর্ক অনুষ্ঠান — | ৫০ |
| | ছাপাখানা — | ৪০ |
| | নানাবিধ — | ৩০ |
| | মোট— | ৭৫০ |

শান্তি সপ্তাহ :—

| আয় | ব্যয় | |
|------------------|--------------------|-----|
| সমাজ সেবা হইতে— | ৫০ | |
| নাট্যপরিষদ „ — | ৫০ | |
| রবীন্দ্র „ „ — | ৫০ | |
| বিতর্ক বিভাগ „ — | ৫০ | |
| সাধারণ সম্পাদক — | ১৫০ | |
| মোট— | ৩৫০ | |
| | বিতর্ক অনুষ্ঠান — | ৫০ |
| | (Symposium) | |
| | ছায়াছবি প্রদর্শন— | ৮০ |
| | বিচিত্রানুষ্ঠান — | ২০০ |
| | প্রদর্শনী — | ২০ |
| | মোট— | ৩৫০ |

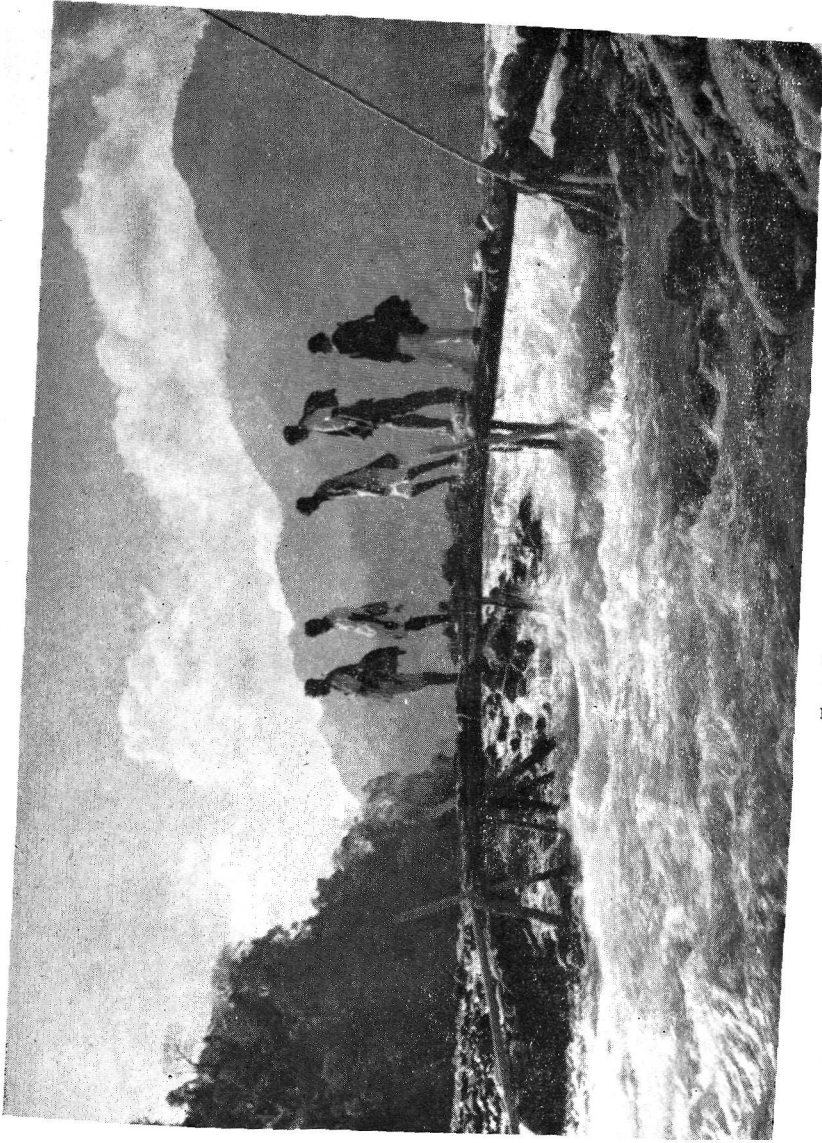
পরিশেষে আমি কাউন্সিলের সিনিয়র ট্রেজারার শ্রীসন্তোষ রায়, কোবাধ্যক্ষ এবং অস্থায়ী বিভাগের সম্পাদকগণকে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

শ্রীসঞ্জীবকুমার বিশ্বাস—জুনিয়র ট্রেজারার,
প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাত্রপরিষদ

শুদ্ধিপত্র

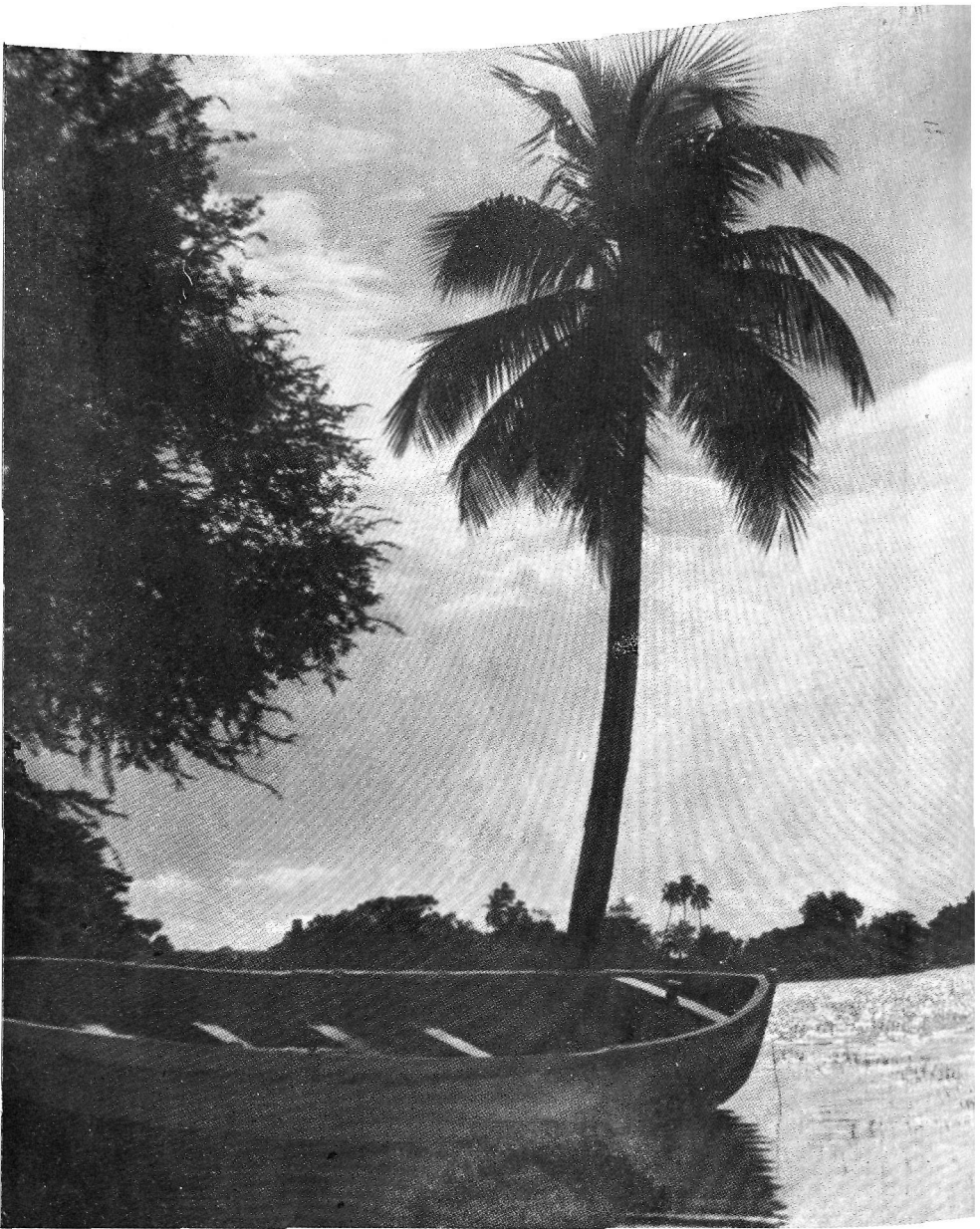
| | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|-------------------|----------------|-----------------|
| পৃঃ ১ ; পংক্তি ১১ | ... ও ও | ... ও |
| ” ২ ; ” ২৮ | ... বাঙ্গনীয় | ... বাঙ্গনীয় |
| ” ১৬ ; ” ১৩ | ... পাশ্চাত্ত | ... পাশ্চাত্ত্য |
| ” ৭০ ; ” ২৬ | ... চন্দ্র | ... চন্দ্র |
| ” ৭৩ ; ” ৩০ | ... প্রথমার্ধে | ... প্রথমার্ধে |
| ” ৭৮ ; ” ৩৫ | ... টেনিকয়ে | ... টেনিকয়েট |
| ” ৮০ ; ” ২৪ | ... জয়েগা | ... জায়গা |





THE CALL OF THE WILD.

[Photo. : Prof. N. R. Kar,
Dept. of Geography.]



A QUIET COVE.

[Photo. : Krishna Chaudhuri,
Sixth Year English.]

THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

EDITORIAL

University Education

THE universities have lately come in for a good deal of criticism. The season just past of convocations and conferences, with its usual crop of annual educational reflections, would provide enough of a text for an editorial sermon. When we think, however, that our own University, the oldest in the country, will observe its centenary in a few years, thoughts about university education come to acquire a more than seasonal interest for us.

Not that recent criticism lacked a motive deeper than what occasional surveys can be expected to rest upon: it is noteworthy that the most eminent leaders of the nation, frankly expressing their scepticism about the products of our universities, have shown their anxiety for what they love to call a complete re-orientation of the educational system under the changed conditions following independence. The general complaint against the universities today is that they have been "reduced to factories capable of producing only office employees for whom there are not enough jobs."¹ The social and economic implications of the situation have been considered in the context of political independence. But the educational history of a century shows the University in its own struggle for independence, which may be summed up in terms of an aspiration to free itself from the degrading function of an examining body and realise the higher aims of teaching. But the steady expansion of numbers beyond effective teaching power and the consequent deterioration of standards show that the University, still considered to be the purveyor of degrees which, being the sole guarantee of employment, tempt a huge number to oppress the fields of pure learning, has failed to gain the independent status of a teaching body pursuing its own ends. The recent University Act, with its provisions for

¹ So runs the burden of Dr. Rajendra Prasad's address to the last Convocation of the Calcutta University. It has equally unflattering echoes in the strictures of Mr. Nehru and Dr. Radhakrishnan.

distribution of the faculties among constituent colleges, would seem to be the outcome of such a frustration.

Contemplating the strenuous movement of university education down the years, one notes with regret the sad state of neglect in which humanistic, especially literary, studies have fallen. In the growth of the idea of the University in this country and its evolution into practice one can trace the succession of two distinct ideals. The spirit of the older, nobler ideal of liberal education was enshrined largely in the passionate pursuit of literary studies. In course of time the emphasis has shifted on to scientific studies and technical training and the later history of the growth of universities shows the dominance of utilitarian considerations. We in Presidency College cherish the inherited task of "imparting the knowledge of English language and literature" which was the aim with which Hindu College was born. As we think of our University, we recall with pride that the higher study of the mother-tongue was started here on the initiative of one of the greatest of university reformers. For us the old quarrel between literature and science resolves into the ultimate simplicity of the feeling that this thing, literature, is so old, so much older than science. And yet the pity is that its proper study has not yet begun in our universities. Its neglect presents itself in everyday experience in the shape of heterogeneous, overcrowded classes. It is worth noting that admission is restricted in the Science departments of the University. In the Arts classes it is not merely that the majority of students admitted lack an honours degree but, further, there is a discrepancy of standards even among those who have it, owing to different standards of honours teaching in different colleges which, in the case of Arts, are generally low. All this calls for not merely a rigorous principle of selection but also a structural reorganisation of the educational system.

Suggestions have been made to the effect that earlier, self-sufficient courses must be devised for those many who cannot be expected to profit by university education and should learn their proper business instead of wasting invaluable years trying on the gown that simply would not sit on them. The Secondary Education Commission now touring the country is expected to make valuable recommendations towards effective planning for vocational training. Such a bifurcation, whatever be the evils of specialisation at an early stage, would serve to eliminate the present architectural confusion in the design of the general educational scheme. It would imply the need for closer integration between the different stages of higher learning which is dissociated from immediate utility and necessarily restricted to the few who are likely to profit by it. There are immense gulfs separating the post-graduate course from the honours and, still more mysteriously, the honours course from the intermediate. With a vague sense of uplift we have tacitly accepted these artificial marks of distinction as natural barriers, legitimate gradations. We must now give

up this negative way of determining the successive stages of intellectual maturity. If we want to establish the integrity of university education, the Honours teaching should make for a more effective approximation to the standards required for post-graduate study and should be confined to one or two selected colleges. And we must not stop there. We must also be prepared, logically, to think of what may be called, somewhat paradoxically, an Intermediate Honours course specially devised for those who mean to go up for the real honours study and, of course, have the capacity to do so.

It will not do to flinch at the austere vision of lean classes. If there is a real recognition of the evils of unrestricted admission, its logical conclusion, however relentless, must be faced. The dark fate of the great mass of students who face yearly failures or, even if they can scrape a pass, swell the ranks of the unemployed or unemployable educated, is enough to show the wastefulness, from the national point of view, of unrestricted admission to the universities. National interest also demands that those few who have the ability to profit by university education are not submerged in a mass of those who have not. As talented students in our country mostly come from small-income groups, a generous and diversified scholarship system is also an urgent necessity. Nothing could be more sickening than the sight of large numbers of the idle rich lounging in the fields of higher education.

In our country there is a strange etymological confusion in the perverse craze for universal university education. But 'university' has nothing to do with universality ; it simply means a *society* (*universitas*), a corporate body which obviously possesses such unity of aim and homogeneity as we have been speaking of. Here in this society students must be regarded as ends in themselves and not as means. At the university stage the pattern of education should have no direct aim, but must be content with bringing out the intrinsic excellence of the student by offering him ample opportunities of coming under stimulating intellectual influences. The curriculum, also, must not be allowed to petrify itself from any external, purposive direction, but must grow continually from within, as it were, through an almost musical correspondence between the learner's mind and the subtle personal influences around, through the constant variations, modulations and readjustments which will make up the proper internal conditions favouring the growth of individual talent.

It is strange that though there has been much talk, in recent pronouncements, about the need for intimate, personal relationship between the teacher and his pupil, accompanied by the familiar lament over modern departure from ancient Indian practice in this respect, they show, generally, a very imperfect awareness of the approach towards students as ends in themselves which forms the vital element of such

a relationship. On the contrary, the linking of ends to means as being likely to produce a tonic effect throughout the educational system has been mentioned (in the context of the problem of the unemployed educated) at several Convocations in such terms as to encourage public opinion to hold that university education must lead on to satisfying employment and that no university reform will be effective unless more attention is paid to 'the later stage of earning a livelihood'. The theory of adaptation to economic change behind such statements—to which some even like to give a historical colour by describing it as a constant in educational history—reflects the same attitude towards education as existed in the British days when grammar schools were started with the purpose of supplying office staff to serve the new economy. The dominant stress on vocational and technical training that this old colonial attitude under a new national garb implies, may, at best, claim national prosperity as its supreme purpose. But will that serve as a philosophical basis of education?

The problem of university education, as we have sought to look at it, is essentially artistic—the rendering of a homogeneous whole. There is a widespread notion that it is moral. Some of the recent Convocation addresses are marked by familiar pious statements about the moral purpose of education. One of the great defects of traditional morality, as Bertrand Russell says somewhere, is the low estimate it places upon intelligence. It neglects, nay, usurps the importance of what Russell calls intellectual virtues. Its solemn profundities are quite inapplicable to the university stage when the sole stress should be upon intellectual development. The building up of character should be mainly a matter for earlier years. Given the right early training and proper environments, a student is expected to have habits and desires which will lead in the right direction. Such further virtues as are required ought to result naturally from purely intellectual training. The fundamental basis of character, in the shape of certain habits spontaneously induced, should be laid at an early age, further development being produced naturally by intellectual progress.

The psychological necessity of a gradual and consistent transition from boyhood to youth and its corresponding implications for the educational system are not sufficiently realised. The intellectual and imaginative faculties, which are the essential elements of creative education, are not allowed to develop through constant exercise from the pupil's boyhood. When he enters the university, enormous demands are made on his creative power which has been imperfectly developed through neglect of the intellectual and imaginative faculties which can never be had for the asking, but have to be worked up in unison to the requisite degree of fertilisation. All along the educational ladder we trust to memory as the sole guide. But memory alone cannot create. The result is that we go on heaping up materials but we never build anything. The evil at the root of this

confusion of purpose is, of course, the prohibitive presence of a foreign medium of instruction the naturally imperfect knowledge of which would inhibit the free play of imagination and intellect, throwing the young learner on the mechanical resources of his memory. To induce in him a natural desire to exercise his intellect and venture on imaginative thinking it is necessary to make the material (of knowledge) available to him in his mother-tongue. Without such an intimate and effective mode of expression to work with, the student will never attain intellectual independence. The lack of this proper symbol of spiritual independence has its effects on the moral behaviour of our youths which has caused much concern lately. We have already indicated the abrupt transition from boyhood to youth. Arriving at the critical stage of youth one suddenly finds greater freedom in social conduct. But unless it is accompanied by a gift of the more real independence of the intellect ensuring a moral control over conduct, this liberty becomes licence, and in the conduct of the accused youth we find that essential exaggeration and immoderateness that belongs to adolescence which, never really sure of itself, ends in asserting itself in a violent fashion. When we shall be able to solve the problem of enriching the expressive capacity of our own languages, national life will be so much fuller that moral aberrations will have no reason to appear. If an Indian university is accused of neglecting the morals of its *alumni*, its best answer would be to evolve the organic remedy that resides in the collective spiritual heritage of its classical literature, English literature and its native literature, from an integrated study of which in concrete terms of practice will emerge a significant medium of culture containing the guarantee of our intellectual autonomy.

We have now arrived at the familiar problem of developing a vernacular medium of instruction capable of communicating the spirit of a culture at present imprisoned in a foreign medium. The independent choice of our own tongue is likely to appear so much of a privilege that we may not be sufficiently conscious of the obligations it implies. We are familiar, in discussions of this problem, with suggestions for translation of standard texts and finding equivalents for foreign terminology, as if it were a matter of vocabulary alone. It should be clear, however, that the problem is not as mechanical as that, but one of evolving an artistically organised mode of expression, of inventing a style, in short. And this is where the select society at the university comes to transform itself from a sort of masonic brotherhood, existing in isolation from social reality, into the very springs which will overflow into the vast, barren country outside, quenching its thirst for an expressive medium. In impressive contrast to the majority of students haunted by thoughts about 'the later stage of earning a livelihood', there is something fascinating about the vision of the young university student, anxious to earn his title to an independent utterance of his spirit, in his silent progression towards a vivid symbol of his spiritual

enlightenment, his pilgrimage towards a style. In the personal struggle of every university student to achieve an individual style will lie the ideal pattern of the speech we are to devise for the nation, if we are to educate it. What is wanted to-day from every university is an individual movement for a literary revival the aim of which will be to enrich the possibilities of every regional language to attain its autonomy as a self-sufficient vehicle of culture. This may seem heretical in the face of the commonly accepted view of cultivating only one of the languages as the medium of instruction for the whole country in order to secure national unity. But the deeper unity of the spirit will be secured, if the artistic possibilities of every important regional language of our country are developed with our literary heritage of English and Sanskrit as the common cultural basis. Europe once recognised Latin as the only language in the higher spheres of life. But when, after the Renaissance, the cultivation of Latin gave way to the independent growth of the modern European languages, this linguistic individuation made for greater integration of the European culture as a whole, instead of disintegrating it. Our Indian culture would, similarly, achieve a greater degree of synthesis with the individual development of all the modern Indian languages which will mean, in terms of this vast sub-continent, a new Renaissance. And for such a Renaissance the sources of inspiration exist in the shape of our collective literary heritage, ancient and modern, English and Sanskrit. But we have yet to discover a proper approach to these springs of inspiration.

Our political independence, which has perversely imposed a constitutional directive for shortening the life of English education in the country, has, however, unconsciously emancipated English from a degrading material status. Our approach to this rich store of creative thought has always been vitiated by its humiliating association with an economic advantage of the knowledge of the language. But now it is possible to imagine that it will not be necessary for an Indian to learn the language in order to secure employment. English is now, so obviously, a spiritual possession sufficiently removed from the utilitarian context to assume its legitimate status as an Art. The larger passage to a new world of ideas that English opened out to those Indians who were able to perceive in it a medium of spiritual enlightenment instead of an economic panacea, ultimately led to the gates of independence. And now India's freedom has, in its turn, set English free! The way now lies open to us to make an artistic use of the language and its literature towards the ends adumbrated in the foregoing paragraph.

What about Sanskrit? It is time its place in university education was boldly defined. We congratulate the Chancellor of the Nagpur University on having attempted such a bold definition in his address delivered in Sanskrit to the last convocation of that university. It is a pity that even after the attainment of independence our universities are slow to grasp the

cultural opportunities offered by Sanskrit. If there is any subject that could serve universities in free India today as the focal point of a school of studies corresponding in status to the Greats at Oxford, that is Sanskrit. If the Greek and Latin classics can provide Oxford with its leading honours school, there is no reason why Sanskrit should not similarly serve Indian universities. In the subjects we have borrowed from the West Indian universities can never possibly hope to rival their western counterparts, but in Sanskrit and Sanskritic studies they can absolutely hold their own and do some really first-hand research work. By an appropriate elevation of standards they could, if they would, make their M.A. degree in Sanskrit a stamp of very real distinction (which, most unfortunately, it is now far from being).

One notes with regret that there is a greater awareness of the importance of Sanskrit in other States than in our own, which was once a great centre of Sanskrit learning. The recent establishment by the Bihar Government of the Mithila Institute of Sanskrit at Darbhanga and also the Nalanda Institute of Pali on the outskirts of the ruins of the famous ancient university shows a commendable desire to revive Sanskritic learning. The recommendation, made at a recent conference of the Vice-Chancellors of the U. P. universities, of a compulsory course of Sanskrit for B.A. and M.A. students taking Hindi as one of their main subjects, is a recognition of the importance of the study of Sanskrit as enriching the study of languages derived from it. This elementary need is ignored, however, in this University where honours students in Bengali are not allowed to take Sanskrit as a pass subject. Many of them, however, are expected to get through a rather severe test in elementary knowledge of Sanskrit in order to qualify for the M.A. degree.

We have lately been told that the West Bengal Government has a Sanskrit University in contemplation. It is difficult to feel sincerely optimistic about such a notion materialising. Apart from practical difficulties, the desirability of setting up such an isolated unit may also be questioned: it reflects the deplorable tendency of disintegration visible in the new University Act. Moreover, it is a dangerous concession to the traditional snobbery which would confine classical learning to a group of mere scholars. It is time we realised that the study of a culture, however complex, must justify itself by its larger effects on the general cultural enlightenment of society. We should think of Sanskrit as co-existing with its modern descendants in an integrated scheme of a literary revival. Long accustomed to "the daily teaching of dead languages by orthodox, athletic grammarians which little avails to arouse the imagination or trouble the intellect with questionings or doubts", we are dead to the creative aspect of classical studies and are slow to realise that the old masters are the "spiritual begetters of practice." It may not be out of place here to quote the following passage from the late Sir Walter Raleigh's introduction

to Sir Thomas Hoby's translation of Castiglione's *The Courtier*, deploring the modern system of classical education in England :

The great pagan civilisations march their eternal round, like weary ghosts, through the schoolroom; at the stroke of the clock they vanish, and the activities of real life are resumed. By the time that the child reaches manhood, he is so inured to these habitual intruders that he regards them as honourable appanages to an English homestead; hardly does the thought occur to him that these too, like other restless spirits, have a message to deliver and are burning to speak.

When will it occur to us that the ancient culture enshrined in Sanskrit has a message to deliver and is burning to speak?

A passing reference may be made in connexion with all this to the view expressed in recent years in some very high quarters that our universities should reduce their financial commitments by getting rid of subjects like Sanskrit or Pali, Arabic or Persian—subjects which are not 'popular' and which therefore do not pay their way. It is greatly to be deplored that market considerations such as this should be imported into discussions about university planning. 'Paying one's way' is a hopeless criterion to apply to university management. Apply that criterion and there would hardly be a subject left for a university to profess. In fact, this is exactly where the State comes in. It is one of the primary obligations of a modern State to rescue its universities from abject dependence on fee-income and to make it possible for them to pursue their own cultural programmes untroubled by financial worries. Need we stress that the money spent on a university pays itself back a hundredfold in invisible returns of tremendous value for the life of a nation? The ideal of university economy ought to be that a department should be run with its full complement of staff and all equipment that might be necessary even if there was only one student on its rolls. If the State cannot live up to this strenuous ideal, it had better give up its pretence of fostering university education, wash its hands of the entire business and openly confess its failure to discharge a basic responsibility.

The Concept of Ecstasy Reviewed in the Light of Sanskrit Poetics

JOGESHCHANDRA BHATTACHARYA, M.A.,

Lecturer in English, Darjeeling Government College.¹

THE word 'ecstasy' in modern English usage generally means 'rapture' or 'an exalted state of feeling'. This, however, is only a secondary sense of the word. 'Ecstasy' in Greek literally means 'standing out', *i.e.*, going out of oneself. Going out of oneself and becoming another is Ecstasy in Art. In European criticism the concept of Ecstasy is to be found first in Aristotle. To quote from his *Poetics*, Chapter 17 (Ingram Bywater's translation): "Hence it is that poetry demands a man with special gift for it, or else one with a touch of madness in him; the former can easily assume the required mood, and the latter may be actually *beside himself with emotion*" (*i.e.*, 'ecstatic', if translated literally).

What Aristotle means to say may be best expressed in the words of Matthew Arnold (in *the Strayed Reveller*), that the doom of the poets is "to become what we sing". The poet, in other words, has to become one with his creation, be it the creation of a character, or a mood or an atmosphere. It is indeed a sort of martyrdom, a supreme self-immolation on the part of the creator. The poet may have to create a character entirely unlike his own. There, in fact, lies the test for him; and it is precisely there that the poetic life scores over the non-poetic one. We can, in the non-poetic life, lead at best a kind of partial and fragmentary existence. The poet, on the other hand, must have the capacity to become all things at a time. Perhaps the greatest example of this is "myriad-minded Shakespeare". He is at home with Iago as perfectly as with Desdemona, with Hamlet as with Claudius, with Antonio as with Shylock—men and women who lie at the opposite poles of human character. In fact, it is this plasticity, this protean quality of his genius, that is the greatest marvel about Shakespeare.

Coming to English criticism, we find a fine exposition of the concept of Ecstasy in the letters of Keats. When Keats, in his famous letter to Woodhouse (October 27, 1818), wrote that the poetical character has no self, he meant that the poet steps out of his fixed and circumscribed self and becomes another. For a perfect description of the poetical character, we should go to his letter to George and Thomas Keats (December 22,

¹ *Alumnus* : 1946-48.

1817): "It is everything and nothing", he says, "living at all levels—high and low, mean and elevated. But all kinds come equally and easily to him. . . It has as much delight in conceiving an Iago as an Imogen. Therefore what shocks the virtuous philosopher delights the chameleon poet." And again, "the poet is the most unpoetical of anything in existence, because he has no identity. He is continually in for and filling some other body". Logically, we cannot ascribe to the poet even the poetic character, for he has no unchangeable attributes. Here, however, we should note in passing that the poet becomes that which he creates only for the time being ; he does not mean to fix himself there.

The first two lines of the last stanza of the famous *Ode to a Nightingale* will provide us with a concrete illustration of our point :

Forlorn! the very word is like a bell
To toll me back from thee to my sole self.

In this poem Keats achieved Ecstasy in the deeper sense—a complete merging of his own self in that of the bird. But suddenly with a jerk he is thrown back to the trammelled self of his everyday existence. That 'sole self' is exactly the problem of the non-poetic life: how to liberate ourselves from our fixed, circumscribed identities—how, in other words, to universalise our selves? One of the channels of emancipation is offered by poetry, or for that matter, by all Art, through Ecstasy.

Keats gives us yet another beautiful description of the nature of Ecstasy in a passage in *Endymion*, Book I :

Wherein lies happiness? In that which becks
Our ready minds to fellowship divine,
A fellowship with essence; till we shine,
Full alchemiz'd and free of space. . . .

This "fellowship divine," the becoming one with things, comes through some very absorbing sensuous or aesthetic experience :

that moment have we stept
Into a sort of oneness, and our state
Is like a floating spirit's.

The concept of Ecstasy is also traceable in a famous passage in Shelley's *Defence of Poetry*. To quote only a few lines :

The great secret of morals is love; or a *going out of our own nature*, and an identification of ourselves with the beautiful which exists in thought, action or person, not our own. A man, to be greatly good, must imagine intensely and comprehensively; he must put himself in the place of another and of many others; the pains and pleasures of his species must become his own. The great instrument of moral good is the imagination; and poetry administers to the effect by acting upon the cause.

The great secret of morals is found by Shelley in 'a going out of our own nature'—in other words, in Ecstasy. It is only through Ecstasy that we become moral in the fundamental sense, for mere moral doctrines by themselves are not a sufficient impulse to morality.

The yearning for the universalisation of the isolated individual self did not leave the Indian mind untouched. The way suggested by Indian philosophy was the complete merging of individual existence in the Absolute. This is the supreme instance of Ecstasy, a going out of our finite selves and becoming one with the Infinite (ब्रह्मास्वाद). Indian Poetics pointed to an analogous process in the experience of poetry. Thus :

सत्त्वोद्देकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः ।

वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ॥

(*Sahityadarpana* by Viśvanātha : Chap. III).

Just as in the experience of the Absolute the difference between the knower and the known vanishes, so in poetic creation. The reader or the auditor, too, undergoes a similar process. How is it possible for us, asks the author of the *Sahityadarpana*, to feel pleasure or pain with Ramachandra or Sita while reading the Ramayana, when their delight or sorrow does not concern us in any way? How do, in other words, the feelings of a particular man or woman become universal? To quote a few lines from the *Sahityadarpana*, Chapter III :

ननु कथं रामादिरत्याद्युद्बोधकारणैः सीतादिभिः

सामाजिकरत्याद्युद्बोध इति, उच्यते—

व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणी कृतिः ।

तत्प्रभावेण यस्यासन् पाथोघ्निलवनादयः ॥

प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥

The objects which arouse emotions have a function of producing a oneness between the writer or the reader and the creation. It is due to this that a right-minded appreciator finds his own self engaged in crossing the ocean like Ramachandra or Hanumana. It is due to this again that an average man can, for the time being, feel himself able to do all sorts of things with the hero. Such experience can, however, continue only for the time being, because, as we have already noted, the poet or the reader does not mean to fix himself in the state of oneness with the creation. Visvanatha, speaking of the appreciator, says that he will have no sense of his own different self so long as he is absorbed in the creation in hand :

परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ।

तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते ॥

Once, however, the experience is over, the reader will regain the consciousness of coming back to his "sole self".

This **साधारणीकरण**, as Sanskrit Poetics calls it, this **तन्मयत्व** (becoming that), is essential for the creation as well as for the enjoyment of Art. Neither the word "absorption" nor the word "Ecstasy" is so apt as the word **साधारणीकरण** or **तन्मयत्व** in describing this process of identification. What was merely touched on by Aristotle, and casually referred to in some of the letters of Keats, found clear and systematic treatment in Sanskrit poetics.

Sinclair's New Epistemology

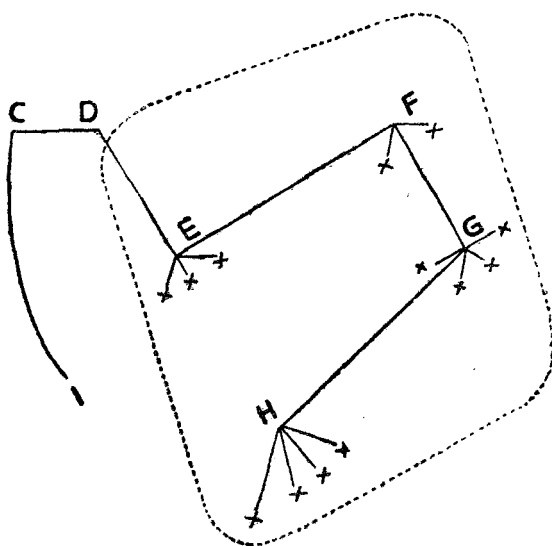
SACHINDRANATH GANGOPADHYAYA—*Sixth Year Philosophy.*

MR. ANGUS SINCLAIR, lecturer in Philosophy at the University of Edinburgh, has lately published an interesting book in which he claims to have discussed problems of the theory of knowledge in a way which opens up a new approach to the field neglected by philosophers for many years. He names the book well: 'The Conditions of Knowing'. All our knowledge is dependent on some conditions of entirely subjective origin, which he calls our 'situations'.

Epistemology has to-day gained a unique and overriding importance in philosophical circles. Mr. Sinclair attempts to show that attitudes play an important part even in our noëtics. So many things depend on a man's attitude. Epistemological attitudes are, in one respect, unique. They are unlike all other attitudes in the range of their relevance. All opinions, particularly in philosophy, are affected by the *attitudes* we hold about the nature of knowledge. And these our attitudes, according to him, form a hierarchy or pyramid of them. They tend to, or actually, build up a system of thought in a man. The particular simple facts are not known without reference to the more general outlook. The true function of a philosopher in a community can therefore be regarded as one of identifying and examining the general attitudes.

The difficulties in epistemological enquiry at present are not due to the subject itself, but are created by not infrequent attempts to bring the particular facts of enquiry under a single epistemological attitude the range of which is wrongly limited. Often, for instance, a point is reached in an enquiry where to have any more effective progress demands a change in the general attitude altogether. But the person, being impervious to that amount of dynamicism, always tries to bring the facts under his own attitude and makes a show of problem.

Mr. Sinclair has given a graphic representation of this puzzle. If we represent any given theory at any given point in time by *D* in the following diagram, we usually find that it continues more or less unchanged until some later point *E*, by which time a crop of fresh data has appeared which it cannot account for. Various alternative modifications are tried, retaining the general attitude intact. But the attempts fall, as indicated in the diagram by \times . We may find a point of modification where the fresh data get explained; but again some fresh data appear, followed by some modifications, and the process is repeated until all attempts are failures.



And then we have to turn our attention to the earlier assumption involved in the general theory. In time somebody lays bare some such assumption at an earlier point *C* and discovers an alternative to it (*I*), which does account for the accumulated data.

The normal epistemological attitudes in Anglo-American culture are, according to Mr. Sinclair, all derivations of some such unconsciously held epistemological attitude or complex of attitudes, which is primitive and misleading, and to it we have to find an alternative.

Thus, attitudes (general) are so important in their rôle that they baffle, if wrongly clenched, all attempts of fruitful enquiry in any field of knowledge. Our theories, our explanations of particular facts all depend on our general attitudes.

To prove his contention Mr. Sinclair takes various basic metaphysical problems *e.g.*, causality, progress, inference, probability, space, time etc.,

and discusses them in this light. He attempts to show that they represent only some particular way of knowing, a group of events selected in our attention to build up a general attitude.

Now, let us see how he tackles the problem of causality. Until near the end of the eighteenth century it was believed that an effect is bound up in or with its cause, and that we can foretell the effect if we can know enough about the cause, but Hume then pointed out that we can not. In some Epicurean and other writings and in some Arabic writings there are scattered remarks which may indicate a recognition that this view is too simple. The seventeenth century occasionalists seem to have first pointed out the fact that the cause cannot, in any way, contain the effect, but the issue was narrowed down to the mind-body problem.

Mr. Sinclair says that there are no causes and effects existing as such or, to put it more clearly, we cannot hold that there is an objective principle of causality. So far he follows his precursor Hume. But the explanation he gives of the problem is somewhat peculiar and rather amusing. He opines that when one speaks of a cause and an effect, *i.e.*, of a pair of events and conditions, and their being so related, they form a situation within which holds what we call a causal relation. This situation exists only because one carries a process of selecting and grouping in one's attention in one's own particular way (a unique blend of empiricism, scepticism and solipsism). Thus, 'striking a match' and 'its lighting' are names for certain selections which I take and group in my attention from the range before me at the given time in the given conditions. Any other man forms the situation by selecting and grouping in his way when he asserts that the striking of the match is really the cause of its lighting up, and that all this pedantry about selecting and grouping is only another example of the notoriously perverse ingenuity of philosophers in obfuscating matters that would have been clear enough, if only left alone; he is, in effect, asserting that all other people follow ways of knowing *i.e.*, selecting and grouping in their attention, which are so similar to his own that nobody notices any difference between these ways and therefore does not notice the ways themselves.

Now the question may arise: why do we believe in such a law? The answer is that we must. If a man did reject that principle and that belief and acted accordingly, he would find that instead of living his normal life he had involved himself in utter confusion. He could not take any action of even the simplest kind because, on the view he had adopted, anything or nothing might be the consequence of it. The same thing happens in a particular case, only the confusion there is not total but local, limited to the field concerned.

Now the nature of this process of selecting in attention is, like others, not an act once done and thereby completed, but is a continuing process which must be sustained if our experience is to continue as it is.

He derives additional support or evidence—at least he thinks so—on this line from the study of mental disorder. Certain types of psychotic breakdown are marked by an incapacity to experience events as causally related in the same way as normal people experience them.

Sinclair clearly says, "These principles are not inevitable. We can hold them or not hold them ; but the penalty for not holding them is confusion in all fields or in many or in any one, or as the case may be." Now it is very strange that he repeatedly points out what the penalty is for not holding such principles, but he remains conspicuously silent about the question : 'why the penalty?'

From the above, it will not perhaps be presumptuous to think that what Mr. Sinclair wants to say, if he says any thing at all, is not quite clear.

Undoubtedly, there are some interesting points in his approach. But he states his view too vaguely and carries his inclinations to a point of absurdity. He never clarifies the exact meaning and connotation of the terms he uses, *e.g.*, 'attitudes', 'selection and grouping in attention', 'way of knowing'. Does he mean by this 'way of knowing' a form of knowing or category, as Kant means? Obviously not, because Kant has stated his philosophy with much more pains than Mr. Sinclair and the latter in that case turns out to be an outdated disciple of the old master.

Attitudes play a part in our knowledge. We select and group in our attention. But that does not in any way mean that there is no objective determination. If Mr. Sinclair claims any novelty in his exposition he becomes illogical (as we shall see afterwards), and if he is to prefer logic his claim to novelty is demolished.

Why do we select in a particular way which is more or less fixed for all, and not otherwise? He will answer that otherwise there will be confusion. But why such confusion? His eloquence is significantly bridled here. The answer is simply that in that case there will be two different worlds which will not square—the world of our ideas and the world of the real objects. The real objects behave in a certain way. And we know these objects only as behaving entities in their entire range. And their behaviour in a particular way determines the corresponding way of our knowing. We have to know the objects as they are and as they behave. And we select events accordingly, and not arbitrarily. Our arbitrary selection will only lead us to a bottomless abyss of nonsense and confusion, where knowledge loses all its significance. Moreover, it is not that we know the objects first and then select them at will, but that events get related in our mind, because they are so related in nature and because we can know the objects and orders of nature directly. If we know the objects, there is no reason why we should not know their behaviours and orders. And even if we try, we cannot know them (*i.e.*, select them in attention) otherwise, unless we are unusually indifferent to the data of

our knowledge. Again, why do I perceive in an after-thought that my selection is wrong? Because, the objective grounds for that way of selection are lacking.

It is not infrequent that we group in our attention real objects quite unfamiliar to the nature outside us and feel betrayed. Selection presupposes an amount of elimination which badly requires a standard more or less fixed for all. We always try to reflect nature, as it is, within us. And this process is carried on by our selecting, grouping and empirical verification. We constantly refer our experience to the outer world. That we cannot select at random proves that these principles of nature are not selections; they are the *given* of our experience. If selection means only knowing particular facts, that is simply on account of our physical as well as mental inability to know the entire nature at a time. About causality in particular, as a principle, Mr. Sinclair says that it is a way of our selecting events in attention. Philosophically, one cannot say 'yes' or 'no' to its objective existence. But this is a challenge to the progress of scientists. Science is possible only because as philosophers we believe—and not without reasons—that we know objects of nature and there are principles operating there. We see that when we throw up a body it comes down to earth. When we strike a match it lights up. Because we see this recurring principle in nature, our knowledge sustains a relation peculiar among the events. And if, owing to my arbitrary selection, things do not come down to earth when thrown up, fires do not burn, I shall feel like a fish out of water. Whenever I know, my knowledge or experience incurs a belief that events in nature behave exactly in their native sphere. If fire and burning were not objectively and universally related, I would not have selected events of fire and burning in a particular relation of causality.

Again, Mr. Sinclair says, "there is a similarity of ways." We admit that, but we as simple souls—however *naïve* he may call us—want to admit something more. We believe that the similarity in our ways of knowing clearly points to an objective sameness of behaving events. Mr. Sinclair falsely alleges that the similarity of experience makes us oblivious of the fact that they are our *ways of knowing*. Nobody denies that we have our ways of knowing. But we cannot accept his illogical and mysterious emphasis on *ways* only, excluding their similarity. We claim humbly that 'similarity' in English vocabulary is not an unmeaning sound.

Mr. Sinclair uses the term 'work'. It has such a strong flavour of pragmatism that Mr. Sinclair appears to be a pragmatist. But he cannot mean anything similar to the pragmatist conception of the word. By 'working', William James only wants to convey that the truth has a content as different from the intellectualists' merely formal truth. But he also says that there is an 'ambulatory relation'. (The term is used by Mr. Strong.) And if followed up, our sensations melt themselves into real

objects. That is why they work. Mr. Sinclair does not and cannot attach any such sense to the term 'working'.

In conclusion, it is possible to agree with Mr. Sinclair, if he only concedes that the objects in nature behave in a fixed way and, in trying to know them, we obtain the principles. There is no reflective selection for the principles to emerge late in our understanding or *better* attention. There is an objective compulsion in our picking up and arrangement ; and this compulsion is only the real nature and behaviour of the objects in the world outside us.

A Trip to Totopara

SUNIL KUMAR MUKHERJEE, M.A., I.A.S.

Additional Deputy Commissioner, Darjeeling¹

THE fast dwindling Toto tribe has given Totopara its name as well as its importance. The spot is on the foothills of high mountains and, apart from its ethnological interest, the visitor who goes there gets ample reward for his pains in the scenery he comes across. When I was Sub-divisional Officer of Alipurduar, the only outlying sub-division of the Jalpaiguri District, I first found Totopara mentioned in the District Gazetteer and was interested. The interest was quickened when one day the wife of an Assistant of a European Tea Estate enquired of me : "Have you managed to visit Totopara, that semi-mythical spot the allurements of which are but partly summed up in its name?"

The opportunity came when I went on tour near the area. Totopara is within the limits of the Madarihat Police Station in the north-eastern corner of the Alipurduar Sub-division. There are two different routes to it—one via Lankapara Tea Estate and the other branching off from near the Hantapara Tea Estate. I was informed that the Lankapara route was shorter but was only suitable for those who were travelling on foot. I therefore went up to Hantapara Tea Estate on a jeep and from there mounted an elephant. It was the 24th of March, 1950. I started from Hantapara Tea Estate at about 9-20 A.M. At first the elephant had to wade through a considerable stretch of mud. Then came dense forest.

¹ Alumnus : 1938-42.

After about two hours the officer-in-charge of the Madarihath Thana who was accompanying me suddenly exclaimed: "We have arrived". My tour diary shows that we arrived at Totopara at 1 P.M. My impression was that the distance from Hantapara Tea Estate to Totopara was some 14 miles—an elephant can move fast.

Our approach however was already being announced from a clump of bamboo trees. A shrill sing-song which was wholly unintelligible to us was emerging from it. Nearing it, we could make out a short dwarfish figure, that of a youngman with Mongolian features. He had only a loin cloth on.

At that time we were on the fringes of Totopara. The elephant passed a field where maize was growing. The road took a crazy turn after that and we found ourselves near a shady open space where a few huts had been built in close proximity. It was the market-place. The huts were shops built by *bhatias* (plainsmen) from far away with their usual *bania* ingenuity.

A crowd soon gathered. A squat, thickset man came forward, announced with an air of importance that he was the headman and immediately started a tirade against the shopkeepers from the plains who, he claimed, had been fleecing them mercilessly. It was with difficulty that he could be soothed and made to talk about himself and his tribe.

From his account I gathered that only some fifty families constituted the Toto tribe. Only a rough guess can be hazarded about the total number of Totos. I would put it at 500. Physically the Totos resemble the Bhutiyas and the Gurkhas. They have the same short, sturdy stature and flat-nosed, round face with scanty beard and beady eyes. The huts in which the Totos live are round in shape and are double-storeyed. They usually stay in the first storey while the ground floor is littered with refuse of all sorts. Usually they keep pigs and poultry in the huts and this factor does not improve matters in point of cleanliness.

As regards the food habits of the Totos, rice is their staple food, while maize is also taken in times of need. Rice is of course also used for preparing *handea* which is so commonly drunk that no stigma whatsoever is attached to it. The Totos are by reputation fairly omnivorous in their tastes and on lean days even mice do not escape their attention. *Pan* is a general favourite and the Totos can be seen chewing *pan* almost all the time. Another favourite is *biri*. Even small children are addicts.

The Totos are a dying tribe. They are rapidly dwindling in number. Malaria and glandular ailments have been chiefly responsible; the survivors suffer, almost without exception, from some form of skin trouble. A very high percentage of the incidence of tuberculosis and leprosy is also to be found among them. Anthropologists will perhaps cite inbreeding as the cause for their gradual extinction.

The Totos grow maize, millet and rice in their fields. They are however well known for their *flair* for growing oranges. Up in the hills they have their orange groves and in January and February ply quite a brisk traffic. Silhouetted against the blue mountains, the orange groves provide a feast for the eyes.

The Totos, however, now complain that oranges are becoming more and more difficult to grow as the hill-sides are gradually being shorn of their vegetation. Oranges are the chief source of trade and it is difficult to envisage them after a few decades as thriving, if that trade is lost to them. They have no other means to fall back upon. They are soft, meek, ease-loving and easily satisfied and therefore have little incentive to better their lot or improve the prospects of survival for the tribe.

The Totos worship Mahakal (the God Shiva) who, according to them, lives in the hills which lie beyond the horizon. They are a superstitious lot. When asked whether they were given to hunting, they replied: "No, that is prohibited by Mahakal". When asked to adjust themselves to changing social conditions by learning to read and write, they replied: "No, Mahakal has definitely put a taboo on these things". One who hears their patter cannot but be struck by a curious combination of *naïveté* and native cunning, straightforward acceptance of the ills of human life and the all too human tendency to attribute their woes to caprices of the Designing Hand.

The return journey was uneventful. The headman demanded a price for his "talk". Afterwards he accompanied us up to the outskirts of the forest. We left Totopara at 3 p.m. and returned to Ramjhora Tea Estate at 6 p.m. at the end of a strenuous day.

Satish Chandra Mukherjee and the Dawn Magazine (1897–1913)

HARIDAS MUKHERJEE, M.A.

Lecturer in History, Central Calcutta College¹

SATIS CHANDRA MUKHERJEE (1865—1948) was one of the chief architects of the Swadeshi Movement of 1905, and a prophet of Indian nationalism in the first decade of the present century. His name has been rendered immortal in the cultural annals of Bengal for four notable contributions: the foundation of the Bhagavat Chatuspathi (1895), the establishment of the *Dawn* (1897), the organisation of the Dawn Society (1902), and last but not the least, the inauguration of the National Council of Education (1906). Each of these items requires intensive and detailed study. For the present, however, I confine myself to a study of Satis Chandra in relation to the *Dawn* alone.

The foundation of the Dawn Magazine (1897) was an epoch-making service of Satis Mukherjee to the nation. Originally, it was a journal of the Bhagavat Chatuspathi, but later it became an organ of the Dawn Society and still later, an organ of the Swadeshi Movement, particularly in its "National Education" aspect. The *Dawn* was founded by Mukherjee in collaboration with Rajkumar Banerjee who was Professor of Physics in Bangabasi College, and Manmatha Nath Pal who was a pleader in Alipore Court, but Mukherjee was the life and soul of the *Dawn* throughout its long career of sixteen years (March, 1897—November, 1913).

The *Dawn* was a monthly magazine intended to be a vehicle of higher Eastern and Western culture. Its object was "to make a special study of Hindu life, thought and faith in a spirit of appreciation, while remaining fully alive to the usefulness and the necessity of the existence of all other systems, secular or religious, Eastern or Western". The spirit or policy of the journal was thus cosmopolitan and all-embracing. The journal carried as its motto a famous utterance of Sankara which means in English: "That which is ever permanent in one mode of being is the Truth."

THE 'DAWN' IN ITS FIRST PHASE

Several well-marked phases are easily discernible in the evolution of the *Dawn*. The first issue of the *Dawn* was published in March, 1897 and

¹ Ex-alumnus.

the initial phase of the journal continued till July, 1904. During this period, the office of the journal was successively at the following addresses : (i) 44, Lansdowne Road, Calcutta (March, 1897—December, 1898), (ii) 3, Puddopukur Road, Calcutta (June, 1899—February, 1902), (iii) 79, Puddopukur Road, Calcutta (March, 1902—July, 1904).

The *Dawn* in its first phase was distinguished by high-class religious and philosophical writings. It occasionally contained articles on science, history and sociology as well as critical papers on education. Among the chief contributors in this period may be counted such names as Annie Besant, Swami Abhedananda, Mahendra Gupta (author of *Ramakrishna Kathamrita*), Dr. Nishikanta Chatterjee, Ramaprasad Chanda, Durgacharan Sankhya-Vedantatirtha, Principal Nagendra Nath Ghose, Principal Jyotibhusan Bhaduri, Dr. Mahendra Lal Sarkar, Jadunath Sarkar, Brajendra Nath Seal, Pandit Satis Chandra Vidyabhushan, Rajendranath Vidyabhushan, Pramathanath Tarkabhushan, Hirendra Nath Datta, Bepin Chandra Pal, Sister Nivedita, Atul Chandra Chatterjee, I.C.S., Kiran Chandra Dey, I.C.S., Haran Chandra Chakladar, Radhakumud Mukherjee, Rabindra Narayan Ghose, Sir George Birdwood, Dr. Coulson Turnbull, W. A. Rodman, Prof. A. A. MacDonnell and Principal E. B. Havell. Among these names one will encounter some of the most brilliant men and creative thinkers of the age. The topics of discussion were as varied as possible, though the predominant bias was for philosophical writings. Satis Mukherjee, as the Editor, regularly contributed serious and thoughtful articles on philosophy, religion and education, although these writings rarely bore his signature in print.

Within less than a year of its first appearance in March, 1897, the journal made a profound impression on contemporary Bengali thought. It created a stir among the intellectuals of the time on account of its high quality and standard as well as the seriousness and originality of most of its contributions. Sir Romesh Chandra Mitter (offg. Chief Justice of Bengal) wrote on April 12, 1898: "I have been a regular reader of the *Dawn* since its first appearance. The analytical power, evinced in expounding abstruse thoughts, is of a superior order. It is a valuable addition to journalistic literature in our country." Mr. Kiran Chandra Dey, I.C.S. (Offg. Magistrate and Collector, Faridpur) observed on March 31, 1898: "I wish to state that the *Dawn* marks a new departure in journalism." Sir Asutosh Mookerjee, then a member of the Syndicate, Calcutta University and a Vakil, High Court, Calcutta, wrote on April 16, 1898: "I am a subscriber to the *Dawn* and have been a regular reader of its pages. What has struck me most about it is that it does so much *original* work. It is an altogether new thing of its kind in India and deserves for its originality to be encouraged in every possible way by the Government in its Education Department, by other educational authorities, and by the more thinking portion of our community." Similarly, high

opinions about the character and quality of the *Dawn* were expressed by Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri, Senior Professor of Sanskrit, Presidency College, Calcutta (September 24, 1897), Chandra Nath Bose, then a Bengali Translator to the Government of Bengal (March 11, 1898), Rai Pramada Das Mitra Bahadur, the distinguished Sanskrit scholar of Benares (May 28, 1898) and other competent judges. The *Dawn* also attracted the notice of scholars and journalists beyond the seas as early as August-September, 1898. On August 20, 1898, *The Leeds Times* of England, a well-known weekly of that time, published a leading editorial on it under the title of "Our Influence in India." It was spoken of in that article as a "unique production." The whole article was reproduced in the *Dawn* (October, 1898). It also rose in the estimation of some scholars of America by that time. As time went on, the quality of the journal was more and more improved under the all-absorbing personal care of Satis Chandra Mukherjee. At the turn of the century it succeeded in firmly establishing itself in the world of journals. Commercial motives were entirely lacking in its set-up. The only thing that was always sought to be maintained was the quality of the journal, and the writings were marked by a noticeable breadth of view and depth of thought.

In its first phase the organ propagated, among other things, India's moral and spiritual ideals and values. The comparative methodology was very often resorted to and Indian thought was frequently thrown in bold relief in the perspective of Western ideals. Attention was constantly drawn to the distinctive mark of Indian culture, viz., primary stress on spiritual ideals as central to good living. Young Bengal learnt from Satis Mukherjee that India has a spiritual mission to fulfil. This was in consonance with the spirit of the teachings of Vivekananda and Abhedananda, the two monks of the Ramkrishna Order who were propagating Vedanta and Indian culture in the West during the same period. Like the two great Swamis, Satis Mukherjee was a staunch believer in India's inherent spiritual superiority to the West. The *Dawn* expressed and diffused such sentiments among the educated classes. They were made conscious of their worth, dignity and manhood, notwithstanding political enslavement and economic backwardness. A new spirit of self-confidence was instilled into the heart of the nation. This was the first and foremost contribution of Satis Mukherjee during March 1897—July, 1904.

Again, the *Dawn* in its first phase sought to drive home to the readers the truths and triumphs of modern science. The Editor himself occasionally contributed articles under this head, while as a rule he reprinted scientific articles from English and American journals of science. Original articles from well-known scientists, such as Dr. Mahendra Lal Sarkar, Principal Jyotibhushan Bhaduri, Dr. W. R. C. Latson, were published in its pages.

The *Dawn* was also responsible for publication of many historical and

sociological writings bearing on Indian and Western themes. Dr. Nishikanta Chatterjee's English rendering of "The mystic story of Peter Schlemihl by Adelbert von Chamisso" from the original German was serially published in the *Dawn* during 1899-1900. The same author's "Leaves from an unpublished Diary: some Reminiscences of England (1882)" was also published in Mukherjee's journal. And the Editor himself made several historical contributions to the magazine, and wrote many valuable articles on educational problems also. His long article, "An Examination into the Present System of Education in India and a Scheme of Reform", offers a masterly analysis of all the varied problems of Indian education and constitutes a landmark in the history of educational reforms in India. It was published in three issues, April-June, 1902. Few educational charters of early twentieth century can claim so much historic importance as this writing of Satis Mukherjee.

The *Dawn* was at first published as a monthly journal almost regularly on the completion of every month. But after the twenty-second issue (December, 1898), there was an unexpected delay in its publication for five months (January-May, 1899). The sole reason for this delay was the severe illness of the Editor, and the magazine, lest it should lose in quality in Satis Mukherjee's absence, was not published for five months. From a circular letter issued in March, 1899 over the signature of the Honorary Manager, Tinkari Mukherjee, we learn the following fact: "The *Dawn* being the property of the Bhagavat Chatuspathi, a Free Hindu Public Religious Institution conducted under the direction of Sir Romesh Chandra Mitter, Kt., the authorities of the said institution have decided that it would be in the interest of the magazine (having regard to the high-class character which it has always sought to maintain) that its publication be suspended during the period of illness of the Editor".¹ The Editor regained his health by May, 1899 and the *Dawn* resumed its career from June, 1899, with renewed energy and zeal. Every issue of the magazine bore the unmistakable impress of a master-mind—the stamp of Satis Mukherjee's ability and erudition. No thought of personal glory, no desire for reward animated Satis Mukherjee who worked as Editor out of love, being urged by idealism, "from pure patriotic motives at a personal sacrifice," as Jogesh Chandra Mitra (Offg. District and Sessions Judge, Nadia) observed on June 7, 1898. The proceeds of the *Dawn* were entirely devoted to the support of the Bhagavat Chatuspathi for the benefit of young students. From June 1899 to July 1904 the magazine was published every month without any break. Haran Chandra Chakladar rendered a splendid service to the magazine during this period as an assistant to Satis Mukherjee.

We learn from Mr. Chakladar that at first only 300 copies were printed every month. But every year the number increased and the area of its circulation became wider, and by 1902-03 the *Dawn* began to exert a

¹ The Editor's Acknowledgments (*Dawn*, June, 1899).

tremendous influence over the students and scholars of Calcutta. It also circulated in the districts of Bengal and beyond. Several dozens of each issue were despatched to the writers and scholars of England and the U.S.A. In its first stage the *Dawn* had, besides, several eminent contributors from Germany, England and America.

In fairness to Satis Mukherjee, it must be recorded that he was not content with merely running a first-class periodical; he went a step further in addressing himself to the self-chosen task of training up a band of young enthusiastic writers who would carry forward the spirit and tradition of the *Dawn*. In this regard he faithfully followed the idealistic tradition of Akshay Kumar Datta, the Editor of *Tattva-bodhini Patrika*,² and Bankim Chandra Chatterjee, the Editor of the *Banga-darshan*, both belonging to the nineteenth century. Satis Mukherjee's name will go down in history as one of the best journalists and creative thinkers of Bengal along with Iswar Gupta (1812-1859), Akshay Datta (1820-86) and Bankim Chatterjee (1838-94). Journalism was with him, as with the other three, a mission, not a profession.

THE 'DAWN' IN ITS SECOND PHASE

The *Dawn*, throughout its first phase, had been an organ of the Bhagavat Chatuspathi (founded in 1895). Its second phase began in September, 1904, when it ceased to be an organ of the said Chatuspathi and became the mouth-piece of the Dawn Society founded in July, 1902. During July, 1902—July, 1904, the Society and the journal had separate offices and management till they were linked up and fused into one. The Dawn Society found its mouthpiece in the old *Dawn* which, therefore, in its new series (since September, 1904) took the name of *The Dawn and Dawn Society's Magazine*. The Dawn Society functioned in full vigour up to September, 1906, after which date it gradually declined and became defunct early in 1907. The *Dawn* with its new title was published from September, 1904 down to November, 1913 after which the magazine ceased to exist. During this entire period the journal did not evidently function as the organ of the Dawn Society alone. Even after the dissolution of the Dawn Society, the journal retained its title as *The Dawn and Dawn Society's Magazine* and was successively intended to be an organ of the National Education Movement (1906-1909), and an organ of Indian art, architecture and music (1910-1913). As a real and effective organ of the Dawn Society the Magazine, functioned for about two years (September, 1904—July, 1906).

² *Tattva-bodhini Patrika* was founded in 1843 by Debendra Nath Tagore (1817-1905) with Akshay Kumar Datta (1820-1886) as the Editor (1843-1855). It was an organ of Tattva-bodhini Sabha of Debendranath Tagore, founded in 1839.

Banga-darshan was founded in 1872 by Bankim Chatterjee (1838-1894) who edited it for four years and then for the next six years it was edited by his elder brother, Sanjiv Chatterjee.

The *Dawn* in its second phase became a bi-monthly magazine, being issued every two months since September, 1904 and containing 48 pages of reading matter (Royal size). As a bi-monthly magazine its career continued till July, 1906. During this period (September, 1904--July, 1906), the office of the Dawn Society and the Dawn Magazine was at 22 Sankar Ghose Lane, Calcutta.

SPECIAL FEATURES OF THE MAGAZINE.

The *Dawn* in its second phase introduced several special features, such as *Indiana*, *Topics for Discussion*, *Students' Section* etc. The journal's aim was purposively reformist and propagandist. The slogan of the magazine became at this stage: "To love the country, one must know the country." As the Editor put it: "At the present day we, Indians, have hardly any real or extensive knowledge about India, its people and its princes. We know almost nothing of the actual condition of the teeming masses in the different provinces, of their social manners and customs, their languages, means of livelihood, religion, education or general character. And where there prevails this widespread ignorance about each other's concerns in a community, it is idle to expect that there should be any effective bond of sympathy or unity among its members. All our present unity is because of our living under a common administration, which, however, in our case, is not a growth from within, but a structure imposed from without. Hence this sort of life requires to be strengthened by a strong internal unifying force such as is likely to grow among us from a more intimate acquaintance with each other's actual wants and conditions in life." It was, therefore, intended by the Editor that the *Indiana* portion of the Magazine should be devoted to articles on things Indian—its provinces, peoples, princes and nobles. This portion, the first in the new series, remained a permanent feature of the Magazine down to November, 1913. Among the writings published in the *Indiana* section during September, 1904—July, 1906, Haran Chakladar's serial papers on "Bengali as Spoken by the Bengalis" (September, 1904—January, 1906) as well as his article entitled "Fifty Years Ago: The Woes of a class of Bengal Pesantry under European Indigo-Planters" (July, 1905) deserve special mention. Among the unsigned writings from the pen of the Editor himself, published during this period, "Principles of the Swadeshi Movement: Its Influence on the Indigenous Cloth Industry" (November, 1905), "The True Character of the Boycott in Bengal," "The True Character of the Swadeshi in Bengal" and "Prospect of the Swadeshi" (March, 1906) were outstanding contributions. Many unsigned articles written by the *Dawn* students were also published in this section.

Apart from *Indiana*, there was another very important section devoted to *Topics for Discussion*. This was the second part of the Magazine and included "short paragraphs on important national

subjects, not political, presented to readers as *Matters for Discussion.*" We learn from Mr. Chakladar that this section usually contained the thoughts of Satis Mukherjee, but not infrequently writings from other leading celebrities of India and abroad were presented to the readers for debate and discussion. This section had the great merit of focussing attention on the more important aspects of modern problems:

The third important section was the *Students' Section* which contained, first of all, the writings of recognised members of the Dawn Society in its two weekly classes. The English portion of this section contained writings of members of the General Training Class, while the Bengali portion published writings of members in the Moral and Religious Training Class. This *Students' Section* was introduced as a regular feature of the Dawn Magazine in September, 1904.

But several months later, a Correspondence Column was opened under this section for the students alone. In response to a suggestion from Bhanushankar Manshanker Mehta of Bhavnagar, Gujrat, a Students' Correspondence Column was started. In the July (1905) issue several questions from Mehta were published, inviting students to offer solutions. The Editor in the same issue exhorted the students throughout India (whether subscribers or not) to utilise the magazine as a common medium for exchange of thoughts and views (*Dawn*, July 1905—Part III, pp. 63-64). The Editor's call was at once responded to from diverse parts of India by the students who began to take a keen interest in the magazine. Among the students who participated in this Correspondence Column during July, 1905 to July, 1906 the names of Popatlal Govindlal Shah (Ahmedabad), Bhabani Charan Mitra (Patna), Kripashankar Prabhashankar Acharya (Kathiawar), Haripada Ghoshal (Tamluk, Bengal), H. H. Maniar (Kathiawar), Hari Raghunath Bhagvat (Poona), Rajendra Prasad (Saran, Behar), Rabindra Narayan Ghose, Kishori Mohan Gupta, Surendra Nath Das Gupta (Calcutta), G. Krishan Poti (Trevandrum), Satis Chandra Guha (Barisal, Bengal), Venka Swami Rao (Chittoor, Madras Presidency) may be picked out as the more important writers. The *Dawn* thus offered a platform to the Indian students for mutual exchange of views. The students throughout India were invited to suggest important and useful questions for discussion and to provide answers to the questions. The questions were usually set on Indian topics of national or social importance. The main object of these questions and answers was to enable the Indian students to come nearer one another through the medium of the Magazine and increase knowledge of each other and of the country. Maximum freedom was allowed to students in the matter of framing questions, but the Editor reserved the right of disallowing questions which in his opinion were "of a purely abstract nature" or "of a technical character" or would not serve "any practical or useful purpose." (*Dawn*, November, 1905, Part III, p. 8).

In its second phase (*September, 1904—July, 1906*) the magazine became an all-India influence and rose very high in the esteem of thought-leaders of the country, as is borne out by the numerous reports published in it. Its subscribers were drawn from different parts of India such as Calcutta, Travancore, Gujrat, Baroda, Tanjore, the Punjab, Vizagapatam, Behar, Poona, Ahmedabad, Madras and Bombay.

During the same period, the *Dawn* rendered several other memorable services to the country. From September, 1904, it began to encourage discussions on and researches in economic topics and values. Satis Mukherjee himself wrote (in the period following September, 1904) numerous articles on economic topics and tendencies and he inspired his pupils with his characteristic research-spirit and guided them quite creditably in that direction. The Editor made it a point to publish facts and data about the economic conditions of contemporary India, both rural and urban. Well-written articles on trade and industry, banking and commerce, agriculture and population frequently found a prominent place in the *Indiana* section of the *Dawn*. Statistical reports as well as facts and figures about economic life were always realistically approached and published in the Magazine. The readers were thus used to "objective, quantitative and statistical conceptions" of economic movement and morphology. So far as Young Bengal was concerned, Satis Mukherjee functioned as one of the early *Gurus* of economic researches during the first decade of the present century. Public attention to this important aspect of Mukherjee's life has been repeatedly drawn by Benoy Sarkar in his *Baqlir Pathe Bangalee* (Cal. 1934), *Creative India* (Lahore, 1937) and other publications, as well as by Shib Chandra Datta in his scholarly publication, "*Conflicting Tendencies in Indian Economic Thought*" (Calcutta, 1934).

The *Dawn* as an organ of the Dawn Society functioned effectively during September, 1904—July, 1906. The Dawn Society continued to exist till the earlier part of 1907, but between September, 1906 and the dissolution of the Dawn Society, the Magazine was only formally the Society's organ; it materially became a mouthpiece of the resurgent Bengal in its economic and cultural aspects. After July, 1906, the patriotic and national character of the Magazine became conspicuously prominent. It was openly and directly employed in the dissemination of ideas and schemes of National Education under national control. Considering this, the third phase of the Dawn Magazine may be said to have started not from early 1907 after the formal dissolution of the Dawn Society, but from September, 1906 when the National Council of Education was functioning in full vigour and overshadowing the Dawn Society.

THE THIRD PHASE OF THE 'DAWN'

The *Dawn* in its third phase approximately covered a little more than seven years (September, 1906—November, 1913). The first important

change was the transformation of the bi-monthly magazine into a monthly organ. From September, 1906 down to November, 1913 *The Dawn and Dawn Society's Magazine* was published almost regularly as a monthly journal. The only four months when the Magazine was not published in this period were November-December, 1907 and November-December, 1908. The office-addresses of the Magazine during this whole period were, in order of sequence : (i) 191/1, Bowbazar Street, Calcutta (September, 1906—May, 1907), (ii) 166, Bowbazar Street, Calcutta (June, 1907—October, 1909), (iii) 12, Lall Bazar Street, Calcutta (November, 1909—April, 1911), (iv) 8/2, Hastings Street, Calcutta (May, 1911—November, 1913).

The second important change was that the *Dawn* developed into a full-fledged organ of Indian nationalism in its broadest sense. The cultural aspect of this nationalism, in which Mukherjee himself was more interested than in anything else, naturally received greater prominence than the economic or political. During 1906-1908 the *Dawn* was, above all, a most powerful organ of the National Education Movement in India. The Magazine published regularly detailed notes and news as well as critical essays on the prospects and progress of the National Education Movement in the country. The movement was not confined to Bengal alone, but overstepped its boundaries. In Bombay, Madras, Gujrat and the Punjab it roused numerous men to have National Education under national control. The *Dawn* was functioning as a most powerful force in the intellectual world of India. Even outside India, the influence of the *Dawn* was felt in many quarters—in Switzerland, England and America. The number of its western subscribers rapidly increased at this stage. For a historical study of the National Education Movement in our country during the first decade of the present century, the issues of the *Dawn*, particularly for the period of 1906-1908, are invaluable aids. Benoy Sarkar's article on *The National Council of Education—and National School at Malda—in Bengal* (*Dawn*, August, 1907) is a most valuable historical document of the Swadeshi days. It at once drew the notice of Aurobindo Ghosh and Bepin Pal who commented on it in editorial articles of *Bande Mataram* and *New India* respectively, during August—September, 1907.

The economic studies and investigations were continued in the *Dawn* during this period as in the previous phase, but major attention was gradually concentrated on historical researches. It is not perhaps generally known that Satis Mukherjee was one of the most energetic and vigorous research workers in ancient Indian history. His historical papers, published in the *Dawn*, were numerous. He also inspired his pupils to carry on intensive researches in historical topics. From 1909, the *Dawn* became virtually a journal for the publication of historical research-papers. In quality as well as in influence the journal achieved the height of success. Late in 1908 he had withdrawn from the Bengal National College and devoted himself whole-heartedly to his old magazine, the *Dawn*.

Krishnadas Sinha Roy, one of his young pupils, was chosen as his personal assistant. Satis Guha, another pupil, was appointed manager of the Magazine.

The *Dawn* throughout its career since March, 1897, had functioned as an organ of patriotic propaganda. Nevertheless, the patriotic character of the Magazine became more pronounced during 1904-1908. But the height was reached during 1909-1913. It became one of the most eloquent exponents of nationalism and patriotism in India. Its circulation further increased and its appeal spread in different parts of India and beyond the seas. The distinctive character of Indian civilisation was constantly stressed and the achievements of the ancestors in mental and material progress were frequently displayed in the pages of the Magazine. Its articles on Indian creations in trade and commerce, art and industry, education and society, architecture and music as published during 1909-1913 belong to an exceptionally high category of scholarship. The Editor himself was as ever the most prolific contributor to the journal on a variety of topics.

The *Dawn* was at its best in its final phase. Its services to the nation in this period were something which any institution can be proud of. Its contribution to the enrichment and expansion of historical scholarship deserves the highest recognition. The old pupils of the Dawn Society were some of the best writers of the journal at this stage.

Radhakumud Mukherjee contributed several historical papers of which "The Wonderful Unity of India: A Deeper View" (January, 1909) was the most illuminating. Brilliantly written with a historian's outlook, the paper was a contribution to Indian nationalism and was intended to stimulate the spirit of Indian nationalism by drawing attention to the fundamental unity of India in the midst of her immensity and variety. And that unity, argued the author, was not wholly the product of British rule, but had a proud heritage behind it. In a revised form the paper was subsequently published as a brochure entitled "The Fundamental Unity of India" (London, 1914), with an Introduction by J. Ramsay MacDonald, M.P. As a historical study of Indian nationalism the book is still valued by scholars.

Rabindra Narayan Ghose, another brilliant pupil of Satis Mukherjee, contributed several historical papers, each giving proof of the writer's deep study and careful thinking. His papers on "India's Literary Wealth: A Connected Story of Her Libraries from the very Earliest Times Downwards" (April to June, 1909 and January, April, 1910), "Indian Nationalism and Indian Art" (May, 1910), "Indian History and Indian Nationalism" (October-November, 1910), "Indian Civilisation and Indian Nationalism" (December, 1910) and "The Civilisation of Northern India: A Contribution to the Study of Hindu-Moslem Relations" (May to July, October and December, 1911) are remarkably illuminating and can still be

regarded as documentary contributions to Indian historical scholarship as well as to Indian nationalism.

Haran Chandra Chakladar, the seniormost pupil of the Dawn Society, made during this period (1919—13) some historical contributions the value of which is only now being properly understood. His papers on "Maritime activity and Enterprise in Ancient India : Intercourse and Trade by Sea with China" (May-August, 1910, February, May, August-September, 1911 and February-March, 1912) and "Ship-Building and Maritime Activity in Bengal" (September-October, 1910, January, March-April, 1911 and September, 1912) were not only outstanding contributions, but pioneering works on the history of Greater India. Chronologically, these writings anticipated Radhakumud Mukherjee's "History of Indian Shipping and Maritime Activity" (London, 1912) and had long been predecessor to Dr. Ramesh Chandra Majumdar's "Champa" (1927). These articles had at that time attracted the serious notice of scholars. In the leading editorial article of the *Indian Mirror* (June 5, 1910), the first of these two serial articles from Chakladar's pen was highly spoken of. The second article attracted the notice of Prof. Vidhushekhar Shastri whose controversy with Chakladar illustrates the kind of reaction that the latter produced on contemporary Bengali scholarship.

The most precious of all writings in the *Dawn* at this stage (1909-13) was Satis Mukherjee's monograph on "Swadeshi India or India without Christian Influences" (July-November, 1909, January-April, July-August, November-December, 1910). It was powerfully conceived and boldly executed. The mass of facts employed to substantiate his proposition as well as the method of analysis, was indeed superb and incisive. The greatness of Indian culture or civilisation before Christian influences was the main thesis of Mukherjee on that occasion. This monograph of Mukherjee is one of the best writings contributed by Indian scholars to historical scholarship at the beginning of the present century. India's nationalism and patriotism were powerfully fed and encouraged by this and other writings of Mukherjee during this period.

In connection with the visit of George V to India and the shift of the capital from Calcutta to Delhi (December, 1911), the India Government made a declaration of their policy of modelling the New Delhi buildings on the European Renaissance architectural style. The Indian architectural tradition was flatly disregarded by the Government. This provoked sharp criticism of the Government policy from the Indian press and platform. Non-Indian lovers of Indian art and architecture also raised their voice of protest against the India Government's move. In the opposition, thus organised, Satis Mukherjee as the Editor of the *Dawn* took a leading part. His article on "Wanted a New Policy : The Government and Indian Craftsmen" (February, 1912) powerfully pleaded for the acceptance of Indian claims of architecture in the construction of the

New Delhi buildings. He criticised, in a like manner, the India Government which had been "quite unsympathetic to Indian art-traditions." The *Dawn* since then became a mighty vehicle for the propaganda of Indian art-ideals and Indian architectural traditions. The Editor was in constant touch with Dr. A. K. Coomarswamy, Mr. E. B. Havell, Major J. B. Keith and other recognised authorities on Indian art and architecture. Their numerous articles and papers bearing on Indian art-traditions, which were published in the *Dawn* during 1912-1913, created a stir among scholars and Government officials both in India and England. In a letter to the Editor, Major J. B. Keith condemned the India Government's plan of accepting the European architectural style for the buildings at New Delhi as "a projected act of vandalism, the worst I have known in India." Keith wrote further in that letter (*Dawn*, January, 1913): "My devout hope is that Government will reconsider this before it is too late, for it is deceived on the subject. And I hope every lover of a beautiful, traditional and living art such as we have in India will enter a righteous protestation. No other country that I am aware of in the East has a traditional Art, nor in the West either. It would be a flagrant injustice to the Native Architect and to my old friends the masons and craftsmen, and a fine illustration of the extent to which Europeanisation is being carried." The movement in favour of a better recognition of Indian art and architecture by the Government of India soon assumed remarkable dimensions and behind that movement there were none more active than Satis Mukherjee, J. B. Keith, E. B. Havell and A. K. Coomarswamy. This movement produced tremendous reaction even in England and was accelerated by the *London Morning Post's* advocacy of the claims of Indian Craftsmanship (*Dawn*: March, September-October, 1913) in the contemplated building-constructions at New Delhi. In view of this tremendous agitation in the country, the India Government had to revise its policy in favour of Indian art-traditions. The buildings at New Delhi constructed since 1912-13 owed their ideological planning in part, at least, to the constructive criticism and suggestions of the Editor of the *Dawn*.

“As Civilization Advances Poetry Declines”

KARUNASANKAR ROY—*Fourth Year English.*

IT is Macaulay who made this startling statement. The statement means that poetry cannot thrive in a civilized world, that when we were getting civilized through all these centuries our poetry was actually on the decline. The statement, while it means all that, implies much more. It implies that poetry is going to be extinct. How shocking! But before we agree with Macaulay, it is necessary to examine the validity of the premises that warrant such a grim conclusion.

We should know first of all what civilization is. It is, as Clive Bell says, the means to the good states of mind. It also implies reformation and recreation of social values, if and when necessary. Now when civilization means all that, it is difficult to imagine how its advancement signifies the decline of poetry. Poetry is the expression of certain primary emotions which have nothing to do with civilization. They were there ten thousand years ago; they still exist and they will be there ten thousand years later. Thus hopes and disappointments, joys and sorrows were there in the past and will be there in the future. And so long as primary emotions will be there, poetry will continue to exist.

If we turn to the past, we shall find numerous historical events confirming it. Poetry is not the antithesis of civilization. Thus, in the Elizabethan era when we find new learning pouring in, new discoveries taking place, in other words, when we find the advent of a great civilization backed up by material prosperity, we also find brilliant efflorescence of poetry. There was Marlowe, there was Spenser, and above all there was the Titan, Shakespeare. If, indeed, the advancement of civilization implies the decline of poetry, Elizabethan period should have been barren. But it was not so. And it had not been so at least in the case of another civilization. In the 5th century B.C. Athens was at the height of material prosperity. Marathon had given her fame and renown in the Hellenic world and Salamis did the rest. It gave her a rich civilization. If we turn to the literature of the period, we are certainly not disappointed. Æschylus, Sophocles, Euripides were dramatists and great poets, too.

Is Macaulay's saying then to be rejected? Are we to regard it as an empty, categorical assertion with no logic behind it? Perhaps not. The author of the statement must have had some reason, though it may

be assailable. By poetry, possibly, he means a particular species which is born of a sense of wonder and is nursed by crude beliefs. And if poetry means that and that alone, then Macaulay is justified.

In ancient poetry there was wonder. The ancient man could believe that gods lived on the Olympus, that like men they had their quarrels too and that to settle their disputes they had to invite human beings. Hence the ancient Greeks could figure Pan by the woodside on a summer noon trolling on his pipe until he charmed the hearts of upland ploughmen. Hence they could think of Iliad, of Helen's face that launched a thousand ships and burnt the topless towers of Ilium. This sense of wonder gave birth to magnificent imaginative poetry. The ancient man was credulous. Hence he could believe Alcestis' return from the underworld or could think of a Prometheus stealing fire from heaven, and fighting for man against the might of Jupiter. If we turn to 'Macbeth' we find the same old truth repeated. The story has a stormy background of strange and mysterious highlands where the weird sisters dwell. This element of wonder that we find in the setting produces in its turn marvellous imagination. In 'Othello' again, when the hero describes his adventures on sea and land, we find once more a brilliant masterpiece of rich and virile imagination. Here, too, at bottom lies the sense of wonder that is roused by the land of the Anthropophagi, of men whose heads do grow beneath their shoulders.

As civilization advances, this wonder declines. Thus the imaginative splendour is lost. Reason replaces old beliefs, and man puts everything to the severe test of reason. The startling discoveries of science help man in the execution of the test. And what had so long been the crude beliefs of a preceding age now collapse before the severe scrutiny of the modern man. The modern man no longer believes in the weird sisters and his whole civilization induces him to regard Hellenic stories as myth. Thus, what appeared vast and hence, strange and mysterious to our predecessors, is now reduced for us to a finite stretch of time and space. We know it, every bit of it,—we know it well and too well perhaps. Hence, though the Atlas mountain is still there, Shelley's Atlas has flown from our midst. If our ancient forefathers were extremely credulous, we are all born sceptics. That is why the poetry that had its roots in wonder is practically non-existent in the modern times. And that is why the works of epic grandeur that were produced in primitive times cannot be expected to be written again in an age when the ever-swelling tidal wave of civilization is destroying old beliefs and wonder. Modern poetry is written about familiar objects. We know them closely, we know them well. Hence it lacks that imaginative splendour which was of the essence in the primitive times.

To conclude, if we mean by poetry one of its special kinds, Macaulay is right. But poetry is not all wonder. Poetry must keep pace with our

life. And it does so in modern times. T. S. Eliot thus expresses the despair, the deepening sense of frustration in his "Waste Land". Indeed our life is bleak and barren, presenting a dismal spectacle of a sad and lamentable waste. "Waste and void, waste and void and darkness was upon the face of the deep". Thus modern poetry has its roots firmly planted on the earth. Poetry is, as Arnold says, the criticism of life under the laws fixed for such criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. Now the laws fixed for such criticism are not the old ways of the past, but they are laws all the same. And that is why Macaulay's words hold good no longer.

Mirza Raja Jai Singh—A Forgotten Rajput Statesman

BARUN DE—*Fourth Year History.*

THE Rajput state of Jaipur has seldom conformed to the usual standards of Rajasthani statecraft, standards which have grown up round the tales of folklore and balladry, which James Tod has so admirably retailed in his "Annals and Antiquities of Rajasthan" and on which a number of Bengali authors like Rangalal, Madhusudan, R. C. Dutt, Rabindranath and finally, Abanindranath have drawn. Their typical Rajput has, by now, become almost a mythical figure. He is represented as an intrepid warrior possessing a self-effacing loyalty to tradition and principle; scrupulous to the core, he seems to be devoid of cunning and deceit. In fact, instances may be cited where Rajput princes have wasted opportunities of getting the better of the enemy, simply because they thought it was not the right thing to do. This idealized portrait bears a remarkable likeness to that of their predecessors, the Kshatriyas of the Mahābhārata, or in fact, the Knights-errant of the Middle Ages with whom the medievalist romantic Tod almost certainly compared his heroes.

The rulers of Jaipur of the Kacchwaha clan are, however, as Dr. K. R. Qanungo has remarked, unlike their compatriots, proverbial for their unwarlike nature. This statement should not be taken as an imputation, but may in fact be explained by their environments. Unlike the more liberty-loving Mewar or Marwar, Jaipur or Amber, as it was known in the Mughal Period, has been endowed by nature with an indefen-

sible terrain which enabled the sovereigns who held Delhi and the Jumna Doab to overrun her territory with ease. This explains why there are few sieges of Amber like the famous sacks of Chitor. The rulers of Amber had nothing for it but to play second fiddle to the Agra rulers, and the Deosa Interview in 1562 between Beharimall of Amber and the young Akbar marks the beginning of a long *entente* between them and their successors. This would explain why we find no prominent mention of a Rajput prince on the roll of great Rajasthani patriots.

But their peculiar situation made the princes of Amber as good statesmen as soldiers. Though, perhaps, no match in valour for their compatriots of Bundi and Marwar, they possibly knew the art of war better, serving as they did all over India under the Mughal colours. The pliancy of her rulers enabled them to aggrandize steadily their territories by keeping in the good books of the Emperors, while their more chivalrous and nationalistic compatriots kept themselves fruitlessly aloof.

This essay tries to give some account of one of the greatest Amber princes, one who so represents the characteristics which have been described that he might almost be compared with Brasidas who, according to Thucydides, was so un-Spartan, but yet the best Spartan of them all! A mighty captain and a consummate statesman, he was one of the major moderating influences in the reign of Aurangzeb, and it would be no exaggeration to say that with his death and that of Jaswant Singh one of the main checks on the monarch's fanaticism was removed.

Jai Singh I, given the title of Mirza Raja by a grateful emperor, came to the throne in the closing years of Jahangir's reign on the death of his worthless cousin, Maha Singh, who had succeeded his equally worthless father, Bhao Singh. Bhao Singh's father was the great Man Singh—perhaps, the greatest of all Rajputs including even Rana Pratap—whose career deserves a monograph entirely devoted to it. After his death, much of Amber's fame had suffered a diminution, thanks to his degenerate offspring, and it was at a very low ebb when, in 1625, Jai Singh came to the throne, destined to raise it to a pinnacle of glory. An interesting anecdote about him when a lad of eighteen, narrated by Tod in his Annals, gives us a glimpse into the control which the Mughal harem in those days exercised over the investiture question. According to Tod, there were several claimants for the *gadi*, and Jahangir threw his power in favour of the grand-nephew of Man Singh only on the advice of Jagat Gosain, his Rathor consort. When Jai Singh went to perform obeisance for the investiture, the emperor directed him to the Rathorni, for she, he said, was his benefactress. But the punctilious Rajput refused to offer *salaam* to Jagat Gosain, as it ill became one of princely birth to bow before a fellow-prince's daughter. "It matters not," cried out the good-natured princess, "I give you the Raj of Amber". The story might be inaccurate and anachronistic, but it is illustrative.

As regards bravery, Jai Singh made his mark early in the reign of Shah Jehan. The young prince, Aurangzeb, was once attacked at a show by a mad fighting elephant and although he encountered it bravely, he would probably have been killed, had not his brother Shuja and the Raja galloped up amid the general confusion, the latter putting the monster to flight with his lance. His first venture, worthy of note, was with the ill-starred expedition which Shah Jehan sent to fulfil his "famous but fatuous" idea of reconquering the ancient Timurid dominions of Balkh and Badakshan. The expedition bears a remarkable resemblance in motives and difficulties to the British army in the First Afghan War. Aurangzeb's army, though it fought bravely, found its supply lines cut off and had to fall back as precipitately as the British army which retreated to Jalalabad in 1840. The Amber Raja played a prominent part in covering the retreat and bringing his troops out of the passes of the Hindu Kush. He certainly handled them better than Elphinstone and the rest of the British generals in 1840.

We next hear of him at the beginning of the fratricidal wars of succession at the close of Shah Jehan's reign. The prince seems to have been high in the imperial favour, for he and Dilir Khan Ruhela were appointed advisers to the son of Dara Shukoh, the young prince Sulaiman Shukoh who was sent to quell the insurrection of Shah Shuja who had been marching on Agra with the Bengal army and the "nawara" (navy). Although Sulaiman was the nominal commander, "the real power", says Sir Jadunath Sarkar, "lay in the hands of the politic and experienced Rajput chief, Jai Singh". The first adjective sums up the situation well, for although Shuja was checked at Bahadurpur on the Ganges, Jai Singh must have divined which way the wind blew. We do not know when he left the army of Sulaiman and transferred his valuable allegiance to the rising "Southern Light", Prince Aurangzeb, but he managed to keep the Amber contingents out of the well-known battles of Dharmat, Samugarh and Deorai. He was, however, detached later by the new Emperor to pursue Dara out of India and, if possible, capture him. Jai Singh revelled in this type of campaign. He hung on to the fleeing prince's flanks—he possibly did not want to imprison a man whose salt he had partaken of. But Dara had no way of getting rid of the Raja, and was driven unceremoniously out of India into Sind, only to be betrayed later on by Malik Jiwan. During the pursuit occurred what, according to Sarkar, was "a most remarkable feat", that of crossing the Great Rann of Cutch in record time with an already worn-out army. The Jaipur Raja's diplomatic manoeuvres are as remarkable in this period as ever. The Mirza Raja's son, Ram Singh, was instrumental in making the hill chiefs of Kangra give the young prince Sulaiman Shukoh up to the tender mercies of the Emperor. Jai Singh himself helped Aurangzeb greatly, by weaning from his rival side many powerful Rajput chiefs—principally,

the doubly treacherous Jaswant Singh of Marwara. Of course, had Dara become Emperor, his manifold defects might have as soon brought the Empire to downfall, but, as Sarkar and Datta point out, it is an open question whether Jai Singh and Jaswant did not themselves pave the way for the Rajput War of the '70s by strengthening the cause of Aurangzeb, when the combined Rajput support might have helped the eclectic Dara on to the throne. Cautiousness in their case certainly did not have very fruitful results.

His successful encounters with Shivaji won for Jai Singh a premier position in Indian history. The Raja, besides perhaps Zulfiqar Khan,¹ the Ulysses of the succeeding reign, was among the few diplomats serving the interest of the Mughals who were able to beat the Mahrattas at their own tactics ; his ultimate failure in no way detracts from the glory of his victory and virtual capture of Shivaji. After the War of Succession, he was engaged in minor campaigns—he once withdrew his contingent on Imperial service from the borders of the Santal Parganas, refusing to proceed against Shuja who was still fighting a losing game against his brother. Mir'Jumla now took up the attack. Jai Singh's appointment was perhaps a rebuff to Jaswant Singh, who had failed miserably at Poona, and is an instance of the eternal Rathor—Kacchawaha² rivalry. It reflects all the more credit on the Mirza Raja that the sole command of the army was given to him and Aurangzeb did not indulge in his love of "duality of power" to which may be partly attributed the failure of the Mughals against the Mahrathas. In the Deccan campaign Jai Singh followed the policy of "divide et impera". The western part of the Deccan was in those days comprised of the kingdom of Bijapur and the hilly Maratha country, besides which there were some patches of territory, ruled by petty Maratha princes like the Morés of Javli. Shivaji had consolidated his power by putting down these chieftains, mainly by a politic mixture of force and fraud, and they, in turn, rallied to the Mughal cause. It redounds to Jai Singh's credit that he was able to find this weak spot in Shivaji's armour. Bijapur had been marked out for conquest by Aurangzeb since the days of Shah Jehan, but it stood too much in dread of Shivaji's policy of aggrandisement to lend him a helping hand. It is certain that an *entente* between the Marathas and the Muslim powers of the Deccan would have wrecked the southern ambitions of the Mughals, considering the past records of the latter ; but, as it was, the Maratha-Bijapur rivalry was the key-stone to Jai Singh's activities in the south.

¹ *Zulfiqar Khan*, a Mughal noble in the later years of Aurangzeb's reign, first became prominent for his methods of fighting the Marathas. In an age when huge Mughal armies were cut up by the mobile Maratha columns, he employed the guerilla tactics of warfare to combat their light cavalry. His capture of Jinji is one of the main Mughal triumphs in politics. Zulfiqar later, became almost the king-maker in the reigns of Bahadur Shah and Jahandar Shah, and met a violent end.

² *Kacchwaha* is the clan name and must not be confused with *Kacchwara* which is the tract of territory they inhabited.

Instead of dissipating his military strength in a futile struggle against the Maratha guerilla bands, Jai Singh decided to seize the nodal point of the far-flung net of Maratha fortresses which crested the Western Ghats. He invested Purandar where Shivaji's family and treasures were kept, and formed a base six miles away at Saswad. It enabled him to keep his supply lines intact, send foraging parties into the Maratha territory and also 'mask' the Bijapur border. We see that his plan of campaign was more enlightened and paying than that of his predecessors who would sit down in Poona and angle for bribes from the enemy. To capture Purandar was difficult, but the Maharaja cordoned off the entire fortifications and set the Mughals and Bundela warriors under Dilir Khan Ruhela to batter their way upward. This "attrition" policy was bound to succeed and Shivaji, faced with the dishonour of his family and finding the Mughal pressure on his territory intolerable, decided to avoid a total wreck by capitulating before his entire army was decimated. His interview with the Maharaja³ has been made much of, and was indeed a triumph of diplomacy for the latter. By the Treaty of Purander concluded in 1665, Shivaji agreed to give up twenty-three of his forts and send his son with a contingent of 5,000 horse to Agra in return for being allowed to keep a few forts. By a second clause, Shivaji was to be permitted to conquer a lowland tract of the Konkan and the western highlands of Bijapur (Balaghat Bijapuri) for which he would have to pay 40 lakhs of *hun* (2 lakhs of rupees) to the Imperial Treasury. Jai Singh dilates on the merits of this clause in a despatch to Aurangzeb: "This policy will result in a three-fold gain: *first*, we get 40 lakhs of *hun*; *secondly*, Shivaji will be alienated from Bijapur; *thirdly*, the imperial army will be relieved from the arduous task of campaigning in these two broken and jungly regions as Shiva will himself undertake the task of expelling the Bijapur garrisons from them." This shows that the Mughals regarded the defeat of the Marathas merely as a stepping stone to the conquest of Bijapur.

Shivaji himself accompanied the Imperial army with a large contingent on its somewhat unjustified march into Bijapur. The Maharaja had once again flung his diplomatic net of bribery far and wide among the higher classes in Bijapur, but though many did take the bait, they in fact played false when he appeared before the walls of the capital. Secure in the hope that most of the Bijapuri subjects would come over to his side, Jai Singh collected a vast army on his own liability, as Aurangzeb had been trifling about sending him money, and did not even wait for his siege guns. The

³ Ramesh Chandra Dutt in his *'Maharashtra Jeevan Prabhat'* has given a fanciful account of this interview. Both the Mirza Raja and Shivaji are made to bandy high-sounding nationalistic jargon, highly anachronistic with the real circumstances. But the author has given a vivid picture of the Raja as a typical Rajput with a flowing white beard and majestic appearance. An authentic picture of the Mirza Raja was displayed in the Annual Exhibition of the Royal Asiatic Society of Bengal in 1951 by Mr. S. K. Saraswati. It is an 18th century painting, and is said to be "characteristic of his forceful personality".

forts of Phaltan and Mangalvidé fell in the first shock, and though some detachments of the enemy did not come over to his side, Jai Singh soon found that he had to deal with a "people's war"; for, when after several skirmishes he arrived within 12 miles of Bijapur, he found the environs ruthlessly laid waste and the city put in a state of defence with 20,000 men in it, while another army under Sharza Khan and Siddi Masaud was ravaging the Mughal *subha* in his rear. Only the missing siege-guns would have done the trick, and Jai Singh had perforce to retire if he would keep his supply-lines intact. That day, 5th January 1566, marks the end of the ever-successful Amber Raja's career. The retreat presented the sight of a shambles, for the unwieldy Mughal army was harassed on the flanks and the rear by the mobile, though small, Bijapuri host, and gave a foretaste of Deccan military operations in the years to come.

The Maharaja returned to Aurangabad to find another blow awaiting him, for he had prevailed on Shivaji to visit the Imperial Court at Agra partly at Aurangzeb's command, and partly because he had fears about Shiva's life, when he thought of the disaffected Mughal soldiery who attributed their disaster to Maratha treachery. The treatment of Shivaji at the hands of the Emperor is well known. Jai Singh had given his word of honour to Shivaji that he would not be ill-treated, and there is reason to believe that he was helped in his subsequent escape by the Maharaja's son, Kunwar Ram Singh, in restitution of his father's word. At any rate, Aurangzeb took this view of the matter and sent the Kunwar in disgrace to the operations in the pestilence-ridden Assam. The charge might have been true, for a Rajput chief of those days seldom hesitated to redeem his pledged word, even by foul means. But the Maharaja asserted with politic vehemence in his despatches that he knew nothing of the escape and let out a flood of invectives on the helpless Shivaji. He was even busy propounding further schemes of tricking the Maratha into captivity again. But Jai Singh had shot his last bolt, and when the Emperor repudiated his vast Bijapur debts, he sank under his calamities and died, perhaps, of a broken heart and over-work at Burhanpur in 1667. Even his death is a matter of controversy, for Tod would have it encompassed by his own son, Kirat Singh, at the instigation of the ever-malevolent Aurangzeb; Kirat Singh on the other hand believed that his father had been poisoned by his favourite secretary Udairaj, who would have been beaten to death, had he not apostatized—this form of escaping punishment being favoured by the Emperor at this time. Kirat Singh is, however, depicted by contemporary sources in a favourable light, and Rajput bards too often explain deaths by parricide or other foul means even when there is no supporting evidence.

This recital of dry facts might have made the reader think that Jai Singh's achievements were no higher than those of a mere campaigner possessing little or no culture. All contemporary chronicles militate

against this view. He greatly embellished and expanded the palaces of his capital city—though it was left to his descendant Sawai Jai Singh and a Bengali called Vidyadhara to build the model city of Jaipur—and was also a lavish patron of the arts. He followed the tradition of Hindu-Muslim cultural *rapprochement* among the higher classes, initiated by Akbar and Mirza Abdur-Rahim Khan-Khanan, and was equally at home in Persian and Arabic. He was a good letter-writer as is attested by his recently-discovered despatches to Aurangzeb, the *Haft-Anjuman*, which are distinguished for their polished style and force of diction. As a matter of fact, we do not hear of his cultural activities, only because his campaigns were long and frequent.

Jai Singh's character was a peculiar mixture of nobility and baseness. That he was brave is beyond doubt—he once led a storming party over the walls of the fortress of Mhow. Coupled with this bravery is also an extraordinary astuteness, a power "to humour and manage the various Rajput clans and make all obey the will of a common head," which makes him one of the greatest captains of the age and in his own race places him on the same plane as Rana Sanga and Raja Man Singh. Jai Singh had the eminently Rajput trait of arrogance examples of which have been furnished above.⁴ But though honest in all his personal dealings, Jai Singh was politically unscrupulous and unlike the ordinary Rajput, never hesitated to play the traitor to gain his own ends. He lays his heart bare in his despatches, where he describes all the promises which he never intended to keep, *e.g.*, his promise to wed his daughter to Shivaji in order to lure the Maratha into his clutches. He would compliment a man with honeyed words, and then heap filth on him behind his back. Money was, to his corrupt mind, verily the sinews of war.

But we must not judge Jai Singh solely by our standards. He grew up in a court where fraud and chicanery thrived and were employed as legitimate means of gaining one's ends. Jai Singh cannot be blamed for fighting his enemies on their own ground. If he had not been as diplomatically deceitful as he was, his lot would have been that of his contemporaries, the noble-minded and yet idle Ranas of Mewar, Karan Singh and Jagat Singh. Jai Singh was the child of his age, and ought to be judged by the standards of that age, though not completely excused. We ought also to remember that while he lived the Emperor did not dare to vent his spleen on the Hindus, and it was two years after the death of Mirza Raja that he released his anti-Hindu legislations, which ended in

⁴ Tod tells a story of the Mirza Raja in his cups, holding two glasses of wine in his hands, and while crushing one, vaunting "Here goes Satara; I hold the fate of Delhi in my hands and can deal with it in like manner." Tod has blundered into his usual inaccuracy, for Satara was the Maratha capital long after Shivaji's time, but Jai Singh seems to have had an inflated opinion of his power in the Mughal empire. The hollowness of the vaunt is all too patent.

undermining the strongest pillar of Mughal rule in India, the willing co-operation of the Rajput races. The whole life of Jai Singh of Amber is an appropriate commentary on that principle of co-operation.³

Lingering Imperialism

MIHIR KANTI RAKHSIT—*Third Year Economics.*

THE POST-WAR YEARS have witnessed the revival of the dormant imperialistic attitude of the Western powers as expressed in their frantic efforts to maintain their hold on the colonies and exploit their peoples. During the Second World War the Allies expressed their firm "faith" in justice, equality, fraternity and all that democracy stands for. While fighting Hitler's theory of racial supremacy, they were loud in declaring that they were the true upholders of the doctrine of equality of man and in their liberal promises to the subjugated peoples they kindled hope in the minds of the unfortunate people of the colonies that the cessation of hostilities would usher in their freedom. But after the war, the die-hard imperialists were again seen in their old rôle of exploiting the colonial people and all the assurances and guarantees to the subject millions were thrown to the four winds. Indeed, as an instance of betrayal, the infamous "Munich" Pact pales into insignificance when it is compared with the imperialist powers' betrayal of wartime promises to the colonial people.

ECONOMICALLY EXPLOITED NATIONS

It is true that after the war the imperialists were forced to grant political independence to some countries on account of irresistible popular movements. But the vested interests of the imperialist nations are still playing a major rôle in the economy of these countries, which will be clear on an examination of the trade and industry of the countries that became free from western domination recently. In India the bulk of the jute and tea industry is under foreign control, and the major part of India's trade is also carried on with the Anglo-American bloc. In 1951-52, 42·6 per cent of the total export of India went to Britain and America, while 42·2 per

³ I am indebted to Tod's "Annals and Antiquities of Rajasthan" (Crooke's Edition) and to Sir Jadunath Sarkar's larger edition of the 'History of Aurangzeb' for materials for the preparation of this article. All unspecified quotations are from Sir Jadunath Sarkar's work. The quotation in footnote 3 is from the Yearbook of the Asiatic Society for 1950.

cent of the total import came from the same countries. Similar is the case of Ceylon, Pakistan, Burma and other Asiatic countries. Owing to war-preparations of the Western powers, the prices of raw materials have gone up, though this has brought no relief to the toiling masses of the Asiatic countries, as their trade and industry is under the control of foreign companies and banks. In the Middle East and Egypt, under treaties signed under unequal strength of the parties, the western powers are trying to further their economic and political interests. In Persia Britain, through crude tactics, is trying to hinder the nationalisation of the Anglo-Iranian Oil Company. In Egypt, also, the British are trying to dominate the Suez Canal Zone.

MOTIVES BEHIND MAINTAINING COLONIES

But this is not the whole picture. Apart from these so-called free nations, there are still colonies of Britain, France, Portugal, and Holland and these powers are in no mood to give the colonial people the right of self-determination. The conservative element is now dominant in the political arena of these countries after a brief spell of socialist rule, and there seems to be no change in their outlook regarding the colonies. Indeed, they cannot afford to lose their hold on existing colonies for certain important reasons.

The standard of living in these imperialist nations is very high and this cannot be maintained without drawing on the resources of these colonies. The aristocrats, who control the political wheel of these nations, will, therefore, be in a difficult position. For, wherever the imperialists established colonies it became a happy hunting ground for the whole capitalist class of the dominant nations and thus a few whites, constituting only a small percentage of the total population, oppress and exploit vast masses in political as well as economic sphere. As Lenin rightly points out, the imperialists monopolise the colonial industries and resources and treat the colony as a market rather than as a community of human beings. So, as a result of the *laissez-faire* policy pursued by the imperialists, the colony has remained as a source of raw material and a market for finished goods. Thus, the capitalist class will not be able to earn handsome profits without the colonies. As Mr. Hobson (in his book "Imperialism") says, "The chief economic source of Imperialism has been found in the inequalities of industrial opportunities by which a favoured class accumulates superfluous elements of income which, in their search for profitable investments, press ever further afield; the influence on state policy of these investors and their financial managers secures a national alliance of other vested interests which are threatened by movements of social reforms; the adoption of Imperialism thus secures the double purpose of securing private material benefits for forward classes of interests and traders at public cost, while sustaining the general cause of conservatism, by

diverting public energy and interests from domestic agitation to internal employment.”

The second reason for maintaining the colony is that its raw materials are essential to the Imperialist nations in the production of armaments. Thirdly, the bases of these colonies in Asia and Africa are of great importance to the Western powers to fight communism.

Thus, though the Western powers are proclaiming that they are engaged in uplifting the backward colonial peoples, their real motives are not far to seek and these will become clear if we examine the conditions of the following countries :

THE EAST INDIES

After the war was over, the Dutch, contrary to popular expectations, did not grant independence to the Indonesian people. They tried, in the name of “police action”, to continue their colonial rule and and exploitation. For, Indonesia has always been a major reservoir of important raw materials. How important it is as a source of raw materials will be evident from the fact that in 1939 it produced more than a third of the world’s natural rubber, more than a sixth of its tin, about a fourth of its palm oil and coconut products, and large quantities of petroleum, tea, cinchona bark, sisal, kapok, pepper, bauxite, sugar and coffee. Indeed, Holland built its wealth and power on the East Indies to a great extent. It is estimated that the total capital investment in Indonesia before World War II was some four billion guilders (roughly one billion U.S. dollars) about 70 per cent of which was held by the Dutch interests. The investment paid handsome returns which constituted sixteen per cent of the Dutch national income. This explains why Holland was eager to maintain her control in Indonesia and in her efforts to do so she was helped by America who now returned, in the eyes of the Asian people, as one of the protectors and preservers of the colonial system. “American tanks and planes enabled the Dutch forces to carry out their infamous ‘police action’ and when the United Nations intervened in the dispute, American sympathy for the Indonesian cause was too lukewarm and equivocal to impress Asia in anything more than a pious protestation of an intention already discarded in practice.” Thus, through fire and water, the people of Indonesia gained their independence on December 27, 1949 ; but she is not yet completely free from Dutch influence. A part of the East Indies is still under Dutch occupation and the Dutch government is still trying in some way or other to maintain their influence in Indonesia which evoked contempt from the people of Indonesia. This was expressed in an unmistakable manner through mass demonstration and tearing of the flag of the Dutch embassy and it represents the true feeling of all the oppressed people of the world towards their oppressors.

FRENCH AND PORTUGUESE POCKETS IN INDIA

The French and the Portuguese governments, strangely enough, are trying their level best to retain their pockets in India. Seeing the result of the referendum in Chandernagar, the French Government have taken to the tactics of terrorising the pro-merger movement in Pondicherry and other French pockets in India and have created such a situation there that an impartial plebiscite cannot be held. The leader of the pro-merger movement was attacked and similar attacks are being made on other leaders also. Hundreds of persons wanting their destiny to be united with India's had to take refuge in Indian territories for fear of goondas.

Portugal, inspired by the "noble example" set by France, has also created a reign of terror in Goa and other places. Keeping portraits of Indian leaders is prohibited and in some cases these portraits have been burnt down by the police.

INDO-CHINA

Ironically enough, France, known as the motherland of liberty, equality and fraternity, is trying to restore the Bao Dai regime with the help of the American armaments against the wishes of the people of Indo-China. The French government have declared that they are fighting the revolution in Indo-China only because the Nationalist Party led by Ho Chi Minh is communist and that they will hand over the authority to the Annamite Government of Bao Dai. But it is a clear fact that Bao Dai is only an instrument in the hands of the imperialists and if he succeeds, the people of Indo-China will be for years subjected to imperialist exploitation. The motive of French imperialists will be clear from the provisions of the Elysée agreement between Bao Dai and M. Vincent Auriol, the French President, on March 8, 1949 when Bao Dai was staying in France, while the Vietnamese were fighting to drive out the foreign exploiters from their motherland. According to this agreement, Viet Nam is to become an "associated state" which is, in reality, nothing more than a colony under the French Union. Hence in 1950, the Republican Radio of Viet Nam rightly condemned the Elysée agreement as a treaty of treason and demanded a total French evacuation of Indo-China. But the French cannot retreat because of political and economic interests. Indo-China, being situated in the south of China, is essential to the Western powers to stem the advancing tide of communism, and that is why America is so much interested in preserving French domination there. Apart from this political aspect, the economic importance of Indo-China to the French is in no way insignificant. "Indo-China was the third most important exporter of rice in the world. A substantial quantity of rubber and maize was also exported from here. Its wealth lay not only in agriculture but also in minerals and timbers; it had anthracite coal (most of which is exported),

as well as iron ore, tin, zinc, phosphates and tungsten." For centuries France has dominated trade and industry in Indo-China and earned fabulous profits. As in many other colonial countries, there was over-emphasis on the production of raw materials and foodstuffs for export. Industry was not developed and the French treated Indo-China pre-eminently as a source of raw materials for France and a market for French manufacturers. On the other hand the Indo-Chinese peasant lived in abject poverty, barely able to feed himself. He suffered under a grinding burden of debt as he had to pay as much as one-fifth of his meagre annual income to the government in order to keep the huge administrative machinery of the French moving. Yet the Indo-Chinese contribution to French prosperity is not small. During World War I, France got from Indo-China half the loans and gifts made by its colonies and a substantial amount of war materials. More than forty-three thousand Indo-Chinese soldiers and about fifty-nine thousand workers had been sent to Europe. After the war, the French looked to Indo-China to earn some of the dollars they needed so badly, since it was one of the few colonies in their empire which exported more than it imported. The great rubber plantations in the South and the mines in the North were in French hands. The Indo-Chinese economy was dominated by French banks. In 1938 investments from abroad amounted to \$384,000,000 of which more than ninety-five per cent was held by Frenchmen. So "Indo-China in 1945 appeared a valuable reservoir for France which was rich neither in men nor in materials. Possession of Indo-China, again, meant a foothold in Asia—a 'balcony to the Pacific', as Frenchmen were fond of saying—important not only militarily, but also for less tangible reasons of influence and prestige in Far-Eastern and World affairs." For these reasons the French, in the name of securing peace, are trying to maintain their control there and exploit the people of Indo-China.

MALAYA

Britain is playing the same rôle in Malaya. In the name of exterminating Communist bandits who have the support of the majority of the Malayan people, she is in truth fighting a total war against the people of Malaya from the middle of 1948 and thus trying to 'save' South-East Asia from communism. How untenable the British stand is, and how far they are sympathetic to the people of Malaya will be clear from the fact that when the Japanese Army completed their occupation in Malaya in the year 1941, the British Army withdrew, leaving the people of Malaya at the mercy of the Japanese. During those dark days the freedom-loving people of Malaya gave a creditable account of themselves in fighting the Japanese. They formed "the Malaya People's Anti-Japanese Army" and put up a strong guerilla fight against the Japanese. In successful landing of the Allies and in their ultimate victory of Malaya, the Malayan people

themselves played a great part. But yet, after the war was over, the British did not give independence to this heroic nation. Britain is now telling the world that the majority of the people of Malaya want British rule. But in fact, she is trying to maintain her control over Malaya for her own economic and political interests and not for uplifting the backward people of Malaya. This truth comes out from the words of Mr. Woodrow Wyatt, Under-Secretary for War in 1951 under the Labour Government in Britain. Mr. Wyatt observes that Malaya's dollar earnings are in the neighbourhood of 250 millions a year—the highest of any country in the sterling area. Without those dollars, Britain's dollar gap cannot be bridged. Malaya is the single greatest producer of tin and rubber in the world. Hence, without Malaya the sterling area would be in a difficult position financially. Once Britain's control over Malaya's rubber and tin export is gone, her important position in the world market will fade out. Besides this, the base of Malaya is essential to the Anglo-American bloc to fight communism in Asia. These are the considerations which work behind Britain's maintaining the colony in Malaya.

AFRICA

The picture in Africa is essentially the same, though the colour question is more acute there. The whites, under the plea of bringing light to the people of the Dark Continent, came there in thousands to explore rich mines and established colonies there, making the black people practically their slaves.

The Union of South Africa, though known to the world as a democratic country, is in fact a government of the whites over the coloured people who constitute nearly 83·3 per cent of the total population. The constitution of South Africa provides no facility to the coloured people for representing them adequately in the legislature. Out of 153 members constituting the House of Assembly in the Union of South Africa, 150 are elected by the white people, while only 3 seats are allotted to the Africans. So the white exploitation is going on in full swing and the condition of the Africans and Indians is going from bad to worse. Besides, the Nationalist Party, at present in power in the Union of South Africa, has been preaching the doctrine of "Apartheid", literally meaning a state of separation with a view to justifying its racial policies. In order to secure and further strengthen the position of the whites, the South African Government have enacted various laws of which the "Asiatic Land Tenure and Indian Representation Act" depriving the Indians of the right to buy land in white areas, and the "Group Areas Act" are the most obnoxious. The latter Act provides for the division and control of all land in the Union for ownership and occupation by the three racial groups—whites, natives and the coloured—in which the entire population of 12 million (of which non-whites number 10 million) is divided. According to this Act,

the government by proclamation can establish group areas for exclusive occupation of both or any of the groups. Various other social disabilities also stand in the way of the coloured people to lead an honourable life. In the policy of perpetuating white supremacy, the Malan Government has found ally in the white imperialists who always speak of equality and justice. In the United Nations, Britain has already joined her voice in defending the Malan Government while America, lest she should lose the friendship of the Asian countries which she badly requires in fighting communism, has mostly abstained, thus in a way, revealing her real attitude towards the coloured peoples of Asia and Africa. All over Africa, the story is much the same. Everywhere the whites get a lion's share of the social, political and economic benefits. There are still colonies of France, Britain, Portugal, Spain and Belgium attended with the common feature of white exploitation. The French Government have declared in unambiguous terms its determination not to give the right of self-determination to the people of Tunisia. In Morocco also, according to the provisions of French Protectorate treaty of 1912, signed under much unequal strength of the parties concerned, the French are trying to maintain their control. How far this treaty is applicable to Morocco now is not at all taken into consideration. As Sultan Sidi Mohamed Yusuf of Morocco said, "If you compare the 1912 treaty to a suit of clothes made for a child, you will see that the child has grown up, that its body has developed while there has been no change in the clothes." But France is bent upon maintaining her colonies. This obstinate attitude of France has evoked strong contempt from all right-thinking people of the world. But France and her fellow-travellers do not seem to care much for world opinion, and France has threatened to walk out of the U. N. Assembly when the Tunisian question will be discussed.

BRITISH RULE IN AFRICA

Britain also is carrying out the same policy. In Central Africa, the Tory Government have been pressing forward with the federation scheme, "although it is abundantly clear that the great bulk of African opinion is bitterly against it." The wishes of rather less than 1·8 million Europeans are to prevail over those of 6 million Africans.

In Kenya too, the same policy of furthering the interests of the whites is being pursued. The British are trying to misrepresent the happenings in Kenya, necessitating a declaration of emergency and bringing of troops from the Middle East to Nairobi; in truth they are due to economic exploitation by the whites and consequent poverty of the Africans. In Kenya, half of the inhabited land is owned by thirty thousand whites, while the other half is owned by five million Africans and ninety thousand Indians. Again the best lands are in possession of the whites and the area owned by the Europeans is expanding at the cost of the African and

the Indian. Two Labour M.P.'s, Mr. Brockway and Mr. Hale, after visiting Kenya, have referred to the excesses done by the Government there and have pointed out that if the existing process of pauperizing the Africans continues, there will come a time when every African in Africa will begin to hate all Europeans. In a recent speech in Parliament Mr. Hale compared the industrial wages paid in Kenya to Europeans and Africans and showed the disparity between the two ; there were 28,440 Africans in private industry receiving under £24 per year (Rs. 26 per month), and 34,000 more being paid between £24 and £36. In the Public Services there were 17,700 Africans earning under £24 a year and 31,000 more under £36. Besides this economic poverty, socially also the coloured people are subjected to hateful treatment by the Europeans. So it is not at all difficult to trace the origin of the present unrest in Kenya and other western colonies in Africa.

VICTORIOUS MARCH OF THE COLONIAL PEOPLE

We have seen that everywhere the Western imperialists are engaged in exploiting the backward peoples of Asia and Africa and in some cases waging predatory war against the people for strengthening their economic and political position in the world. But the tyranny of the imperialists is not an unmixed evil ; it has aroused the patriotism of the oppressed peoples who were submissive so long and the more the imperialists are trying to crush, the greater the momentum the oppressed peoples' movement acquires. The patriots of Malaya and Indo-China have shown in no uncertain manner their indomitable spirit and courage in fighting the British and the French forces, well-equipped with American armaments. Through this hard struggle the Indo-Chinese people have been able to establish and maintain a sovereign republic in the face of French opposition. In 1950 Ho Chi Minh told the people of Indo-China : "A few years of resistance have brought our country the greatest success in the history of Viet Nam—recognition of the Democratic Republic of Viet Nam as an equal in the world democratic family by the two biggest countries in the world—the Soviet Union and Democratic China—and by the new democratic countries. That means that we are definitely on the democratic side and belong to the anti-imperialistic bloc of 800 million people." In Malaya also, General Templer's method of mass scale arrest and brutality, reminiscent of the Dark Ages, in dealing with large numbers of villages, has failed to crush the popular movement.

The fight against imperialism is also extended to the dark continent. The riots in Port Elizabeth and other places and the violent way in which the Malan Government is trying to resist the passive resistance movement—all these clearly indicate what shape ultimately the non-violent resistance will take. Prayer and peaceful movement will only fall on the deaf ears of the die-hard imperialists. In response to the demand of Mr. Kenyatta,

President of the Kenya African Union, for more land, better social service and abandonment of racial discrimination, he has been put into prison and thousands of Africans are being rounded up and inhumanly tortured every-day in the name of suppressing terrorism. The "Mau Mau" Society, though described by the British as only a terrorist gang, represents the bitter feelings of all Africans towards their white oppressors. Thus, everywhere the fight against imperialism is in full tide which the imperialists are trying their best to stem with brute force. But as Lincoln pointed out, "It is possible to fool some people for all time and all people for some time, but it is not possible to fool all the people for all time." So the death-knell of imperialism will ring in no distant future and as recent happenings indicate, the freedom-loving peoples of the world are well on their way to achieve their freedom, however difficult and hazardous the path seems to be at the present moment.

An Apology for Statistics

RADHA GOVINDA LAHA, M.Sc.*

*Technician, Division of Theoretical Research, Indian Statistical Institute,
Calcutta.*

In J. A. S. A. (1951) appears this remark of H. G. Wells, the prophet of the modern scientific age: "Statistical thinking will one day become as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write". Only a few years back, however, the majority of people, as it appeared from their attitude towards Statistics, were little appreciative of its utility as a scientific method. It has been already pointed out by Prof. P. C. Mahalanobis in his presidential address at the 37th Session of the Indian Science Congress, January 1950—"Evidently, statistics and astrology were bracketted together in the mind of many of our scientists. The forecasting of future events is, of course, a common feature; and the basis was felt to be equally unscientific." But that situation is now over, and the popular as well as the scientific opinion about statistics has thoroughly changed. It is at present admitted as an indispensable scientific method by workers in the various fields of agriculture, anthropology, biology, genetics, economics, sociology, psychology and even engineering and medicine. From day to day new statistical methods are being devised for application

* Alumnus : 1945-51.

in unexplored fields and the statistical techniques, which to-day appear to be the best, are being replaced by something better to-morrow. As a consequence, more and more complicated problems both in theory and practice are emerging in various fields.

Among no fewer than a hundred definitions of statistics it would be difficult to choose the most comprehensive. But the following may do: "Statistics is that branch of scientific method which deals with the data obtained by measuring or counting the properties of *populations*, particularly of natural phenomena." Here the term "populations" is not confined to human population only, but is generally used to denote any group or aggregate of subjects whether animate or inanimate. Even physical observations, such as the simple measurement of the length of a scale, when repeated indefinitely, may form an aggregate which may be called a population of measurements. Statistics is mainly concerned with the study of groups and not of individuals. For example, in studying a population of statures the statistician is not in the least interested in knowing whether the height of a particular individual exceeds six feet but rather, how many have heights above six feet.

The definition of statistics as a scientific method for studying the properties of populations automatically leads to the conclusion that it is also the study of *variations*. Variations are found to form the intrinsic features of all kinds of measurement and statistical investigation largely centres around variation. We can never think of any science without measurement, nor any measurement without its characteristic variation. This would fairly justify the claim that statistics is indispensable in every science.

The main purpose of the theory of statistical inference is to draw some sensible conclusions from a particular set of measurements about other similar sets after paying due attention to its characteristic variation. In the vast majority of cases, the particular set of measurements or observations at our disposal is interpreted as a *sample* drawn from a hypothetical finite or infinite *population* which is supposed to be composed of all possible sets of such similar measurements. Expressed in a more lucid manner, the principal object of a statistician is to extract as much relevant information as possible about the parent population from the given sample. It is generally supposed that the population which is the main subject of our investigation can be specified by a mathematical formula involving a certain number of constants or *parameters*. The population and its parameters are so intimately related that knowing the exact values of the parameters is equivalent to knowing all about the population. But the task of determining the exact values of the parameters is well-nigh impossible, and the best we can do is to find out *estimates* of their true values. These estimates are usually calculated from the sample observations. The primary task of a statistician is to select a particular mathematical form

of the parent population (which is called the *problem of specification*) and next, to compute from the sample the best possible estimates of the parameters characterising the populations (which is called the *problem of estimation*).

A point deserving special mention in this connection is that in order to isolate the maximum possible relevant information about the population, it is absolutely essential that the samples given should be representative of the population. This is the reason why we lay special stress on the phrase "the sample should be strictly *random*." Here the term 'random' has a technical significance quite apart from its colloquial use. A sample is said to be random when each individual of the population has the same *chance* or *probability* of being included in the sample. It is important to note here that the main advantages of random sampling are two-fold—firstly, with the help of the calculus of probability we can make valid conclusive statements about the parent population and secondly, we can calculate directly the magnitude and nature of the *sampling errors* to which the estimates, as discussed above, are subject.

Now it may be desirable, in passing, to let the reader have some idea about the calculus of probability for understanding, roughly, the theory of random sampling. The tossing of a coin provides a very simple example for illustrating the concept of probability. Assuming the coin to be unbiased (that is, free from any bias of turning up either head or tail), the probability that it will turn up head at any throw is $\frac{1}{2}$, meaning thereby, that if the tossing of the coin is repeated *infinitely* then the ratio of the number of times it turns up head to the total number of throwings approaches the quantity $\frac{1}{2}$ in the long run." In other words, if the coin is thrown a large number of times, heads and tails will turn up approximately in equal numbers.

The nature of the statistical inference, generally arrived at, is quite interesting. It should be emphasised that all our prediction about the characteristic properties of the population is based on only one random sample and it is quite likely then that there may be practically an infinite number of such random samples. Thus conclusions about the population based on a random sample are bound to be uncertain. But it may be claimed that although statistical prediction is never absolutely certain, it is possible to estimate the limits of uncertainty. For example, let us suppose that we have a number of height measurements of individuals at our disposal, from which we have to predict the average height in the population from which the above data are considered to be "random samples". We may now calculate two quantities—say, a and b —from the sample observations and then make some statement like this: "The probability that the average height in the population lies between the two limits a and b is 0.99." The above statement appears to be paradoxical,

since the average height in the population is a *constant*, not subject to any variations or fluctuations and hence, only one of the two alternatives must take place, that is, either it will lie between the limits a and b or outside the above limits; hence, the above probability is either zero or unity. But the exact meaning of the above technical language may be given as follows:—If we continue drawing repeated random samples, each having the same number of observations, for an indefinite number of times and then for each sample we calculate the two qualities a and b based on the sample observations and finally, make the statement that the true average height for the population lies between a and b , then the proportion of our correct statements will be 0.99 in the long run, that is, we are likely to be wrong in our statements in 1 p.c. of the cases in the long run.

As an illustration of how statistical investigation has rendered invaluable service, we may quote an example from Prof. Mahalanobis' presidential address already referred to above:

“In 1926, a catastrophic flood occurred in the Brahmani river in Orissa. An expert committee of engineers appointed by the Government of India reached the conclusion that the bed of the river had risen by several feet and consequently the flood level was likely to be higher in future. The Committee naturally recommended raising the height of the embankments by several feet to give ‘protection’ against higher floods. At the request of the Government of Bihar and Orissa, I made a detailed statistical study. Using the statistical relationship, I found that the abnormal rise of the river in 1926 could be reasonably ascribed to exceptionally heavy rainfall in the catchment areas. On the basis of such statistical evidence, it was possible to advise Government that there was nothing wrong with the river and it was not necessary to increase the height of the embankment. This advice was given in 1930. The fact that no change has occurred in the severity or frequency of floods during the last 20 years shows that the statistical findings were correct. Direct experimentation in such cases is out of question; the statistical method supplies the only valid tool for scientific investigation. Incidentally, in this case it also saved several crores of rupees. Also, the statistical studies made at this time supplied the basic information for the Hirakud Dam, one of the river valley projects in India.”

Numerous illustrations of the above kind may be cited where statistical techniques have been proved to be immensely successful and all other scientific methods have failed. Statistical methods have been tried and proved to yield extremely satisfactory results in the various branches of science wherever we have to predict the nature of the whole from only a part given to us.

In conclusion, it may not be out of place to draw attention to certain prevalent misunderstandings about statistics. Occasionally, it is remarked that statistics is good for nothing, since the forecasting on the basis of

statistical investigations often comes wrong. But statistics as a scientific method must not be blamed for what is mainly due to the inefficiency of the staff of the various departments. A point that will bear emphasis is that it is better to go without statistics than call for quack statisticians. What our country needs to-day is efficient statisticians with a sound theoretical background and fit to cope with the problems that may emerge in the different applied fields.

Rastrapati Dr. Rajendra Prasad's Visit to Presidency College : December 24, 1952

THE PRINCIPAL'S WELCOME ADDRESS

DR. MOOKERJEE, MEMBERS OF THE PRESIDENCY COLLEGE : PAST AND
PRESENT, LADIES AND GENTLEMEN,

It is a unique occasion that calls us here together this memorable morning. An old boy of this College comes back in our midst as Rastrapati—President of the Republic of India, the country's first citizen and embodiment of its achievements, hopes and aspirations. For forty long and arduous years, as devoted lieutenant of Mahatma Gandhi, our Rastrapati has been in the forefront of the national struggle for freedom. Now that the goal has been achieved, after years of suffering and sacrifice, it is in the fitness of things that he has been elected to preside over the destinies of the young republic he has helped to bring to birth. One is indeed proud of belonging to a College that has contributed to the national struggle leaders of such calibre and eminence as Rastrapati Rajendra Prasad, Deshabandhu Chittaranjan Das and Netaji Subhaschandra Bose, not to mention the numerous alumni who have given their lives and labours to the national cause.

In the making of the new India of today Presidency College has played no mean part. Starting in 1817 as the Hindu College, it was the first institution to bring western education to this country and thus paved the way for the great Indian Renaissance of the last century. In 1855, a year before the establishment of the Calcutta University, the Senior Department of the Hindu College was separated from the Junior and re-

named the Presidency College. In 1858 Presidency College sent out her first batch of graduates, among whom was the seer Bankimchandra Chatterji, who gave to our national movement its sacred *mantram* of *Bande Mataram*. Years rolled by, and Presidency College, like its predecessor the Hindu College, went on contributing year after year men of first-rate distinction to the various walks of Indian life—the arts and the sciences, law, politics and administration, education and social service. In 1902, a young man from the Chapra Zilla School, who had occupied the first place in the Entrance Examination of the Calcutta University of that year, came and joined this College as both student and boarder. For five years he studied at this College with such eminent professors as H. M. Percival, Dr. P. K. Ray, Harinath De, Manmohan Ghose, Benoyendranath Sen and others. He came out at the top again at the F. A. Examination and graduated with double Honours (in History and in English Literature) and the Eshan Scholarship for being the first graduate of his year. That young man was Rajendra Prasad, the future President of the Republic of India.

Since those days the College has expanded in many directions till we have arrived at a position where the two buildings of the College together, the main one put up in 1874 and the Baker Laboratory put up in 1913, are unable to meet all its needs (even with structural additions to the Baker Laboratory last year). The problem of accommodation is the great problem before us at the moment. The problem is at its acutest perhaps in the science departments of the College. Science is an ever-growing subject, and our science departments have been developing at a pace that has outrun all available accommodation. It may just as well be mentioned in this connection that, besides normal teaching and research work, our science departments have also to take up various schemes of scientific research sponsored either by the State Government or by various bodies under the Central Government. Actually, at the moment, a number of such schemes, both State and Central, are being worked out in the different departments of the College. All that requires space, which is not simply there. I am afraid, if the problem of accommodation is not immediately tackled, science teaching and research in this College will come to a dead end. Which will be a great pity, for this College has a great tradition in matters of science; it was in its laboratories that the foundations of modern scientific research in India were laid by Acharya Jagadishchandra Bose and Acharya Prafullachandra Ray.

In point of fact, this problem of accommodation has been pressing the College in *all* its departments. We are short of lecture and seminar rooms. Our libraries, our laboratories, our offices, our Common Rooms, are all badly cramped for space. New subjects have been taken on, departments have multiplied, teaching and office staff has increased, so has the number of students on the rolls (and within the last seven years the College has

thrown open its doors to girl students as well). Yet accommodation has remained what it was since 1913.

This is really an impossible situation for the College. What is needed is another comprehensive plan for an all-round expansion like the one that was drawn up and officially approved in 1907 (many parts of which, unfortunately, still remain unrealised). For some time past we have been engaged on a plan like this, which provides for a much-needed Assembly Hall, additional lecture and seminar rooms, and extension of accommodation for all departments of the College. A special point is being made in the plan of providing adequate accommodation for research work in both Science and Arts. On the Arts side we have specially in contemplation, in view of the increasing importance of the subject, a School of Economics with its own set of rooms. This College has recently been declared a constituent college under the latest University Act, which means in practical terms that the possibility of revival of post-graduate classes, taken over by the University in 1917, is in the offing. That makes such a plan as I have been speaking of all the more necessary.

Our plan is nearly ready ; actual execution depends almost entirely on governmental sympathy and help, which, we most earnestly hope, will be forthcoming in due measure. Presidency College, I make bold to claim, is much more than a local college. She is a national institution. She has played a great part in the making of the new India of today. Given the right amount of sympathy, encouragement and State support, she has a great part to play yet in the making of the new India to be.

Ladies and Gentlemen, I am deeply thankful to you and to our Rajyapal, Dr. H. C. Mookerjee, yet another of our old boys, for having come and joined us here in today's memorable function. On behalf of you all, on behalf of the Presidency College, its staff and its students, and on behalf of the Presidency College Alumni Association, I offer our most respectful welcome and homage to our honoured visitor of today, Rastrapati Rajendra Prasad. The Rastrapati, as you know, has just completed his sixty-eighth year. I am sure you would all join me in wishing him a long life and health, happiness and prosperity. May he be spared for us for many years yet ! The country needs him, his inspiring leadership, his sage counsel and guidance, in the difficult journey that lies ahead. May the new India that he has helped to build up find her way to the great destiny he has visualised for her for forty long years. ! And may this College of his and ours attain to greater glory in the future and continue as ever to attract to her countless generations of students, the flower of the intellect of West Bengal, who would enter her portals proud of the knowledge that it was the *College* that had produced Rajendra Prasad !

Acknowledgment

We acknowledge with thanks the receipt of the following :—

- The St. Xavier's College Magazine, Calcutta.
- The Scottish Church College Magazine, Calcutta.
- The St. Paul's College Magazine, Calcutta.
- The Vidyasagar College Magazine, Calcutta.
- Jadavpur Engineering College Magazine (Silver Jubilee Number).
- The University Law College Magazine, Calcutta.
- The Hooghly College Magazine.
- The Darjeeling Government College Magazine.
- The Presidencian (The Madras Presidency College Magazine).
- Malabar Christian College Magazine.
- The Batanagar Recreation Club Magazine.

EDITORS AND SECRETARIES

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editors :

- 1914-15 PRAMATHA NATH BANERJEE, B.A.
1915-16 MOHIT KUMAR SEN GUPTA, B.A.
1916-17 MOHIT KUMAR SEN GUPTA, B.A.
1917-18 SAROJ KUMAR DAS, B.A.
1918-19 AMIYA KUMAR SEN, B.A.
1919-20 MAHMOOD HASSAN, B.A.
1920-21 PHIROZE E. DASTOOR, B.A.
1921-22 SYAMA PRASAD MOOKERJEE, B.A.
1921-22 BRAJAKANTA GUHA, B.A.
1922-23 UMA PRASAD MOOKERJEE
1923-24 SUBODH CHANDRA SEN GUPTA
1924-25 SUBODH CHANDRA SEN GUPTA, B.A.
1925-26 ASIT KRISHNA MUKHERJEE, B.A.
1926-27 HUMAYUN Z. A. KABIR, B.A.
1927-28 HIRENDRA NATH MUKHERJEE, B.A.
1928-29 SUNIT KUMAR INDRA, B.A.
1929-30 TARAKNATH SEN, B.A.
1930-31 BHABATOSH DATTA, B.A.
1931-32 AJIT NATH ROY, B.A.
1932-33 SACHINDRA KUMAR MAJUMDAR, B.A.
1933-34 NIKHILNATH CHAKRAVARTY, B.A.
1934-35 ARDHENDU BAKSI, B.A.
1935-36 KALIDAS LAHIRI, B.A.
1936-37 ASOK MITRA, B.A.
1937-38 BIMAL CHANDRA SINHA, B.A.
1938-39 PRATAP CHANDRA SEN, B.A.
1938-39 NIRMAL CHANDRA SEN GUPTA, B.A.
1939-40 A. Q. M. MAHIUDDIN, B.A.
1940-41 MANILAL BANERJEE, B.A.
1941-42 ARUN BANERJEE, B.A.
1942-46 No publication due to Govt. Circular
Re. Paper Economy
1947-48 SUDHINDRANATH GUPTA, B.A.
1948-49 SUBIRKUMAR SEN, B.A.
1949-50 DILIPKUMAR KAR, B.A.
1950-51 KAMALKUMAR GHATAK, B.A.
1951-52 SIPRA SARKAR, B.A.
1952-53 ARUN KUMAR DAS GUPTA, B.A.

Secretaries :

- 1914-15 JOGESH CHANDRA CHAKRAVARTI, B.A.
1915-16 PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A.
1916-17 PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A.
1917-18 RAMA PRASAD MUKHOPADHYAY, B.A.
1918-19 MAHMOOD HASSAN, B.A.
1919-20 PARAN CHANDRA GANGOOOL, B.A.
1920-21 SHYAMA PRASAD MOOKERJEE
1921-22 BIMAL KUMAR BHATTACHARYYA
1921-22 UMA PRASAD MOOKERJEE
1922-23 AKSHAY KUMAR SIRCAR
1923-24 BIMALA PRASAD MUKHERJEE
1924-25 BIJOY LAL LAHIRI
1926-27 LOKES CHANDRA GUHA ROY
1927-28 SUNIT KUMAR INDRA
1928-29 SYED MAHBUB MURSHED
1929-30 AJIT NATH ROY
1930-31 AJIT NATH ROY
1931-32 NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE
1932-33 NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE
1933-34 GIRINDRA NATH CHAKRAVARTI
1934-35 SUDHIR KUMAR GHOSH
1935-36 PROVAT KUMAR SIRCAR
1936-37 ARUN KUMAR CHANDRA
1937-38 RAM CHANDRA MUKHERJEE
1938-39 ABU SAYEED CHOWDHURY
1939-40 BIMAL CHANDRA DATTA, B.A.
1940-41 PRABHAT PRASUN MODAK, B.A.
1941-42 GOLAM KARIM
1942-46 No publication due to Govt. Circular
Re. Paper Economy
1946-47 JIBANLAL DEV
1947-48 NIRMAL KUMAR SARKAR
1948-49 BANGENDU GANGOPADHYAY
1949-50 SOURINDRAMOHAN CHAKRAVARTY
1950-51 MANAS MUKUTMANI
1951-52 KALYAN KUMAR DAS GUPTA
1952-53 JYOTIRMOY PAL CHAUDHURI

সূচীপত্র

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| কলেজ প্রসঙ্গ | ১ |
| বাংলা কথাসাহিত্যে ছুটি দিক | ৫ |
| সাংস্কৃতিক বাংলা কবিতার গতি | ৯ |
| দেখা (কবিতা) | ১৮ |
| রুপ্তি শেষের বিকেল (কবিতা) | ১৯ |
| সুধা সন্ধান (কবিতা) | ২০ |
| গুরোপোকা (গল্প) | ২১ |
| আমেরিকা আবিষ্কার (অনুবাদ গল্প) | ২৬ |
| জ্যোতির্ভিক্ষু (কবিতা) | ৩২ |
| দিনের কবিতা (কবিতা) | ৩৩ |
| উত্তর-স্বাক্ষর (কবিতা) | ৩৪ |
| সমাজবিজ্ঞানের গোড়ার কথা | ৩৫ |
| ইতিহাস-বিজ্ঞান | ৪১ |
| বাঁশীর সুর | ৪৮ |
| আমাদের কথা | ৫০ |
| Editorial | 1 |
| The book of Psalms—an appreciation | 7 |
| Stalin's last thesis | 9 |
| Democracy and freedom of thought | 13 |
| In defence of P. G. Wodehouse | 17 |
| Materialistic Interpretation of History | 21 |
| Periodisation in Indian History | 26 |
| Sports and Presidency College | 31 |
| Alumni Association | 34 |

এই সংখ্যার সম্পাদক সভা

অধ্যাপক শ্রীসুনীতকুমার ইন্দ্র (সভাপতি)

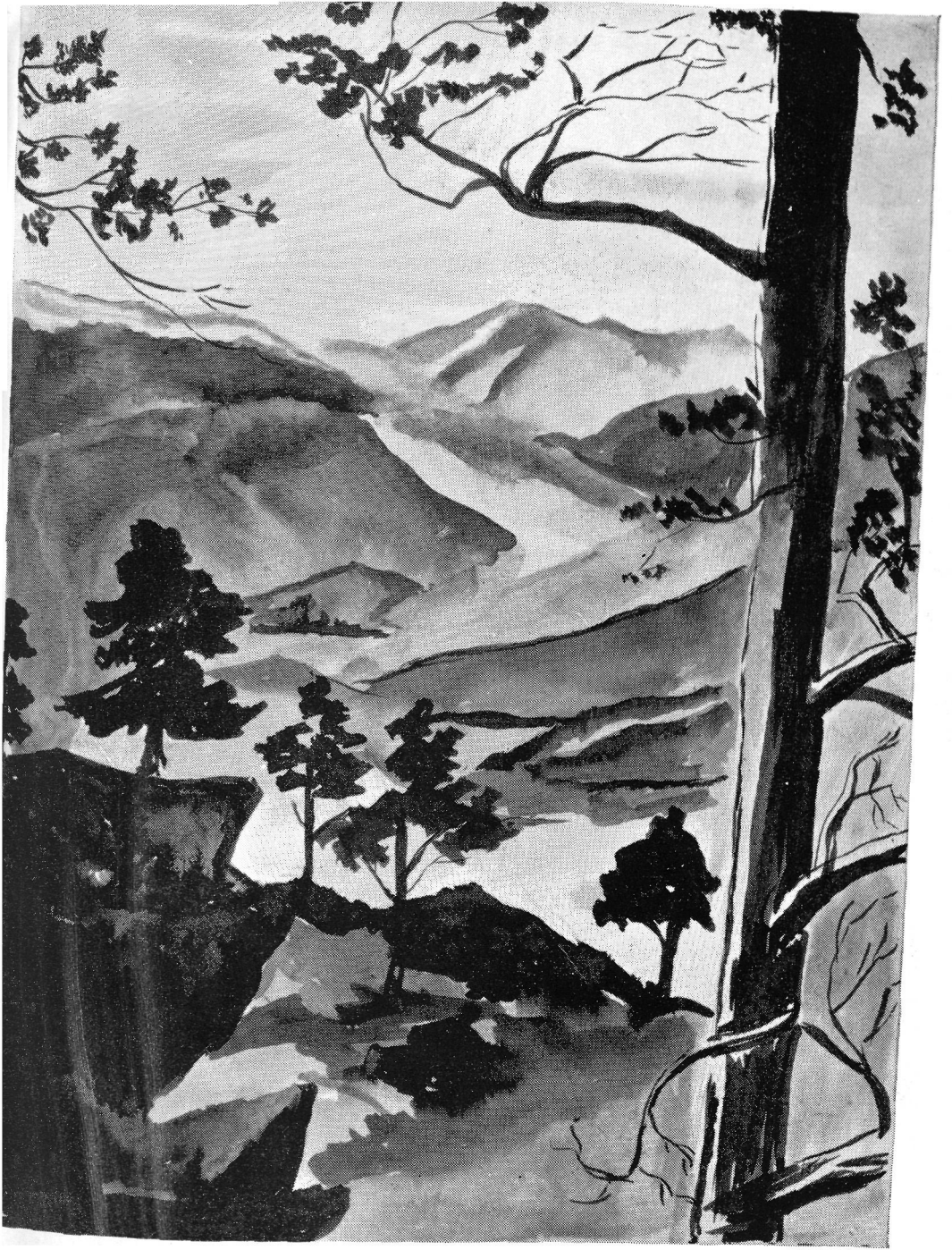
” শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য

” শ্রীঅমল ভট্টাচার্য্য

” শ্রীহীরেন গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীঅশীন দাশগুপ্ত (সম্পাদক)

শ্রীজ্যোতির্ময় পালচৌধুরী (কর্মসচিব)

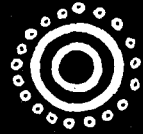


শিল্পী : দেবীপ্রসাদ সেনগুপ্ত
দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান ॥

প্রেসিডেন্সি কলেজ



পত্রিকা



অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ :: পঞ্চত্রিংশ বর্ষ :: ডিসেম্বর, ১৯৫৩

কলেজপ্রসঙ্গ

পত্রিকার কথা

পরিবর্তনই জগতের নিয়ম, এই ধরনের একটা কথা আজকেরদিনের প্রগতিশীল ব্যক্তিমাত্রেরই বলে থাকেন, আর নেহাত দায়ে না পড়লে প্রগতিশীলমতবাদ বাজে কথা বলে না। কাজে কাজেই কথাটার সত্য প্রতিপন্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের পটভূমিকার সামনে পরিবর্তনসাধনের কাজ অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। আজ তার পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা দ্বিতীয়বারের মত রূপ পালটাল।

বাংলাদেশ তথা ভারতের সমস্ত কলেজ পত্রিকার ভিতর আমাদের পত্রিকাই বোধকরি দ্ব্যর্থহীন প্রাচীন। পত্রিকা প্রকাশের আদিপর্বে, প্রচ্ছদপটের আলোআঁধারি পটভূমিকায় আবছা ফুটে ওঠা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছবির ভিতর দিয়ে তার এই বয়োজ্যেষ্ঠের গান্ধীর্ষ মহাজেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠত। একনজর তাকিয়ে নিলেই পত্রিকার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সমস্ত সন্দেহ মুহূর্তে বিলীন হতে বাধ্য হত। তার এই প্রাচীনত্বের প্রমাণ প্রচ্ছদপটে ফুটিয়ে তোলার ইচ্ছা প্রেসিডেন্সি কলেজ পরিত্যাগ করে সে আজ প্রায় বিশবছরের কথা। তার পরের প্রদীপলাঞ্ছন প্রচ্ছদপট আপনাদের সুপরিচিত। আমাদের পত্রিকা জ্ঞানের প্রদীপের ধারক ও বাহক, এই ধরনের একটা কথাই আমরা বলতে চাইতাম পত্রিকার সামনের প্রদীপের আলোর ভিতর দিয়ে। এবার আমরা এই প্রদীপকে মুছে দিলাম। এই সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের মননশীলতার ধারা মুছে গেল কিনা সে বিচারের ভার আপনাদের। প্রেসিডেন্সির সিংহধারার স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে পত্রিকার পাতায় পাতায়। এই ধারাত্রয়ে কি কাজ হয়ে গেলছে, আর কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে, এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি করতে পারে শুধুমাত্র আমাদের

পাঠকদের মননশক্তি। এবারে তার নির্লিপ্ত আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা নিঃশঙ্কচিত্তে সে ভার আপনাদের হাতে তুলে দিল।

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন বর্তমান জগতের অজস্র দুঃখ দুর্গতির মধ্যে সর্বহারা শ্রেণীর দুঃখ আর সম্পাদকদের দুর্গতি এতটাই সবচাইতে প্রণিধানযোগ্য। এবারে আপনাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদের দুর্গতির বোঝা অনেকটা লাঘব করেছে। ছাত্রছাত্রীমহল থেকে যেরকম সাড়া পেয়েছি তাতে ভরসা হয় অদূরভবিষ্যতেই আমাদের এ বছরের দ্বিতীয় সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। আপনাদের লেখনীচালনার প্রাচুর্যে আমাদের অধ্যাপকের এবার স্থানচ্যুত হয়েছেন। এতে বোধকরি তাঁরাই সবচাইতে আনন্দিত। অনেকগুলি স্তোত্র এবং অচেনা কলমের সহযোগিতা এবারে ছাপার হরফে স্বীকৃতি পেল না। এরজন্য দেয় প্রধানতঃই আপনাদের এবারকার সঙ্কীর্ণচেতা সম্পাদকের। স্থানাভাবের ওজর অত্যন্ত পুরোনো কিন্তু অত্যন্ত সত্য। এসমস্তের কথা ভেবে আমাদের অক্ষমতা নিজগুণে কমা করবেন। আপনাদের কাছেই আমরা সবচেয়ে বেশী অপরাধী আর সবচাইতে কৃতজ্ঞ।

পত্রিকাকে সফল করে তুলতে সম্পাদকের দায়িত্ব রয়েছে প্রচুর কিন্তু অবকাশ অত্যন্ত সামান্য। আসল কাজের ভার সব সময়েই থাকে সাধারণ ছাত্রছাত্রী সকলের উপর। এ বছরের প্রথম সংখ্যা আপনাদের সামনে উপস্থিত। আপনাদের অকুণ্ঠ সমালোচনা আলোতে আশা করি এবারের অজস্র দোষত্রুটির কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে পরে বারের প্রকাশে। কলেজ পত্রিকার সম্পাদক প্রথালুয়ায়ী ছবার করে পাঠকদের আক্রমণ করার স্বযোগ পেয়ে থাকেন। ইংরাজী জবানীতেও এ সম্পর্কে আমরা কিছু গবেষণা করেছি আশা করি আপনাদের মননশক্তি অক্ষমহাতের পরিচালনার দোষত্রুটিকে অতিক্রম করে আপনাদের পত্রিকাকে সফল থেকে সফলতর করে গড়ে তুলতে পারবে।

কলেজে পরিবর্তন :

কলেজে পরিবর্তনের কথা লিখতে গেলে প্রথমই মনে হয় প্রেসিডেন্সি কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক, স্ববিদিত মনীষী, শ্রীভবতোষ দত্তের সংস্পর্শ হারিয়েছে। পাণ্ডিত্যের প্রচুর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে এমন প্রতিভার মালিককে আর ছোট জায়গার সঙ্কীর্ণ পরিবেশ আটকে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এর আগেও ভারত-সরকার শ্রীযুত দত্তকে বৃহত্তর কাঠামো মধ্য ডেকে নিতে চেয়েছেন। এবারে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের আহ্বান তাঁকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ডিরেক্টর হিসাবে আমাদের অধ্যাপকের কাজ এবার দক্ষিণ বিশ্বের সম্মান লাভ করবে। তাঁর মনীষার এই স্বাভাবিক স্বীকৃতিতে আমরা আনন্দিত কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের যে ক্ষতি হল তা অপূরণীয়। আমাদের এই পত্রিকার তিষ্ঠা ছিলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। এই সংখ্যার প্রকাশ পর্যন্ত হয়েছে তাঁরই মূল তত্ত্বাবধানে। তাঁর বিদেশ যাত্রায় এ পত্রিকা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

অছাণ্ড বিভাগেও বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে। ইংরাজীর স্বযোগ্য অধ্যাপক শ্রীপরেশচন্দ্র ঘোষ পার্লিক সার্ভিস কমিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার সেন। দর্শনবিভাগের শ্রীনিখিলচন্দ্র সেন অবসর গ্রহণ করেছেন। এই বিভাগের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে এসেছেন শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী। গণিতবিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সনৎকুমার বসু হুগলী মোহসীন কলেজের অধ্যাপকের পদে যোগদান করেছেন। এই বিভাগের শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাস বিদায় নিয়েছেন। শ্রীশ্রামসাধন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকাশীনাথ নন্দী নতুন যোগদান করেছেন।

বিজ্ঞানের দিকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর বোধহয় পৃথক প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের সংগঠন। এবিভাগ পরিচালনার ভার পেয়েছেন শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মিত্র। পদার্থ বিজ্ঞানের শ্রীভগবতীচরণ গুহ বদলী হয়েছেন সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে। এই বিভাগে নতুন এসেছেন শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন সাহা। শ্রীপরেশকিশোর সেন চৌধুরী এবং শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ও এই বিভাগ থেকে বিদায় নিয়েছেন। এঁদের স্থান পূরণে এসেছেন শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস। রসায়ন বিভাগের কৃতী অধ্যাপক ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদয়ানন্দ ভাট্টুড়ী বিদায় নিয়েছেন। এবং এই সঙ্গে বিদায় নিয়েছেন শ্রীগিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য। এই বিভাগের কাজে যোগদান করেছেন অধ্যাপক স্বরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অনিরুদ্ধ দত্তগুপ্ত। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ হারিয়েছে শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্রকে। এ বিভাগে এসেছেন শ্রীসতীনাথ ভাট্টুড়ী ও শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন দাস। শারীরবিজ্ঞান বিভাগ জনপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীহুলালপদ সাধুর বিদায় গ্রহণে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ বিভাগের শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রুদ্রও বিদায় নিয়েছেন।

পরীক্ষার ফলাফল

প্রেসিডেন্সি কলেজের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের অনেকটাই গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকালের খাতার পাতায়। এবারেও আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এর কোন ব্যতিক্রম হতে দেন নি। এবারে আই. এ. ও আই. এস. সি. পরীক্ষায় পাশের হার যথাক্রমে ২৮% ও ২৫%। আই. এ. তে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে চারজন এবং আই. এস. সি. তে পাঁচজন, প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পেয়েছেন। এর মধ্যে আই. এ. তে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আই. এস. সি. তে শ্রীঅশোক সেন। এঁদের দুজনের মত স্নাতকোত্তর পরিত্যক্ত অনেক বছর এ ছুটি পরীক্ষাতে কেউ দেখাতে পারেন নি।

এবারে বি. এ. ও বি. এস. সি. পরীক্ষায় পাশের হার শতকরা ৮০% ও ৭৫%। বি. এ. পরীক্ষাতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করেছেন নয়জন, এবং বি. এস. সি. তে ষোলজন। বি. এ. পরীক্ষার সর্বোচ্চ সম্মান ঈশানবুত্তি লাভ করেছেন ইতিহাসে

শ্রীপার্শ্বসারথি গুপ্ত । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, শ্রীপার্শ্বসারথি গুপ্ত এবং অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, শ্রীঅমর্ত্য সেন, উচ্চশিক্ষার জগৎ ইংলণ্ড যাত্রা করেছেন ।

শোক সংবাদ

এবছর প্রেসিডেন্সি কলেজ তার কয়েকজন বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্রকে হারিয়েছে । শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে সারা ভারতই বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছে । শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন আমাদের সর্বজনবিদিত ছাত্রদের মধ্যে একজন । এ কলেজে তাঁর স্মৃতি রয়ে গেছে অজস্র । এই পত্রিকারই সম্পাদনার ভার তাঁর হাতে ছিল ১৯২১-২২ সালে । ছাত্রজীবন শেষ করার পরেও তাঁর সঙ্গে কলেজের যোগ ছিল নিবিড় । আমাদের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি । তাঁর মৃত্যুতে প্রেসিডেন্সি কলেজ একজন দরদী বন্ধুকে হারিয়েছে ।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্রের মৃত্যুতেও প্রেসিডেন্সি কলেজের অপূরণীয় ক্ষতি হল । আমাদের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রের নাম বাংলাদেশে সুবিদিত । কলকাতা-নগরীর মেঘর থাকাকালীনই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন । শ্রীহীরলাল চক্রবর্তীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞকে হারিয়েছে । বিশেষ করে হিন্দু-আইন সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সর্বজনবিদিত । শ্রীফণীন্দ্রনাথ দের মৃত্যু আমাদের অত্যন্ত ব্যথিত করেছে । তিনি ছিলেন আমাদের একজন বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্র ও আমাদের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সদস্য । লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহের মৃত্যুও অত্যন্ত দুঃখজনক । আমরা এঁদের সকলের স্মৃতির উদ্দেশে বিনীত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ।

বাংলা কথাসাহিত্যে দুটি দিক

প্রবন্ধ গুপ্ত—চতুর্থ বর্ষ আর্টস্

‘জনাস্তিকে’র বিখ্যাত লেখক যাযাবরের (যিনি দ্বিজ,—অর্থাৎ তাঁর নিজের ভাষায়,— যিনি একই দেহে ছবার আত্মপ্রকাশ করেছেন ;—‘দৃষ্টিপাতে’র যাযাবরের মৃত্যুর পর সেই দেহেই নাকি ‘জনাস্তিকে’র যাযাবরের জন্মগ্রহণ।) মতে একালে আর ‘সত্যিকারের গল্প’ লেখা হবে না, কেননা, এ যুগের বুদ্ধিজীবী মন রূপকথায় তৃপ্তি পায় না, অবিশ্বাস্ত্রে বিশ্বাস-স্থাপন করতে নারাজ। তা ছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জীবনের সমৃদ্ধি হারিয়েছে আজকের জীবন, তাই আজকের সাহিত্যে নেই বিরাটত্ব, মহত্ব ইত্যাদি। আজকের জীবনের প্রকৃতি অহুসারেই নাকি সাহিত্য লঘু চপল হতে বাধ্য।—আর সাহিত্যে নাকি মানুষের হৃদয় নিয়ে কারবার,—আধুনিক জীবনে সেই হৃদয়কে মানুষ বুদ্ধির অধীনস্থ করেছে,—সুতরাং শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি আজ অসম্ভব।

সাহিত্যের প্রকৃতি ও মূল্য সম্পর্কে মতান্তরের অভাব নেই,—তবে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, বিভিন্ন মতগুলি যে সব সময়েই অশ্রদ্ধেয়, তা নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে কোন কোন সৌখিন সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর উপদ্রব সছের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এঁরা তাঁদের সাহিত্য-শিঙটকে জীবনের বাস্তব ও প্রাণবন্ত ক্ষেত্র হতে, ‘রাজনীতি’, ‘বুদ্ধিবাদ’ ইত্যাদি জুজুবুড়ির কবল হতে উদ্ধার করে নিয়ে বোড়ে পুছে আড়ালে আবড়ালে তার পরিচর্যা করেন। এঁদের মতে সাহিত্যিকের শিল্পসৃষ্টি কোন সামাজিক কর্তব্য নয়, তা হোলো ব্যক্তিবিশেষের একান্ত নিজস্ব খেয়ালখুশীর যথেষ্ট চরিতার্থতা। এমনি করে যারা সাহিত্যকে ক্ষণে ক্ষণে ‘ডিনার টেবিলে’র সঙ্গে উপমিত করেন, যাদের মতে সাহিত্যের মধ্যে মানুষ জীবন-জিজ্ঞাসার কোন উত্তর পায় না, পায় কেবল অলসভাবে অবসর বিনোদনের অফুরন্ত রসদ, সাহিত্যসৃষ্টি ও খেলাধুলা যাদের কাছে প্রায় সমপর্যায়ভূত, আমাদের পক্ষে থেকে তাদের কিছু জবাব দেবার আছে। আমরা তাদের সচেতন করে দিই,—ছেলেখেলায় মানুষের মন ভোলাবার দিন সত্যিই গেছে, সাহিত্যে আজ মানুষ কেবল আরাম আর আমোদই পেতে চায় না, চায় তাদের জীবনের সকলদিকের বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ শিল্পরূপায়ণ। জীবনের সমস্তাগুলির প্রতিফলন শিল্পে খুঁজে পেলে সযত্নরক্ষিত সাহিত্যপত্রবনে ‘মন্তহস্তী’র দুরাগমনের আশংকায় ঝাঁরা উৎকণ্ঠিত হন, তাদের প্রবল একটা নাড়া দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, পদ্মমধু পান আর মলয়বায়ু সেবন আজকের জীবনধর্মীদের শিল্পরসিক মনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর সেই সঙ্গে বিশেষ করে যাযাবরকে মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে করে,—যে জগৎ ওথেলো-ডেসডেমোনা আর তিলোত্তমা-জগৎসিংহের জন্ম দিয়েছিলো, সে জগৎসমেত তারা আজ অন্তর্হিত ; যে জগৎ

জন্ম দেয় অমিত, সবিভা, ইন্দ্রাণী, মহুকে (‘একদা’, ‘অগ্নদিন’, ‘আরেকদিন’) ইন্দ্রজিৎ, শকুন্তলা, শান্তিকে (‘কিছু গোয়ালার গলি’) নতুন সমৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে সেই জগৎ আজ উপস্থিত। ইতিহাসের অব্যাহত নিয়মালুসারে যা যাবার তাই গেছে; সেই শোকে যা আগত ও আগামী তাকে অস্বীকার করাটা যুক্তিযুক্ত নয় (অবশ্য ‘একদা-অগ্নদিন-আরেকদিন’ আর ‘কিছু গোয়ালার গলি’ ‘সত্যিকারের গল্প হয়েছে’ কিনা তা যাযাবরই ভাল জানেন)।

‘সত্যিকারের গল্প’ আজ যখন সৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়, তখন অবশ্যই যাযাবরের ‘জনাস্তিক’ ‘সত্যিকারের গল্প’ হয়নি—এ আর বেশী কথা কি? তবে, এই রচনা ‘সত্যিকারের’ কী হয়েছে তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। মলী সেন নামধারী এক বিচিত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করে লেখকের ‘জনাস্তিক’ নামধারী না-গল্প—না-উপল্লাস—না-প্রবন্ধ—না-কাব্যের সৃষ্টি। সেই মহিলার পরিবেশে ইঙ্গ-মার্কিনী ‘অভিজাত্য’, বিলাসিতার বাড়াবাড়ি, অপচয়ের ছড়াছড়ি। নিজের খেয়ালখুশী মত তিনি যা ইচ্ছে তাই করেন, কেননা, তিনি স্বামীর ভালবাসা পাননি জীবনে। কেন? তার মনের সঙ্গে, মতের সঙ্গে মেলেনি তাঁর স্বামীর মন ও মত এতে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মলী সেনের মনটি বা মতটি কি রকমের। মতঃ—ভারতবর্ষে পেস্ বোলারের অভাব, লাইকা ক্যামেরা অপেক্ষা রোলীকর্ড সর্বাংশে শ্রেয়। বিশেষ ক্ষমতাঃ—বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ (হিষ্টরিকাল স্থলে হিটরিকাল)। বিচিত্রতর মনের খবর আমাদের অজ্ঞাত।

আসল কথা হোল,—আমাদের দেশের ‘অভিজাত’ শ্রেণীর শূণ্ণগর্ভ চটকদারী-সর্ব্বথ এক মেয়েকে কেন্দ্র করে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে একসূত্রে গাঁথবার বার্থ চেষ্টা করেছেন লেখক। বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করতে গেলে ছুয়েকটি কাহিনী বা এসিসোড মন্দ লাগেনা হয়তো (যেমন মান্নামাসি-গোর্গমোহন), কিন্তু সবে মিলে যে কি বিশেষত্ব সৃষ্টি হোল—তা জানিনে।

এই মলী সেন আর তার পারিপার্শ্বিক তথাকথিত অভিজাত সমাজের প্রতি লেখকের মনোভাব কৌতুকপ্রদ। ‘অভিজাত’ সমাজের অসারতা আর অপচয়কে লেখক খেলাচ্ছলে ব্যঙ্গ করতে ভালবাসেন। আবার তার নায়িকা (যার প্রতি তাঁর কৌতুহল নেই, কিন্তু ‘মনোযোগ’ আছে—অবশ্যই সশ্রদ্ধ মনোযোগ) এই শূণ্ণগর্ভ অসারতার মাঝখানে নিজের শূণ্ণগর্ভ চমৎকারিত্ব নিয়ে সসম্মমে বিরাজমান। নায়িকার চরিত্রের লঘুত্বকে লঘু করে গুরুত্ব আরোপ করবার কাজে লেখকের আশ্রয় চেষ্টা আরও হাশ্বকর হয়ে উঠেছে। ভারসাম্য রক্ষার তাগিদে নায়িকাকে হতে হয়েছে রবীন্দ্রসংগীতপ্রিয়—আর তার অনিচ্ছাকৃত বিবাহের পশ্চাতে লেখককে দাঁড় করাতে হয়েছে এক মহৎ উদ্দেশ্যকে—বাবাকে নিঃস্বতার হাত হতে রক্ষার দায়িত্ব। কিন্তু এত চেষ্টাতেও লেখকের কাজ হাসিল হয়নি;—সমস্ত বই জুড়ে আপন অকিঞ্চিৎকরতার পরিচয় দেয় যে মেয়ে—কৃত্রিম উপায়ে পাঠকের মনে তার প্রতি সহানুভূতি

বাংলা কথাসাহিত্যে ছুটি দিক

জাগাতে লেখক সমর্থ হবেন কি কোরে? আর যে চরিত্র পাঠকের মনে কোন সহানুভূতি জাগায় না, তার পরিণতি সম্পর্কেও পাঠক স্বভাবতই উদাসীন হয়। তাই পরিশেষে, নায়িকার জীবনে বেদনাবিধুর ট্রাজেডীর উদ্ভব হোল—এই ‘সত্য’ উপস্থাপিত করবার কাজে নায়িকার পক্ষে লেখকের ওকালতি নিষ্ফল হোল।

শূন্যগর্ভ ‘অভিজাত’ শ্রেণীর ফাঁপা চরিত্রগুলিকে নিয়ে লেখা এই শূন্যগর্ভ রচনাটি পড়ে, মনী ভৌমিকের অনুসরণে এর সঙ্গে একটি মাত্র জিনিসের তুলনা করতে মন চায়—‘হট কেবু’ ‘ডিনার-টেবিল’ যার যথাযোগ্য আসন।

* * * * *

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে হালের আমলের এই ‘যাযাবরী’ অসারতা আমাদের তগনই হতাশ করেনা, যখন আধুনিক সাহিত্যের বলিষ্ঠ জীবনধর্মী ধারাটি সম্পর্কে আমরা সচেতন হই। নতুন মূল্যবোধের প্রেরণায় আজকের দিনের যে শিল্পীগোষ্ঠী জীবনের বাস্তব সত্য অবলম্বনে সাহিত্য রচনার বেলা সমস্ত বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করছেন, তাঁদের জয়যাত্রার সার্থকতা ঐ অন্তঃসারশূন্য দেউলেপনাকে অগ্রাহ্য করবার প্রেরণা দেয়। যে জীবন আগত এবং যা আগামী তার সর্বাস্বীন রূপায়ন এই নতুন সাহিত্যকে অশেষ মূল্যাধিকারী করে তোলে।

‘পদ্মানদীর মাঝি’ আর ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাময়িক অধঃপতন আমাদের মনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিলো। মানসিক অস্বস্থতা (morbidty) তাঁর রচনাকে ক্রমাগতই জীবনবিদ্বেষী, পঙ্গু করে তুলছিল। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত ‘সোনার চেয়ে দামী’ উপন্যাসে আমরা আবার ‘পদ্মানদীর মাঝি’র মাণিকবাবুকে যেন ফিরে পেলাম। সমস্ত অস্বস্থতাকে কাটিয়ে উঠে তাঁর রচনা আবার বলিষ্ঠ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মধ্যবিত্তসমাজের দুঃখবেদনাকে চিত্রিত করবার বেলা এবার মাণিকবাবু কোন বিকৃত মনোভাবের পরিচয় দেননি, বরং তাঁর সহানুভূতিশীল মনের ছাপটি এখানে স্থম্পষ্ট। এই মধ্যবিত্তসমাজের সর্বগ্রাসী ভাঙ্গনকে রূপায়িত করবার বেলা সন্তোষ ঘোষ তাঁর ‘কিনু গোয়ালার গলি’ উপন্যাসে যে স্ত্রীত্ব জীবনবোধ আর অসামান্য শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, ‘সত্যিকারের গল্প’ না হওয়ার অজুহাতে তাকে অস্বীকার করা হয়তো যাযাবরের পক্ষেও অসম্ভব হবে। প্রবোধ সান্যালের ‘বনহংসী’ উপন্যাসে এক অসামান্য ‘বাস্তব’ সমাজচিত্র পাওয়া যায় বলে যারা সম্প্রতি হাঁক ডাক শুরু করেছেন, তাঁদের এটুকু জানা দরকার, ‘বনহংসী’র তথাকথিত বাস্তবতা আর ফাঁকা আদর্শবাদের জগাখিচুড়ি ‘কিনু গোয়ালার গলি’তে নেই, এদিকে চরিত্রচিত্রন আর ঘটনাবিগ্নাসে শিল্পীর যে বাস্তবচেতনার পরিচয় এ উপন্যাসে পাই, ‘বনহংসী’র কোথাও তার চিহ্ন মাত্র মেলেনা। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোট গল্পে আর নবীন লেখক সমরেশ বহুর রচনায় এই বলিষ্ঠ বাস্তববোধ আর শিল্পনৈপুণ্যের সমন্বয় বাংলা-সাহিত্যধারার অগ্রগতি সম্বন্ধে আমাদের নিঃসন্দেহ করে তোলে।

এই নবপ্রচেষ্টার মাঝখানে গোপাল হালদারের ‘একদা-অন্যদিন-আরেকদিন’ কেবল

প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা হিসাবেই গণ্য হবেন।—বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের সংখ্যানু-
জ্ঞিত কলঙ্ক লাঘব করবার গৌরবও এর প্রাপ্য। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে ষাঁরা
হোমরা-চোমরা গোছের আমীর-ওমরাহ এ সৃষ্টি যদি তাঁদের দৃষ্টি এড়ায় তবে দুঃখিত হবোনা,
কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে এ রচনার প্রকৃত পরিচয়টি অনাবিস্কৃত থাকলে, সেটা অনেকটা
ক্ষতিকর এবং দুঃখজনক হবে।

গোপালবাবুর এ সৃষ্টি একাধারে সাহিত্য এবং ইতিহাস, তাই একে মহাকাব্যের মর্যাদা
দিতে মন কুণ্ঠিত হয় না। বিংশ শতাব্দীতে বাংলার চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে যে প্রবল সংঘাত,
এবং সেই সংঘাতের মাঝখান দিয়ে বাঙ্গালী সমাজ যে অবশুস্তাবী পরিণতির পথে এগিয়ে
চলেছে, সেই ঐতিহাসিক সত্যই উপস্থাপিত হয়েছে এই উপন্যাসমালায়। নায়ক
'অমিতের' মধ্যে তার সমগ্র পরিবেশ (রাজনৈতিক ও সামাজিক) প্রতিফলিত হয়েছে, আবার
অমিতের দৃষ্টিকোণ হতেই লেখক সমগ্র পরিবেশের উপরে আলোকপাত করেছেন। 'গোরা'র
মধ্যে যেমন করে পাই ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ববিধ কুসংস্কারমুক্ত নবজাগরিত মানবিক
চেতনার প্রতিচ্ছবি, জাঁ ক্রিস্তফের মধ্যে যেমন মেলে বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের
প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নবচেতনার রূপ, 'অমিতের' মধ্যে তেমনি করে
পাই, আমাদের আজকের দিনের বিদ্রোহী চিন্তা এবং কর্মোন্মাদনার স্ফূর্ত রূপায়ন।

কোনক্রমেই যখন কোন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মূল্য অস্বীকার করা সম্ভব হয় না, তখন সৌখিন
সমালোচকেরা তার আঙ্গিকগত কাল্পনিক ত্রুটি আবিষ্কার করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এ
ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সোভিয়েট চিত্রকলার আঙ্গিকের বিরুদ্ধে সমালোচনার বণা
যখন কলকাতাকে প্লাবিত করে তুলেছিলো, তখন 'পরিচয়' পত্রিকায় গোপালবাবুই জানান,
শ্রেষ্ঠ শিল্প সৃষ্টিতে আঙ্গিক বিষয় বস্তুর অহুগামী হয়, স্টাইল বা টেকনিকের কালোয়তি যে
সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ, তা আর যাই হোক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদার অধিকারী হয়না।
গোপালবাবুর এ উপন্যাসমালার বেলাতেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। মহাকাব্যোপযোগী বিষয়-
বস্তুর অহুগামী যে বলিষ্ঠ আঙ্গিকের ব্যবহার গোপালবাবু করেছেন, তাকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
'ক্লাসিক্' বিশেষণে অভিহিত করে স্মবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন বলেই মনে হয়।

দুর্বল ভাবানুভূতি, ফাঁপা আদর্শবাদ, সৌখিন আধ্যাত্মিকতা আর টেকনিকসর্ব্বম্ব শূন্যগর্ত
চালবাজির সর্বগ্রাসী কবল হতে আপনাকে রক্ষা করবার শক্তি বাংলা সাহিত্যের প্রাণবন্ত
দিকটি সঞ্চয় করেছে, এ সত্য আমাদের আশাকে পরিতৃপ্ত করে, আর সেই সদ্দে সমস্ত সৌখিন
সমালোচনাকে তুচ্ছ করে নতুন আশাসঞ্চারও করে আমাদের মনে।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার গতি

শ্রীস্বপ্নাত গংগোপাধ্যায়—ষষ্ঠ বর্ষ, বিজ্ঞান

পুরাতনীর চিরন্তন পথ পরিহার করে নতুন পথ সৃষ্টির যে প্রয়াস, তাকেই আমরা বলি আধুনিকতা। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। অবশ্য ‘আধুনিক’ কথাটার বিশদ সংজ্ঞা নিয়ে ইতিপূর্বে বহু বিতর্ক—বিচার ও বাগ্‌বিস্তার হ’য়ে গেছে। তবু সাম্প্রতিক বা আধুনিক কবিতার মানসপ্রকরণ আলোচনা প্রসংগে এখানে এটুকু বলা বোধ হয় অপ্ৰাসংগিক হ’বে না যে, যে-কোনো পরিবর্তন বা নতুনরূপকেই আধুনিক বলে দাবী করা যায় না—যদি না তার পেছনে থাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেরণা। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের মূলে রয়েছে মানুষের সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস। তাই আধুনিক কবিতাকে শুধু কাব্যবোধেই নয়, যুগবোধেও আধুনিক হ’তে হবে। রবীন্দ্রনাথের উক্তি এই প্রসংগে স্মরণীয় : “যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে, সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি, এ কথা বলা চলে যে, লেখকের কাল লেখকের চিন্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করেছে।” অর্থাৎ যুগের হাওয়া এসে লেখকের মনে ঢেউ তুলবেই, তিনি যতোই আত্মকেন্দ্রিক বা অন্তর্মুখীন হ’ন না কেন।

রবীন্দ্রনাথের লিরিকমার্গ থেকে বাংলা কবিতার বিচ্যুতি ঘটেছে বহুকাল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে গেছেন। তারপর বাংলাদেশের বুকের ওপর দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মহন্তর ও মহামারীর বাড়বাগ্নি বয়ে গেছে। ফলে সমাজের বনিয়াদে সেদিন ভাঙন ধরেছিল। সেদিনের কেন্দ্রচ্যুত ক্ষয়িষ্ণু জীবন মধ্যবিত্ত মানুষের মনে এনে দিয়েছিল নৈরাশ্র আর নিরাশ্বাসের শূন্যতা—তার চারিদিক শুধু অবিচ্ছিন্ন হাহাকার আর মৃত্যুর মিছিল। যুদ্ধোত্তর সমাজ-জীবনের এই অবক্ষয় চতুর্থ দশকের বাংলা কবিতার ওপর তার করাল ছায়া বিছিয়েছিল। দৈনন্দিন জীবনের এই হতাশা, হাহাকার আর কদর্যতা কবির স্বপ্নের স্বপ্নকে সেদিন আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। তাই চতুর্থ দশকের কাব্য ছিল ভাঙনের কাব্য—সেদিনকার কবিতায় ছিল শুধু অশ্রুশাস, অবসাদ, আত্মবিলাপ আর অস্বস্তি নেতিবাদ। এই ধূসর বিবর্ণ জীবনের রিক্ততার কথা মনে করে সেদিনের কবি লিখেছিলেন :

‘আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি,
কেন মুখ গুঁজে আছো তবে মিছে ছলে ?
কোথায়-লুকাবে ? ধূ ধূ করে মরুভূমি,
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।’

(উটপাখী : স্বপ্ননাথ দত্ত)

‘ইতস্ততঃ মনের অলিগলিতে

অসমাপ্ত সাধনা ।

অজ্ঞানের রৌদ্রে জলে

দিগ্বিজয়ী কামনা ।

বেড়ায় ঘেরা বাগানে আজ

ভদ্র পদচারণা ।’ (পদচারণা)

দিনেশ দাসও কাব্যরীতিতে দুই দশকের মধ্যে পন্থী । আধুনিক মনের জটিল সমস্তা তাঁর কাব্যেও সংক্রামিত, কিন্তু বিষয়বস্তুকে ছাড়িয়ে তা এক স্বচ্ছ সৌন্দর্যলোকের দিশারী । তাঁর কাব্যে নতুন শব্দসংগ্রহের চমক নেই, কিন্তু ছন্দে, মিলে আর ধ্বনিমাধুর্যে তা স্মরণীয় :

‘এই যে খুনে সভ্যতা

অনেক জনের অন্ন মেরে কয়েকজনের ভব্যতা,

এগেয় নাকো পেছোয় নাকো অচল গতি ত্রিশঙ্কর—

হোটেলখানার পাশেই এরা বানিয়ে চলে আঁস্তাকুড় ।’ (কালো আকাশ)

রোমাণ্টিক কবিতার অপূর্ব সৌন্দর্যসৃষ্টিতেও তাঁর নৈপুণ্য বিস্ময়কর :

‘আমি যদি ওই টেউয়ের মতই

চুপেচুপে ভেঙে যেতাম তোমার দেহে

অশ্রুট গুঞ্জনে

সারাদিন—সারারাত—

আর তুমি যদি ওই নির্জন সবুজ দ্বীপ হ’তে !’ (সবুজ দ্বীপ)

বাংলা কাব্যের আংগিকে এক মৌলিক সুর এনেছেন অশোকবিজয় রাহা । গল্পের আভরণে কাব্যের এই নবসজ্জা বাংলা কাব্যসাহিত্যে নতুন আবিষ্কার । অশোকবিজয়ের মন বুদ্ধিবিনাসী নয়, প্রাণশক্তি উচ্ছল । স্বল্প কয়েকটি আঁচড়ে এত ব্যঙ্গনা, এত বর্ণাঢ্যতা শুধু তাঁর তুলিতেই সম্ভব । শুধু প্রকৃতির ছবি নয়, প্রকৃতির সন্তান যে মানব-মানবী—তাদের দুঃখ-দৈত্বে ছবিও জীবন্ত করে তুলতে তিনি সিক্তহস্ত । কখনো কখনো তাঁর লেখায় একটা mysticism-এর আভাস পাওয়া যায় :

‘স্বপ্ন দেখি

ধবধবে জ্যোৎস্নারাতে সাদা দুই বলিষ্ঠ বলদ

চাষ করে শূন্য মাঠ ।

কে যেন হঠাৎ এসে বলে,—

‘এখানে তারার চাষ হবে’...’ (তারা চাষের স্বপ্ন)

কিন্তু অশোকবিজয় শুধু স্বপ্নের মায়াগ্নন চোখে লাগিয়ে দেশের সমস্তা ও জটিলতা থেকে দূরে থাকতে চান নি, তিনিও স্বপ্ন দেখেছেন স্মৃষ্-মুক্ত সমাজের :

‘ডলু নদীর তীরে মাঠের মাঝখানে একটা মস্ত ট্রাকটর
কে চালাচ্ছে ?

হ্রদের বুক থেকে উড়ে আসে এক লাল পরি
পাখা মেলে ট্রাকটরে বসে—’ (উড়ো চিঠির বাঁক)

বিগত যুগের রোমাণ্টিক-বিমুখতার মধ্যে আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয়ে ছিলেন জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত। পঞ্চম দশকের গোড়ায় বাংলা কবিতা যখন রোমাণ্টিসিজমের পরিত্যক্ত খাত দিয়ে আবার পূর্ণবেগে প্রবাহিত হচ্ছে, এই সময় জীবনানন্দের প্রভাব তরুণতর কবিদের ওপর প্রবলভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল ; আজকের কবিরা কিন্তু সে প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সচেষ্ট। তবু কোন কোন শক্তিমান কবির লেখা আজো জীবনানন্দের সেই স্মৃতিমস্তিত বেদনার ধূসর নির্জন স্বরটুকু মনে করিয়ে দেয়। যেমন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের :

‘সময় বারিয়া পড়ে নির্জন ছপুরে—

যেখানে বসিয়াছিলে একদিন মুখোমুখী, তোমার চুলের গন্ধ
বাসি হয়ে ধুলো হয়ে উড়ে

ক্লান্ত করে দিয়ে যায় যেখানে সূর্যের গান, তোমার

আমার সেই ছোট চিলে ঘরে।’ (সময় বারিয়া পড়ে)

অথবা চিত্ত ঘোষের :

‘আকাশের ছায়া দেখে মাঝে মাঝে কখনো কখন

কোন এক সন্ধ্যাবেলা পুকুরের ছায়াতীরে এখনো কি এক হয়

আমাদের মন ?

এক হয়—এক হয়—ভরে তোলে জীবনের সবটুকু ফাঁক,

নীল জল, পুকুরের ঢালু পার, রেল লাইন, তুমি আর জলচর

ডাহকের ডাক।’ (দেখা)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় একটি সদাচঞ্চল আবেগপ্রবণ মনের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর কবিতার স্বরে শুধু ধূসর স্মৃতির ক্লান্ত কানা-কানি আর বিচ্ছেদের বিষণ্ণ হাহাকার। চিত্ত ঘোষের কবিতায় ধ্বনির মাধুর্য আর অহুভূতির স্নিগ্ধতা মনে দোলা দেয়।

সারা জীবনের সঞ্চয় চুঁহাতে বিলিয়ে দিয়ে আজ সব হারালাম, তবু জীবনের কাছে বিনিময়ে কিছু পেলাম না—এমনি আশাভংগের করুণ স্বর নরেশ গুহর কবিতায় :

‘এক বর্ষার বৃষ্টিতে যদি মুছে যায় নাম

এত পথ হেঁটে, এত জল যেঁটে কী তবে হলাম ?’

(খরজীবনের মধ্যবেলায়)

জীবনের প্রশ্ন সযত্নে তাঁর মন সততজিজ্ঞাসু এবং জীবনের অলিগলি হাতড়ে এই জিজ্ঞাসার উত্তর না পেয়ে তাঁর শাস্তি নেই :

তাঁর কবিতায় আশাবাদ কখনোই পরাজয় মানে না, স্বস্থ স্বাধীন জীবন-যাপনের স্বপ্ন তাঁর চোখে :

‘বর্গী এল দেশে ; আশুক ; তবু দেশটা সজাগ,
তবু পাতায় কচি ঘাসেই ঘোর বাঁধা এ সবুজ,
তবু সকালবেলার ধানীরঙের মন-কেমন,
তবু থাকব ঘরে ঘরের বউ, মরদ জোয়ান।’ (তবু)

জগন্নাথ চক্রবর্তী ও সমাজচেতনার মংগলাচরণের সমগোত্রীয়।

বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ চিত্রণে ‘জটিবুড়ীর নববর্ষ, ১৩৫৩’ তাঁর সার্থক সৃষ্টি :

আজো সেই ভাঙা বেড়া, শূণ্য ক্ষেত, ছিন্ন চাল

—আরো কত কাল ?’ (জটিবুড়ীর নববর্ষ, ১৩৫৩)

বলিষ্ঠ বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী আর স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যপ্রতিভার জগ্রে প্রগতিশীল লেখকসমাজে বিমলচন্দ্র ঘোষের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। কাব্যজীবনের আদিতে তিনিও ছিলেন রোমান্টিক কবি। কিন্তু প্রেমের কবিতার নায়িকা খোঁজার জগ্রে তাঁকে বিদেশী সাহিত্যের কাছে হাত পাতে হয় নি, দেশের মাটিতেই তিনি তাঁর কাব্যের প্রেরণা কুড়িয়ে পেয়েছেন :

‘সহস্র কাজের ফাঁকে স্মরণের নিভৃত মুকুরে
বার বার কাঁপে সেই মুখ,
দেবদৈত্য বিজয়িনী সেই তনুতনুর ঋজুতা,
ছুটি চোখে বিহ্ব্যতের উজ্জ্বল ভ্রমর
মনে পড়ে কুন্তলনাগিনী।’ (তিলোত্তমা)

পরবর্তী কালে বিমলচন্দ্র ঘোষের কাব্যে সমাজবোধের বিকাশ ও শ্রেণীচেতনার উন্মেষ লক্ষ্যণীয়। আংগিকের আলংকারিক দিকগুলো বর্জন করে আজ তাঁর কাব্যে সহজ ও স্বচ্ছ আবেদন অংগীকৃত। সাম্প্রতিক সাম্যবাদী কবিদের মধ্যে তিনিই আজ বিদ্রোহে সবচেয়ে দৃপ্তকণ্ঠ :

‘ক্ষুধাকে তোমরা বেআইনী করেছ
ক্ষুধিতদের আখ্যা দিয়েছ বিপজ্জনক !
উদাস্ত নরনারীর অবাঞ্ছিত শোভাঘাত্রা
তোমাদের নিশ্চিন্ত শাসনের ব্যাঘাত করে,
দুর্ভাগা লক্ষ্মীছাড়াদের চিংকারে তোমরা বিব্রত বোধ করে
হে পদমর্ষাদায় অবিষ্ঠিত মহানায়কেরা
আহা তোমাদের কী জালা
আহা তোমাদের কী কষ্ট !’ (ক্ষুধা)

তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে একদিকে যেমন প্রচ্ছন্ন ব্যংগের ছুঃসহ জালা, তেমনি আবার মর্মান্তিক বেদনার সক্রপণতা।

স্বকান্ত ভট্টাচার্য এই দশকের কাব্যজগতে এক আশ্চর্য আবিষ্কার। তিনি এ যুগের তরুণতম কবি হলেও তাঁর কবিতার আবেদন আজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রসারিত। বাংলাদেশের পাঠকেরা স্বকান্তর কবিতা ভালবাসে 'তার বলিষ্ঠতার জগ্ন, অকুতোভয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার জগ্ন, সামাজিক শোষণ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্থম্পষ্ট প্রতিবাদের জগ্ন, গভীর স্বদেশ-প্রেমের সংগে প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সমন্বয়ের জগ্ন'। ১৩৫০-এর ছুড়িঙ্গ আর মৃত্যুর আশুনে বলসে যে কালাস্তর নতুন মূল্যবোধের দাবী নিয়ে এল, তার সার্থক প্রকাশ সেদিন দেখা দিয়েছিল বাংলার কনিষ্ঠতম কবির কণ্ঠে। সাধারণ মানুষের সংগে এমন একাত্ম হবার অনুভূতিকেই বোধহয় মাও-সে-তুং বলেছেন: 'transformation of sentiments, a changing over from one social class to another'। স্বকান্তর জীবনবোধের প্রতীতির সংগে তাঁর কবিসত্তার অচ্ছেদ্য সাযুজ্য তাঁর কবিতাকে মহত্তর সার্থকতা দান করেছে এবং নতুন মূল্যজ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কবিতার অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রকাশভংগী—গঠনমূলক সৌন্দর্যসৃষ্টির সংগে সহজ অথচ দৃষ্ট বাক্‌বিছাসের সমন্বয় এক অপূর্ব ঝংকারের সৃষ্টি করে। স্বকান্ত বিপ্লবী কবি, তাঁর বিদ্রোহী সত্তা আশাবাদের শিখায় সতত প্রজ্জলিত :

'ভারতবর্ষের'পরে গলিত সূর্য বারে আজ—
দিশিদিিকে উঠেছে আশুয়াজ,
রক্তে আনো লাল,
রাত্রির গভীর বৃত্ত থেকে ছিড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।
উরুত প্রাণের বেগে উন্মুখর আমার এ দেশ,
আমার বিশ্বস্ত প্রাণে দৃঢ়তায় এসেছে নির্দেশ!" (বিবৃতি)

মথবা,—

'অদূর দিগন্তে আসে ক্ষিপ্রদিন জয়োন্মত্ত পাখা,
আমার দৃষ্টিতে লাল প্রতিবিম্ব, মুক্তির পতাকা ;
আমার বেগাঙ্ক হাত, অবিরাম যন্ত্রের প্রসব,
প্রচুর, প্রচুর সৃষ্টি ; শেষ বজ্র সৃষ্টির উৎসব।' (শত্রু এক)

স্বকান্তর সক্রম অকালমৃত্যু তাঁর কাব্যজীবনে আকস্মিক ছেদ টেনে দিয়েছে। তবু জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম করে গেছেন উৎপীড়িত জনগণের হাতে হাত মিলিয়ে। নির্ধাতিত মানুষের জগ্ন শাস্তি-নীড় রচনার ঐকান্তিক ইচ্ছা তাঁর কণ্ঠে ভাষা দিয়েছে :

'চলে যাবো—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাবো আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অংগীকার।' (ছাড়পত্র)

এই রোমান্টিক-প্রবণতার যুগে আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয়ে আছেন এঁরা—সুকান্ত-জগন্নাথ-বিমলচন্দ্র-মংগলাচরণ। যদিও চলতি দশকের তরুণতম কবিদের ওপর রোমান্টিক কাব্যের প্রভাব আজ সবচেয়ে শক্তিশালী, তবু বাংলার বিক্ষুব্ধ জনমনে সাম্যবাদী কবিগোষ্ঠীর আবেদন আজ ক্রমবর্ধমান এবং বাংলা কবিতার এই দ্বিধাবিভক্ত ধারাকে কেন্দ্র করে কাব্য-উপাসকেরা পৃথক শিবিরে বিচ্ছিন্ন। নয়া চীনের অভ্যুদয়, নবগঠিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, দেশব্যাপী অসন্তোষের আলোড়ন এবং মায়াকোভ্‌স্কি-সিমোনভ-আরগ-নেকদা-নাজিম হিকমতের কবিতার সংগে পরিচিতির অপরিহার্য পরিণতিতে বাংলা কাব্যজগতের ওপর রাজনীতির ছুঁবার প্রভাব ক্রমেই প্রবলতর হয়ে উঠছে। ফলে বাংলা কবিতার বর্তমান রোমান্টিক-প্রবণতার স্থায়িত্ব অথবা পরবর্তী যুগের বাংলা কবিতার ধারা সম্বন্ধে এখন কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা দুঃসাধ্য—সে ধারারূপে আগামী যুগের কাব্যরসপিপাসুদের বিচার্য।*

দেখা

হীরেন চক্রবর্তী—ষষ্ঠ বর্ষ, আর্ট্‌স্

তীক্ষ্ণ কঠিন তীর মদির তিক্ত মধুর চৈত্রে
এই বুঝি ঐ মিথুন ছুটির কৈশোরে অস্থিষ্টি।
মস্তো জুপুর একলাভাবার, গহন রাতে বৃষ্টি :
কী খোঁজে ঐ ছেলেটির চোখ, বিপুল ব্যথায় পূর্ণ ;
কী যে মেয়ের চাওয়া ছিলো,—ভক্তদেরই দৈন্য।
অবশেষের দেখায় তারা পেলো মানসমিত্রে।

তীক্ষ্ণ কঠিন তীর মদির তিক্ত মধুর চৈত্রে
কাছে আসার প্রবল টানে ভালোবাসার ইচ্ছে
স্বর্গে যাওয়ার আকাশ নিলো ; সময়-ভরা মূর্ছা
হাওয়ায়-হাওয়ায়, অন্ধকারে, জলের গানে কীর্ত্তি।
কান্না-পাওয়ায়, স্তম্ভে-থাকায় গন্ধে ভরে শূন্য।
অবশেষের দেখায় ছুঁজন পেলো মানসমিত্রে ॥

* রচনাটিতে যে দশকগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি বাংলা সাল অনুযায়ী।

বৃষ্টিশেষের বিকেল

সুশীল ঘোষ—ষষ্ঠ বর্ষ, আর্টস্

বৃষ্টিশেষে উধাও মেঘ আকাশ চূপ নীল
মলিন দিন স্নানের শেষে হাসিতে ঝলমল
রূপালী রোদে হৃদের জলের হৃদয় টলমল
মেঘের ঘরে বন্ধ হলো খিল ।
এবার তুমি জানালা খোলো, আকাশে চোখ তোলো
হলুদ আলো তোমার চোখে, রমধনু রঙ আলো
মিতেনী আহা, লুটিয়ে বুঝি পড়ে
তোমার কালো এলো চুলের 'পরে,
ছাখো না চেয়ে ছুপুর পরে রোদেরো যেন সহেলী হয়ে এলো ।
মেঘের ঘরে বন্ধ হলো খিল
বৃষ্টিশেষ, আকাশ কেমন নীল ।

আকাশ কেমন নীল !
রক্তলাল কৃষ্ণচূড়ায় রঙের বিলিমিল ।
গাছেরা সব নেয়ে সবুজ, খুসীতে আকুল হাওয়া
তোমার গালে নরম হাত বুলিয়ে চলে গেলো ।
আকাশে খুসী, বাতাসে খুসী, খুসীতে গান-গাওয়া
বৃষ্টি-ধোয়া সবুজ বিকেল সোনার নায়ে উজান বেয়ে এলো ।
হৃদের জলে এখন বিকেল হলো
গাছের পাতা মনের রঙে ছাওয়া
খুসীতে আকুল হাওয়া ।
বলোনি তুমি, বলো না এবার বলো
তোমার মনের সোনার হরিণটিরে
কেমনে যায় পাওয়া ।

সুধা-সন্ধ্যা

শিশিরকুমার দাশ—৩য় বর্ষ, আর্ট্‌স্

এত মন্থন তবুও অমৃত বারে না কই !

প্রশান্তনীল সাগর সলিল উছসি' ওঠে

এ বিষের জালা আর কতদিন হৃদয়ে বই !

নিঃশ্বাসি' বিষবায়ু এই প্রাণ ধূলায় লোটে,

শোণিতে সিক্ত মমতাবিহীন মরুর মাটি ;

আবেগে অন্ধ ছুটেছি : অমৃত যদিবা জোটে !

কত যুগান্ত হ'ল আরো কত যাবে বা কাটি'

বনের গহনে মায়াবী মরণ তুলেছে ফণা

তবু পাবো তা'কে তাইত' চলেছি পথেতে হাঁটি ।

শিহরিত হয় কৃষ্ণপক্ষে কুমন্ত্রণা

তারা নিভে যায় মন্থরগতি মেঘের রাশে

জ্যোতিহীন পথ : তবু যদি মেলে অমৃত কণা ।

শাণিত দন্ত স্বাপদেরা আজো হিংস্র হাসে

কত নদীহৃদ পার হয়ে আমি এসেছি কবে

তবু তারা আজো মৃত্যুর বিষ সাথেতে আসে ।

বিরাত বেদনা ব্যাপ্ত আকাশে—বক্ষে লবে'

কে আজ বহন করবে নিবিড় বিষের জালা

নীল সমুদ্র কত উতরোল আরো বা হবে !

এত মন্থন তবুও অমৃত বারে না কই !

প্রশান্তনীল ফেনিল সলিল উছলি ওঠে

এ বিষের জালা আর কতদিন হৃদয়ে বই !

দেখ, দিগন্তে সোনালি সন্ধ্যা, রাত্রি নামে

সেখানে শান্তি, আকাশ-আশিস অমৃত বারে

দিনের ক্রান্ত ক্রিষ্ট তরুণী সেখানে থামে ।

সেখানে শান্তি, আকাশ-প্রসাদ অমৃত বারে

এখানে বিষের ভীষণ নিবিড় কি যে সে জালা

নিঃশ্বাসি' বিষ-বিলাসী বাতাস মাহু মরে ।

তাইত' বুকের জালা দিয়ে গাঁথি জীবন-মালা
 আধারেই চলি যোজনবিহীন পথের ধারে
 মৃত্যুর মেক পার হয়ে পাবো স্খার ডালা।

কাঁপুক রাত্রি তবুও যাত্রা সাগরপারে
 এত প্রাণ দিয়ে মছন যার এদিনও চলে
 তা'কে পেতে চাই বিষ-কুঞ্চিত প্রাণের দ্বারে।

আরো মছন, হোক আরো জোর সাগরজলে
 নিঃসীম নীল আকাশ হতেই বরবে মধু
 পিষুষ-পিয়াসী পৃথিবীর প্রাণ-পর্ণ দলে।

শুঁয়োপোকা

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—দ্বিতীয় বর্ষ, আর্ট্‌স

জমাদার এসেছে!

কথাটা বিদ্বাতের মত চারদিকে রটে গেল। এ বাড়ি, ও বাড়ি; এ কোণ, সে কোণ থেকে অনেকেই এসে ভীড় করল উঠোনে। বাপ বাপ করে খুলে গেল জানলার পাল্লা। ছাদের কানিসে উঁকি মারলো নানা আকারের অনেকগুলো মাথা।

আজ বুড়ো মানুষের দাঁতের মত নড়বড় করছে দন্তদের বাড়ি। কিন্তু এককালে ওরও যৌবন ছিল, শ্রী ছিল, ছিল ছাঁদ। বনেদী পরিবার। টাকা নেই, কিন্তু মান যায় নি তাই বলে।

উঠোনটা ছোট্ট। তার একদিকে বড় শরিকের কল, চৌবাচ্চা আর পায়খানা। অল্প-দিকে তালা লাগানো রান্নাঘর। সামনে বেশ কিছুটা জমি। একটা বিরাট শিউলীগাছ অসংখ্য ডালপালা মেলে তার আধখানা অংশ জুড়ে আছে। বাকি আধখানায় গোটা আঠেক কলা আর এক বাড় চীনে জবা ছড়ানো।

চার দিকে শুধু বাড়ির পর বাড়ি, ইটের পর ইট। সূর্য চোখে পড়ে না। মধ্য কলকাতার যান্ত্রিক পরিবেশে এই একফালি সবুজ জমি দেখলে সত্যিই অবাক লাগে। গ্রামের কথা মনে পড়ে যায়।

তাই অনেক ইতিহাস আছে এখানকার, বিশেষ করে শিউলী গাছটুকুর।

জমাদার এসেছে, কে যেন বললে আবার।

আরো অনেকে ছুটে এসে ভীড় করল উঠোনে। তারপর অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকাল পরস্পরের দিকে।

গিন্নী দাঁড়িয়েছিলেন চৌবাচার গা ঘেঁষে। কপালে মাথায় টকটকে সিঁদূর। লাল রঙের চওড়া পাড় সাড়ি। মাথার চুলে পাক ধরেছে। অপলক চোখে গাছটার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

ফেলু আর জিতে দু' গাছা মজবুত রসি এনে বেঁধে ফেলেছে গুঁড়ি। তারপর মুখ ধরে চলে গেছে দূরে, দুই কোণে। গাছটা ভেঙ্গে যেন মাঠের ওপরেই পড়ে, পাশের বাড়িতে নয়—তাই এই সতর্কতা। ঠিক কুড়োল নয়, কাঁটারিও নয়—অদ্ভুত ধরণের একটা দা এনে গাছের গোড়ায় কোপ দিচ্ছে জমাদার।

অথচ ভাবতেও কেমন অবাক লাগে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এই গাছ কাটা হবে কোনদিন, কি কাটা হচ্ছে আজ। বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে এসে প্রথমেই যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, এই গাছটাও তাদের একজন। বুড়ির মধ্যে ওরই তলায় দাঁড় করিয়ে ছুধে আলতা সেরে বৌ বরণ করেছিলেন শ্বাশুড়ী। কথায় কথায় বলেছিলেন : বোমা! তোমার শ্বশুর এ বাড়ির ভিত্তিস্থাপন আর শিউলীর চারা রোপণ একই দিনে করেছিলেন। এ গাছের ছাউনী আর এ বাড়ির আশ্রয়ও একই দিন পাচ্ছ। ভুলোনা এ কথা।

অন্নদা নিজেও ভোলেন নি তা। মাথার চুল প্রায় নেড়া। একটা ছেঁড়া ময়লা খান কোন রকমে কোমরের সঙ্গে লেগে আছে। পিঠটা ধনুকের মত গামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না তিনি। কোটরে বসা চোখের চারপাশে ঝুলছে মুখের চামড়া। কপালে গভীর রেখা। একটিও দাঁত নেই। হাত-পা সৰু। কথা বলতে কষ্ট হয়, দৃষ্টি শক্তিও কমে এসেছে।

ছাদের ওপরেই আছে এক চিলতে কুঠুরী। বুড়ীর আস্তানা আর রাখামাধবের মন্দির! পূজা করছিলেন, গোলমাল শুনে বেরিয়ে এসেছেন।

কোনদিকে একটানা একটুখানি তাকালেই বুড়ির চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। লাগার মত চটচটে জল পড়ে। অন্নদা ধরে ধরে আলসের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে রইলেন নীচের দিকে।

সে দিন জমিটা ছিল উত্তর দিকে ছড়ানো। স্বামী হরিদ্বার থেকে তীর্থ করে এলেন। সঙ্গে অনেক কিছু আর একটা শিউলীর চারা। বললেন : অন্ন, ধর্মস্থানের স্মৃতি। আমার মাটিতে বেড়ে উঠবে। ছায়া দেবে, ফুলও। পাণ্ডা বলছিল একটা অশুখ গাছের শেকড় আনতে। কিন্তু আমি রাজি হই নি।

স্বামী ছিলেন বিলাসী। জমিদার বংশের ছেলে। গান ভালবাসতেন, কবিতাও লিখতেন। গাছটা তাঁর কাছে নিছক বিলাসিতা বা সৌন্দর্যচর্চার উপকরণ হলেও অন্নদার কাছে ছিল তা ধর্মের উপাদান। এমনকি এই বয়েসেও।

আজ সেই জমি ছোট হয়েচে ক্রমাগত। নতুন বাড়ি উঠেছে অগ্ন লোকের। ভেঙ্গে পড়েছে নিজেদের ভিটে। কিন্তু আজও তিনি শিউলীর ফুলে বাধা-মাধবকে না সাজিয়ে জল গ্রহণ করেন না। শরীরগতিকে যেদিন সিঁড়িভাঙ্গা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, সেদিন থেকে তিনি নাতি দুটোকে অল্পনয় করেছেন রোজ দুটো ফুল এনে দেবার জন্তে। কিন্তু ওরা এতটুকু সম্মান করেনা তাদের ঠাকুরমাকে। হাসে, ব্যঙ্গ করে, গালাগালি দেয়। ঠাকুরের ফল চূরি করে খেয়ে নিলে অন্নদা যখন ছেলেকে বলে দেবার কথা বলেন, তখন এমন কি বুড়ীকে মারার ভয়ও দেখায় তারা। সেই থেকে পাড়ারই দুটো একটা ছেলেমেয়ের সঙ্গে তিনি আপোষ করেছেন। তারা পরের বাড়ি ফুল তুলতে আসে। বাধ্য হয়েই কিছুটা ভাগ দেয় বুড়ীকে। কারণ ফৈলু আর জিতে নিজেরা ঠাকুরমাকে মানে না, কিন্তু অগ্ন কেউ তাঁকে অসম্মান করলে ছেড়ে দেবার পাত্র তারা নয়। অন্নদাও তাদের আদর করে বসান। ফুল দেওয়া নেওয়া হয়ে গেলে খেতে দেন ঠাকুরের প্রসাদ।

এ বাড়ি ও বাড়ি, এ পাড়া সে পাড়ার ছেলে মেয়েগুলো বৃকে হাত চেপে রুদ্র নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে ছিল। শ্রাবণের মাঝ থেকে মাঘের গোড়া পর্যন্ত রোজ সকালে এ বাড়িটায় বেন মহোৎসব পড়ে যায়। মাটিটা ভরে ওঠে সাদা ফুলে। আর তারা আসে দল বেঁধে। ফুল কুড়ায়, ঝগড়া করে নিজেদের ভেতর, আড়ি দেয় চিরতরে। আবার ভাব। একজন গাছে উঠে ঝাঁকানি দেয়, আর সবাই ফুল তোলে। তার সাজিতেও দিয়ে দেয় কিছু। শুঁয়োপোকা লাগলে ঝাঁশ ছাড়ায় যত্ন করে।

ছলছল করছিল পাশের বাড়ির মিঠুর চোখ। সে ভেবেছিল এবার ফুলের বোটা ঝুকিয়ে বাসন্তী রঙে তার সাজি ছুপিয়ে নেবে। তারপর সরস্বতী পূজোর সময় তাদের ঝাবের ফাংশনে গাইবে সেই “গোড়ে গোড়ে”র বাংলা গানখানা।

কিন্তু খুব খুসি হয়েছে চন্দন, মিঠুরার বছর চারেকের ভাই। ঘুড়ি ওড়ানোয় শিক্ষা-মবিনী করছে সে। কিন্তু একটুখানি উঠেই তার ঘুড়ি রোজ আছাড় খাবে ঐ শিউলী গাছের মাথায়। টকা দিয়ে দিয়ে কখনো তা ছাড়ান যায়, কখনো যায় না। স্ততো ছিঁড়ে গেলেই ফৈলু আর জিতে লকা মেরে, গাছে উঠে তা পেড়ে নেয়। বলে, এতো কাটা ঘুড়ি। কেন দেব ?

আর সে ভয় রইল না।

পাঁড়েও খুসি। সাত মহল্লার ক্ষুদে শয়তানরা বছরের কটা মাস মিত্যি ভীড় জমাবে এ বাড়িতে। গৃহকর্তার ঘুম তখনো ভাঙে না বলে দরজাও খোলা থাকে না। পশ্চিমের পাঁচিল টপ্কে এরা মাঠে ঢোকে। ভাঙ্গা দেয়াল আরো ভেঙ্গে যায়। মনিব গালাগালি করে পাঁড়েকে। ভোর রাতে ঘুম থেকে উঠে পাহারা দেয় সে। তবু কি বিছুদের সঙ্গে পারার যো আছে ?

আর সে সতর্কতার প্রয়োজন থাকবে না।

এবং উল্লাস পাশের বাড়ির মোক্ষদা বামনীর। মাগো। গাছটায় ফি বছর গোটা ছয়েক কাক বাসা বাঁধবেই। ডিম পাড়বে, বাচ্চা হবে। আর সেগুলোর জালায় মাছের কাঁটা, মাংসের হাড়, বাঁটার কাঠি এবং এ ও তা ছিটকে পড়বে চারপাশে মোক্ষদার বারান্দায়, আধ শুকনো সাড়িতে এবং নয় কোথায়? আর ছেলে মেয়েগুলোর হৈ-হুল্লায় রোজ সকালে যে তিনি একটু মন দিয়ে মালা জপ করবেন, তাও কি পারেন? বছরদিন তিনি সব অনাস্থির মূল এই গাছটাকে মনে মনে গাল দিয়েছেন। কিন্তু এভাবে যে তার মূলোৎপাটন হবে, তা যেন ভাবতেও পারেন নি কখনো।

শিউলী গাছের আধখানা মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে নতুন ওঠা চাকর সরকারের বাড়িতে। স্ত্রীবিধে এবং অস্ত্রবিধে—দুইই তাদের সমানে ভোগ করতে হয়। তাদের উঠোনও ফুলে সাদা হয়ে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে আসে শুঁয়োপোকা। একটা নয়, দুটো নয়। অজস্র। সাড়ি মেলা থাকলে, জুতো শুকোতে দিলে, চুল বাছতে বসলে—কখন কোথা থেকে যে ওরা এসে ভেতরে সঁধোয়, তা টের পায় কার সাধ্য। দেয়াল বেয়ে এগিয়ে ওরা বিছানা, আলনা এমন কি মাঝে মাঝে রান্না ঘরে পর্যন্ত ঢুকে পড়ে। কারণ ছোট জায়গায় বড় বাড়ি। সবই গায়ে গায়ে।

আর তাই প্রায়ই চাঁচামেচি ওঠে চাকরসরকারের বাড়িতে। ছেলে বুড়ো, মেয়ে, পুরুষের। শুঁয়ো আঁশ লেগেছে। পোড়া রেড্ বা বুড়ো শিউলী পাতা দিয়ে জায়গাটা চেঁছে ফেলা হয়। তবু লাল হয়ে ফুলে ওঠে সেখানটা।

কিন্তু ততটা অস্ত্রবিধে নেই নীলাশ্বর দত্তের। কারণ জমি আর গাছ থেকে তাঁদের আন্দর কিছুটা দূরে। তাছাড়া বড় শরিকের কল, পায়খানা, চৌবাচ্চা আর রান্নাঘর তো ব্যবহারই করা হয় না।

কিন্তু তবু তাঁরা রেহাই পান না। বিশেষ করে ঘুড়ি ধরতে আর কাকের বাসা ভাঙতে গিয়ে ফৈলু, জিতে প্রায়ই আহত হচ্ছে। এমন কি শেষে একদিন জরও করে বসল তারা।

চাকর সরকার ঠাট্টার ছলে অভিযোগ করেন : মশাই, আপনার গাছের জঞ্জ আমরা পরিবার শুদ্ধ ভুগে মরব নাকি? দিন জঙ্গল সাফ করে।

একদিন ফৈলু আর জিতেও ধরে বসল নীলাশ্বরকে : বাবা, সকলেই বলছে গাছটা কেটে ফেল।

শুনে খুব রেগে গেলেন নীলাশ্বর বাবু, ধমক দিলেন ছেলেদের, গাল দিলেন প্রতিবেশীকে। কিন্তু তার কদিন পরেই স্ত্রী সৌদামিনী একই অভিযোগ জানালেন শুঁয়োপোকাকার নামে। এ অত্যাচার চিরকাল আছে। চাকর সরকার না হয় নতুন, ছেলে দুটো না হয় বকাটে। কিন্তু তিনিও যেন আজ আর সইতে পারছেন না। শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন নীলাশ্বর বাবু।

তার কদিন পরেই পিঠ চুলকোতে চুলকোতে শুঁয়োপোকাকার চোদপুরুষকে গাল দিয়ে নীলাশ্বর জানালেন : না। গাছটা কেটে ফেলাই ঠিক করলাম।

গাছ কাটা মোটামুটি সারা। এখন দড়ি ধরে টান দিলেই তা ভেঙ্গে পড়বে। ফৈলু একটা খেলনা মশাল জ্বালিয়ে ছুটে এল। গাছের ডালে জয়গায় জয়গায় আলপনার মত চাক বেঁধে রয়েছে অজস্র শুঁয়োপোকা। উপনিবেশ বেঁধে। জমাদারের অস্থির আঘাতে দু-একটা ছিটকেও পড়েছে মাটিতে। জিতে জুতোর তলা দিয়ে চেপে চেপে সেগুলো মারতে লাগল। আর ফৈলু এগিয়ে দিল তার মশাল এক একটা চাক লক্ষ্য করে। পটপট করে লোম পোড়ার আওয়াজ হল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে কুঁকড়োনো এক একটা ছাড়া শুঁয়োপোকা মরে ঝরে পড়তে লাগল নীচে। কেমন একটা কটু গন্ধ উঠল চারপাশে।

সৌদামিনী এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। ছেলে দুটো ফুঁতিতে ঘেন লাফাচ্ছে। কিন্তু ওরা এত প্রাণ পায় কোথা থেকে ?

নিয়মিত খাওয়া নেই। বাড়িতেতো সকাল বিকেল থাকেই না। ছপুর কিংবা রাতেইবা সৌদামিনী কি এমন অমৃত তুলে দেন তাদের পাতে! সঙ্গতির অভাবে দিনে বাজার আনছেন এক টাকার, আর কেড়ে নিচ্ছেন স্বামী পুত্রের স্বাস্থ্য। তাই অনেক ভেবে গাছ কাটায় সম্মতি দিয়েছেন সৌদামিনী। উত্তুরে বাড়ির বাঙালদের সঙ্গে গোপনে ব্যবস্থা তিনি করেছেন। এই গোটা মাঠে চাষ করে দেবে তারা। ফলনের সামান্য তাদের ভাগ দিলেই চলবে। আর বাকিটা সৌদামিনী তুলে দেবেন তাঁর পুত্র এবং স্বামীর পাতে। দিনে এক টাকা করে বাঁচবে, মাসে তিরিশ, বছরে তিনশো ষাট। আদালত থেকে সময় দিলে বছর তিনের মধ্যেই ধার শোধ করে বড় শরিকের হাত থেকে এ বাড়ির অর্ধস্বত্ব আবার ফিরে পাওয়া যাবে। তাছাড়া টাট্কা সব্জি, যা পচা মাছ আর অপুষ্টিকর খাওয়ার সব বিষক্রিয়া গুণে দেবে। এবং হয়তো ফিরিয়েও দেবে তাঁর প্রিয়জনদের স্বাস্থ্য।

কিন্তু তখনই অল্প কথা ভাবছিল ফৈলু। জিতে তার কাণে কাণে চাপা হাসির সঙ্গে বলল: দাদা, শালা শুঁয়োপোকাকার নামে বাবাকে বেশ জুক্ দিলি মাইরি। ব্যাডমিন্টন খাউণ্ডটা কিন্তু পশুই ঠিক করে ফেলতে হবে। সুখনদা বলছিল ওদের ক্লাবের সুরাইয়া টুর্নামেন্টের...

চুপ্‌মার। ফিশফিশিয়ে তর্জন করল ফৈলু: বাবা আস্চে।

ওরে ছেড়েদে, এবার ছেড়েদে তোরা। নীলাধর দত্ত ছেলেদের বললেন: আর কত মারবি? জমাদারের দেবী হয়ে যাচ্ছে।

ফৈলু হঠাৎ বাধ্য ছেলে হয়ে গেছে। এক কথায় সে মশাল নিয়ে সরে গেল। নীলাধর বাবু মনে মনে ভাবলেন এই শুঁয়োপোকা মেরে আর কি সুরাইয়া হবে? আসল শুঁয়োপোকা—যা তাঁর দেহ নয়, বুককে দংশন করছে—তার খবর কি রাখে এই শিশুরা?

দড়ির এক মুখ ধরেছে ফৈলু আর জিতে, অল্প মুখ জমাদার নিজে। উঠোনের এদিকে সরে এসেছে ভীড়টা। জানলা, ছাদ আর চারপাশে উত্তেজিত আলোচনা। এইবার, এইবার সব শেষ হয়ে যাবে।

সব শেষ হয়ে যাবে! নীলাশ্বর বাবু ভেবে পেলেন না কি জবাব তিনি দেবেন স্ত্রী কাছে, কি বোঝাবেন তাঁর ছেলেদের। কেমন করে জানাবেন আদালতের রায় তাঁদের বিপক্ষে গেছে। বড় শরিক অধিকার পেয়েছে গোটা বাড়িটার। গৃহত্যাগের জ্ঞান দয়া করে সম দিয়েছে একমাস। নীলাশ্বর শেষ সম্বল এই জমিটুকু বিক্রি করে কিনেছেন গোয়াবাগানের এ বস্তী, নিজেরা থাকতে পারবেন, আর পাবেন ভাড়া। প্রাণ ধারণের দিন তো বহুকাল গেছে এবার যদি জীবন যাপন করা যায় কোনরকমে। নতুন মালিকের সঙ্গে চুক্তি মতই গাছ কাটতে সাফ করে দিতে হচ্ছে এই জমি। অথচ—আর একটু সময় যদি পেতেন, ছেলেগুলো যা হওয়া অবধি যদি...

সামাল সামাল। টেঁচিয়ে উঠল ফৈলু।

আঃ সরে যা, সরে যা না তোরা। বলল জিতে।

জমাদার ভাষাহীন চীৎকারে হাঁক দিয়ে উঠল তারপর দড়ির টানের সঙ্গে সঙ্গেই মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়ল গাছটা।

সৌদামিনী তাকালেন নীলাশ্বরের দিকে, নীলাশ্বর তাকালেন সৌদামিনীর দিকে। তারপর দুজনেই মুহূর্তের জ্ঞান ঘাড় নাবিয়ে তাকালেন ওপর দিকে। ছাদের আলসেয় ধলুকের মত বেকে তখনো বুড়ী অন্নদা দাঁড়িয়ে। মরা মাছের মত ঘোলাটে চোখ দুটো মেলে তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নীচের দিকে!

আমেরিকা আবিষ্কার

(অনুবাদ গল্প)

অরুণাভ দাশগুপ্ত—দ্বিতীয় বর্ষ, আর্টস

‘তীর খুবই কাছাকাছি এসে পড়েছে,’ মান্ডলের চুড়ো ঘেঁসে যে-নাবিকটি দাঁড়িয়ে, তার উল্লসিত কণ্ঠ সারা জাহাজটাকে বাঁকুনি দিল বেগে।

কত না শ্রম আর নাটকীয়তায় এ-অভিযানের প্রত্যেক অঙ্গ রসোজ্জ্বল; কলঘাস ভাবেন, এসব আজ থেমে যাবে। অদূরে স্থল রেখায়িত রূপ নিয়েছে। কম্পিত হাতে কলঘাস দূরবীণ চোখে লাগালেন।

‘বেশ বড় একসারি পর্বত দেখতে পাচ্ছি,’ কলঘাস সঙ্গীদের বললেন, ‘কিন্তু কী আশ্চর্য ওদের গায়ে যেন অসংখ্য জানলা তৈরী করা! এমনতরো ব্যাপার এই প্রথম চোখে পড়ল।’

‘নেটবরা মৌকো করে আসছে,’ অদূরে কোন নাবিকের উত্তেজিত স্বর শোনা যায়। পালকভরা টুপি হাওয়ায় উড়িয়ে জাহাজের সবাই একজোট বাঁধল ডেকে। তাড়াহুড়োতে ওদের অস্বাভাবিক ভারী পোষাক বেগ দিল বড় কম নয়।

দু'জন নেটিব জাহাজে পৌঁছেই বেশ বড় একথণ্ড কাগজ তুলে দিল কলম্বাসের হাতে, নিঃশব্দে। আশ্চর্য সবুজ পোষাক তাদের পরণে।

‘তোমাদের দেশ আমি আবিষ্কার করতে চাই’, কলম্বাসের কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত গর্ভ, ‘স্পেনের রাণী ইসাবেলার নামে এই নতুন দেশ....’

‘তাতে কী যায় আসে,’ একজন নেটিব তাঁকে থামিয়ে দিল তাড়াতাড়ি, ‘প্রথমে আমাদের এই প্রশংসার সঠিক উত্তর লিখে দিন। আপনার নাম, উপাধি, বিয়ে হয়েছে কী হয়নি, আপনার দেশ ও জাতি সম্পর্কীয় খুঁটিনাটি তথ্য—সবই লিখবেন। আমেরিকান সরকারকে খামনিচ্যুত করবার কোনরকম মতলব আছে আপনার এবং আপনি কী পুরোপুরি নিবোধ, এসবেরও নিভূর্ল উত্তর প্রয়োজন।’

কলম্বাসের মনে ততক্ষণে যুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু অবিলম্বে শান্ত করলেন তাঁর মনকে, কারণ বুদ্ধিতে তিনি নেহাৎ কাঁচা নন।

‘নেটিবদের ক্ষেপিয়ে তোলা আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না,’ কলম্বাস সঙ্গীদের দিকে ফিরলেন, ‘ওরা ছোট্ট ছেলেদের মতো। হয়ত বা ওদের অদ্ভুত নিয়ম-কানুন থাকতে পারে। অভিজ্ঞতা হোক, পরে সব বোঝা যাবে।’

‘রিটার্ন-টিকিট আর পাঁচশ’ ডলার আছে আপনার?’ নেটিবটি ভাবান্তর দেখাল না।

‘ডলার! ডলার কাকে বলে?’ কলম্বাস রীতিমত বিস্মিত হন।

‘এইমাত্র প্রশ্নোত্তরে বললেন আপনি নিবোধ নন, আবার পরক্ষণেই বলছেন ডলার জানিনে। এদেশে আসবার পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে আপনার, কোন মতলব?’

‘আমি আমেরিকা আবিষ্কার করতে চাচ্ছি।’

‘ভালো কথা, আপনি বিজ্ঞাপন চাচ্ছেন?’ নেটিবটি বিজ্ঞাপন কথাটির ওপর যথেষ্ট জোর দিল।

‘বিজ্ঞাপন!’ কলম্বাসের চোখে মুখে বিষয় ফুটে উঠেছে। এমনতরো কথার সঙ্গে তিনি আজন্ম অপরিচিত।

নেটিবটি তাঁর পা থেকে মাথা অঙ্কি চোখ বুলিয়ে নিল নিঃশব্দে। তারপর হতাশস্বরে জিজ্ঞেস করল, ‘বিজ্ঞাপন বুঝতে পারছেন না?’

—‘না।’

‘তবুও আপনার আমেরিকা আবিষ্কার করার বাসনা! আপনার সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, চলি।’ নেটিবটি ঘুরে দাঁড়াল।

‘মানে আপনি আমায় অতটা ক্ষমতাবান মনে করেন না, এই তো?’ তাঁর স্বরে গৃহতা আর অসহায়তা একই যোগে প্রকাশ পেল।

কিন্তু নেটিবটি অনেক এগিয়ে গেছে তখন। মুছ ভাবে, যেন আপন মনেই, বলছে, ‘বিজ্ঞাপন বাদে উন্নতি অসম্ভব।’

এতক্ষণে ছোট্ট জাহাজগুলো বন্দরে ভিড়তে শুরু করেছে। এখানকার শরৎঋতু মন-মাতানো। আকাশে সূর্য দীপ্তিময়, 'সী-গাল'রা পোতের চারিদিকে ঘুরঘুর করছে। নতুন দেশে প্রথম পদার্পণেই কলম্বাস চমকিত হলেন। তাঁর এক হাতে দুর্গভ স্পেনিশ প্যাকেট, ভরসা ছিল, ওর বদলে সোনা বা হাঁতির দাঁত মিলবে অনায়াসে। অগ্র হাতে স্পেনের জাতীয় পতাকা। যেদিকে তাকান, মাটি তাঁর নজরে পড়ে না, শুধু পাথর, কংক্রিট, লোহা অজস্র ধারে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। পুরনো ইউরোপে ঘাস গাছপালার সঙ্গে কলম্বাসের পরিচয় আজীবন এবং অন্তরঙ্গ; এখানে সে-সবুজ সৌন্দর্যের অভাষমাত্র নেই।

একদল নেটিব, হাতে তাদের পেন্সিল, নোটবই আর ক্যামেরা, কলম্বাসের গা ছুঁতে চলে গেল। কাছাকাছি কোন জাহাজ থেকে এইমাত্র বিখ্যাত এক বন্ধার নেমেছে, সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল। নবাগত নেটিবটির কানজুটো ফুলকপির মতো বিরাট, নাকটা আশ্চর্যকর ভোঁতা। আশেপাশের উৎসাহী নেটিবরা তার প্রত্যেক কথা লুফে নিচ্ছে।

অথচ, কলম্বাস ভাবেন, তাঁর দিকে কারো সামান্য নজর নেই। শুধু কজ-লিপষ্টিক-পাউডার ভূষিত দুই নেটিব তরুণী তাঁর সামনে এগিয়ে এল।

—'বহুরূপীটিকে তো চেনা যাচ্ছে না!' একজনের ব্যঙ্গ।

'মনে হচ্ছে কোন স্প্যানিশ রেস্টোরাঁর জীবন্ত বিজ্ঞাপন!' আরেকজনের বাঁকা হাসি। তারপর তারাও সেই বন্ধার নেটিবটির আকর্ষণে দ্রুত ভিড়ে মিশে গেল।

প্রত্যেকেই নিজের কাজকর্মে ব্যস্ত। তারা যে আবিষ্কৃত হয়েছে, সে-সত্যের দিকে তারা নিলিপ্ত, অক্ষিপহীন।

একজন নেটিব দাঁড়িয়ে। তার চোখে কলম্বাস ভরসা খুঁজে পেলেন। মুখোমুখি হয়ে সগর্বে বললেন, 'আমি খ্রিস্টফার কলম্বাস।'

'বুলুম না, আবার বলুন।'

'খ্রিস্টফার কলম্বাস।'

'নামটা বানান করুন,' নেটিবটির কণ্ঠে স্পষ্ট অসহিষ্ণুতা। কলম্বাস যথারীতি বানান করলেন তাঁর নাম।

'একটু যেন মনে পড়ছে,' নেটিবটি বললে, 'হাল্কা বস্ত্রপাতির কারবার করেন না আপনি?'

'আমি আমেরিকা আবিষ্কার করেছি,' মুহূর্তের জবাব দিলেন কলম্বাস।

'সে কী! কখন করলেন?'

'এইমাত্র। মিনিট ছয়-সাত আগে,' কলম্বাসের স্বর বিনীত, দৃঢ়তা স্তিমিত, 'আমার মনে হয়, এর জগে কিছু খ্যাতি আমার প্রাপ্য।'

'আপনার আগেভাগেই তার করা উচিত ছিল,' একটু ভেবে নেটিবটি পরামর্শ দেয়, 'ওমনিভাবে কোন কাজ হয় বলুন? যদি একান্তই কোন দেশ আবিষ্কার করতে চান, প্রথমেই

টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেবেন। আর তৈরী রাখবেন ছ'চারটে মজার গল্প, উদ্ভূত সাংবাদিকদের কাছে রসিয়ে বলবার জ্ঞে। কয়েকখানা ফটোও মজুত রাখতে হবে। আসলে যা দরকার তা হল বিজ্ঞাপন।'

ফের হেঁচট খেলেন কলম্বাস। ভাবলেন, এটা এদেশীয় কোন দর্মান্ত্রণান, নয় তো পৌত্তলিক সমাজরীতি। তাই আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নিজস্ব অনুমানটা পেশ করলেন খেমে খেমে।

নেটিব সহচরটি তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরল। চোখে তার সমবেদনা।

'ছেলেমান্নুশি করবেন না, মিস্টার কলম্বাস,' তার স্বরে কোমল ভংগনা, 'বিজ্ঞাপন মানে বিজ্ঞাপন। আপনার জ্ঞে কিছু করবার চেষ্টা করব বরং। সত্যি দুঃখ হচ্ছে আপনার কথা ভেবে।

কলম্বাসকে সে এক বিরাট হোটেল নিয়ে এল তারপর। ঘে-ঘরটা ভাড়া নিল, সেটা পুত্রিশ তলায়। খানিক পরে নেটিবটি বিদায় নিলে কলম্বাস নিঃসঙ্গে বসে রইলেন সেখানে। বাবার সময় সে ভরসা দিয়ে গেল, যতটুকু সম্ভব, ততটুকু সে করবে তাঁর স্বার্থে।

আধঘণ্টাটাক হবে, এমন সময় ফের দরজা খুলে যায়। সেই নেটিবটি ফিরে এসেছে, সঙ্গে এদেশীয় ছ'জন অপরিচিত তরুণ। একজন কী চিবিয়ে চলেছে অবিরাম, অগ্ন জনের দখলে একটা কাঠের স্ট্যাণ্ড, তার সঙ্গে ঝোলানো এক ক্যামেরা। কলম্বাসের মুণোমুণি একটু ঝুঁকানু করে বিনা ভূমিকায় সে বললে, 'এবারে একটু হাসুন তো মিস্টার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাসুন। সে কী, বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা, তা হলে আমি যা করি তাই করুন। হাঃ হাঃ হাঃ।' নেটিবটি দাঁত বের করল। কিন্তু আর যাই হোক, সে-দস্ত-বিকাশকে হাসি বলা চলে না।

কলম্বাস হতবাক। তারপর অবুঝের মতো হাসলেন এক পশলা। তারপর বিহ্বাৎ-ঝলক, ক্যামেরার শব্দ 'ক্লিক'। নেটিবটি সত্যিকার হেসে তাঁকে ধগ্বাদ জানাল।

এবারে অগ্ন নেটিবটি কলম্বাসকে শিকার করলে। তখনও সে চিবিয়ে যাচ্ছে। একহাতে পেন্সিল চেপে তাঁর সামনাসামনি এসে বললে, 'আপনার নাম বলুন'

'কলম্বাস।'

'ধগ্বাদ, নামটা ঠিক বুঝে নেওয়া সবচেয়ে বেশি দরকারী। এবারে বলুন মিঃ কোলম্যান, কখন আমেরিকা আবিষ্কার করলেন? আজকেই? বেশ বেশ! আমেরিকা কেমন লাগছে আপনার?'

কলম্বাস এই আশ্চর্য দেশের পর্যাপ্ত পরিচয় পাননি। তাই উত্তরও পর্যাপ্ত হল না।

নেটিব সাংবাদিক গভীর ভাবনায় পড়ল।

'তা বটে,' সে বললে, 'আচ্ছা, বলুন তো, বোধ হয় এটা পারবেন, নিউ ইয়র্কের কোন গায়টে জিনিস আপনাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে?'

কলম্বাস অক্ষমতার জ্ঞে মাপ চাইলেন।

এবারে সে গভীরতর ভাবনায় পড়ল। বজ্রার আর ফিল্মস্টারদের সঙ্গে কথাবার্তায় সে অভ্যস্ত। কলম্বাসের মতো সাদামাটা লোকের সঙ্গে তার খাপ খায় না।

অবশেষে ফের আশ্বস্ত হয়ে সে একটি আশ্চর্য মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরল, 'আমেরিকার মেয়েদের আপনার কেমন লাগে মিস্টার কোলার্ড? বোঝা গেল, প্রশ্নটি গবেষণা করতে সে প্রচুর মানসিক বল খরচ করেছে।

এবারে সে উত্তরের প্রতীক্ষা করলে না। কলম্বাসের হাবভাব একটু লক্ষ্য করেই সে লিখে চলল পুরোদমে। জ্বলন্ত সিগারেটটা মুখ থেকে খসিয়ে নিঃশব্দে ঝাঁকুনি দিল বহবার, সে সময়ে পেন্সিলটা মুখে পুরে ঘন ঘন তাকাল ওপরে। লেখাটুকু শেষ করে সে লজ্জিত কলম্বাসের গায়ে টোকা দিল মুহূর্তে, তারপর হাত নেড়ে টুক করে বেরিয়ে গেল।

পরদিন খুব ভোরেই সহৃদয় নেটিবটির আবির্ভাব। হাতে খবরের কাগজ। তার পঁচাশি পাতায় হতবাক কলম্বাস আবিষ্কার করলেন তাঁর প্রতিকৃতি—শ্রীহীন হাসিতে অনাবশ্যক স্ফীত। ছবির তলায় ক্যাপশন লেখা, আমেরিকার মেয়েদের দেখে তিনি বিস্ময়বিমুগ্ধ। নিঃশব্দে চিত্তে বিশ্বাস করেন, এরাই পৃথিবীর সবচেয়ে মনোজ্ঞ সৃষ্টি। এবং হার্বার্ড যুনিভার্সিটিতে তিনি ভূগোল সম্বন্ধে রত্নগর্ভ বস্তুতা দেখেন।

প্রত্যেকটি কথা কাল্পনিক, কলম্বাস শপথ নিতে প্রস্তুত। এমন সময় নতুন কয়েকজন নেটিব ব্যবসায়ীর আগমন হল।

'বিজ্ঞাপন' ফল দিচ্ছে যাত্র মতো। কলম্বাস হলিউডে আমন্ত্রিত হলেন।

'আপনি স্পষ্টই বুঝতে পাচ্ছেন মিস্টার কলম্বাস,' নবাগত নেটিবরা অস্বাভাবিক নম্রতায় বলে চলল, 'আমেরিগো ভেসপুচি নামে যে ঐতিহাসিক ছবিটি তোলা হচ্ছে, তাতে আপনি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন। আমাদের ধারণা, জনসাধারণ এতে মনের খোরাক পাবে যথেষ্টই। অবশ্য, এর সংলাপ হবে ব্রডওয়ের চলতি ভাষায়। বুঝতে পারলেন না? তাহলে প্রথম থেকেই বলি। আমাদের একটা চিত্রনাট্য তৈরী করা আছে, সেটা ডুমার কাউন্ট অব মন্টেক্রিস্টোর ছায়াবলঘন করে, অবশ্য এটা মুখ্য কথা নয়। আসল কথা হল, আমরা এর মধ্যেই আমেরিকা আবিষ্কার অংশটুকু ঢুকিয়ে দেব স্থির করেছি।'

কলম্বাসের মাথা টলতে আরম্ভ করেছে। ঠোঁটজুটো নিঃশব্দে কাঁপছে। স্পষ্টতঃ প্রার্থনা করছেন। এদিকে তাদের অমায়িকতা উত্তেজনায় বাঁক নিয়েছে, 'ভেসপুচিকে স্পেনের রাণী গভীরভাবে ভালোবাসেন, আবার ভেসপুচিও সমানভাবে রাখান রাজকণ্ঠা গ্রিস্কার প্রেমাসক্ত। কিন্তু কার্ডিনাল রিশল্যু ভাস্কো-ডা-গামাকে ঘুষ দিয়ে বশ করেছেন এবং লেডি হামিল্টনের সঙ্গে রফা করে আপনাকে, মানে ভেসপুচিকে, আমেরিকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। যা হোক, এখানে তাঁর চক্রান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট। সাগরপথে জলদস্যুরা আপনাকে আক্রমণ করেছে। আপনি সিংহের মতো লড়েছেন। এটুকু তিন হাজার মীটার দীর্ঘ হবে। আপনি হয়ত অভিনয় করতে জানেন না, তাতে আটকাবে না। ওটা আসল কথা নয়।'

‘আসল কথাটা কী?’ কলম্বাস রুগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

‘বিজ্ঞাপন! জনসাধারণ আপনাকে ইতিমধ্যেই চিনেছে এবং আপনার মতো বীর জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করছে শুনে ওরা দেখবেন ভেঙ্গে পড়বে দেখতে। এহঁটেই হচ্ছে আসল আকর্ষণ। সাগরপথে যুদ্ধের ছবি তুলতে যে সরঞ্জাম দরকার, সমস্তই সুউড়িতে মজুত আছে। এখন দাড়ি গোঁফ কামিয়ে সাফ হয়ে নিন, তারপর ছ’সপ্তাহের জগ্গে কন্ট্রোল্টে দই করুন। রাজি?’

‘ঠিক আছে।’ অবচেতন স্বরে যেন উচ্চারণ করলেন কলম্বাস। সমস্ত শরীর তার কাঁপছে রীতিমত।

সেদিন গভীর রাত্রে নিজের ডেস্কে বসে কলম্বাস একটি লিপি লিখলেন স্পেনের রাণীর উদ্দেশে :

সারাজীবন ভরে দেশবিদেশ ঘুরেছি। দেখেছি বিচিত্র দেশে বিচিত্রতর মানবলীলা। কিন্তু এই নবাবিষ্কৃত ভূ-খণ্ডে এমন এক শ্রেণীর নেটিব বাস করে যারা শুধু অদৃষ্টপূর্বই নয়, জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রে মৌলিকও বটে। নীরবতা এদের কাছে অসহনীয়, তাই যতখানি সম্ভব হৈ-হল্লা লুটবার জগ্গে এখানকার নগরের বৃকে অদ্ভুত সড়কের সমারোহ দেখা যায়। লোহার খাম দিয়ে এদের উচ্চতা বাড়ানো হয়েছে। এর অল্পগামী হয়ে রাতদিন লোহার গাড়ি ঘুরে বেড়ায়। তাতে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি হয়, আর সে শব্দকে প্রাণভরে উপভোগ করে এই নেটিবরা।

এরা পৌত্তলিক, এবিষয়ে আমি নিঃসংশয়। বহু অবতার মানে এরা। নেটিবদের আবাসস্থলে তাদের নাম আলোর অক্ষরে খোদাই করা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এরা সবচাইতে বেশি পূজা করে দেবী কোকোকোলা আর কাফেটেরিয়া এবং ‘গ্যাসোলীন’ স্বর্গের তীর্থঙ্কর ফোর্ডকে। ফোর্ড যেন নেটিবদের জিউস।

নেটিবরা ভয়ানক পেটুক এবং এরা কিছু-না-কিছু চিবোতে থাকে সবসময়ই।

দুর্ভাগ্যের কথা, এখনও এরা সভ্যতার স্পর্শবিরহিত। স্পেনের দ্রুত জীবনযাত্রার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় এদের চালচলন কতো স্তিমিতবেগ। এমন কী পায়-হেঁটে-চলাকেও এরা অস্বাভাবিক দ্রুত মনে করে; তাই একে এড়িয়ে যাবার জগ্গে তারা নতুন এক ধরণের আশ্চর্য বস্তুর প্রচলন করেছে—তাদের বলে ‘অটোমোবাইল্‌স্‌’ এগুলো চলে শামুকের মতো, আর তাইতেই ওদের অপরিমেয় আনন্দ।

এই আশ্চর্য দেশ সম্বন্ধে আরো অল্পসন্ধান চালিয়ে যাব, যাব আরো গভীরে। বিপদের আশঙ্কা নেই। আর যা-ই হোক, নবাগতের প্রতি নেটিবরা অত্যন্ত বিনয়, সহৃদয় এবং আন্তরিক।*

ইলিয়া ইলফ্ ও ইটজিন পেট্রোভ লিখিত গল্পের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

জ্যোতির্ভিক্ষু

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—পঞ্চম বর্ষ, আর্ট্‌স

ওরে মন, আজ স্বপ্নের কূলে জাগোরে জাগো,
ওরে মন, আজ স্বপ্নের কূলে অকাল জরা—
এই সকালের চারণবালক মিছেই বলে :
‘মিছে হলো আজ অরুণবরণ সকাল বরা,
জাগলিনে তোরা, ভোরের তোরণে জাগলিনা গো,
দেখ লিনা মুখ তার সায়রের স্ননীর জলে !’

দেউলিয়া ওরা, সমস্ত রাত
প্রেতের ছায়ার কুটিল করাত
ছিন্ন করেছে বাসনার মণি,
তাই জেনো এরা কেউ ঘুমোয়নি ।
ফণা তুলে-তুলে কালো সংশয়
মুছে নিয়ে গেছে আলোর অভয়,
মুখ ঢেকে আছে মৌন ঘরণী,
তাই জেনো এরা কেউ ঘুমোয়নি ।
চোখ বুজে শুধু প’ড়ে আছে সেই ছায়ায় ভরা,
মিছে হলো তাই অরুণবরণ সকাল বরা ।

একটি স্বপ্ন দেখেছিলো ওরা রাতের শেষে :
স্ননীর সায়রে অবগাহনের নেশায় ভেসে
নির্জন বুনো হাঁসের মতন হাজার ভেলা
জল কেটে চলে—এক মোহানার মস্ত্রে মেশে
জলবিহঙ্গ আশ্বিন দোলে সকালবেলা ।
হঠাৎ কখন শরবনে ঢাকা প্রেতের ছলে
একটি হাঁসের ডানা ছিঁড়ে যায়, রক্তজমা
পদ্মপাতায় শয্যা বিছালো বিহঙ্গমা,
হলো না মিলন মহামোহানার জোয়ার জলে ।

মিলিত ঘুমের শাদা পালংকে
 প্রেতের ছায়ার কুটিল করাত
 ছিঁড়ে দিয়ে গেল উতলা মনকে
 সমস্ত রাত, সমস্ত রাত !
 সেহলির প্রেমে বাসি হয়ে এল পদলতা,
 মায়াবিনী হলো প্রথম রাতের ছায়াঞ্জনা—
 রক্তের দাগে পুণ্যহারানো শিশিরকণা
 পবিত্রফুলে বুনে দিয়ে গেল বিষগ্নতা ।

তবু-যে বুনবো ভোরের নক্সা রক্তে গড়া,
 পাল-তুলে-দে'য়া হাওয়ার ঝালর ছলবে তাতে ;
 ঘুণ-কেটে-যাওয়া এই ধূলিতেও স্বয়ম্বর।
 আঁকা হবে ব'লে নিজেকে ভুলিনি বেঘুম রাতে ।
 এ-আকাশ তবে ছবি-আঁকা সেই রূপকথা হোক,
 স্বপ্নের কূলে আবার সবাই জাগবে ব'লে,
 আমি হবো আজ শুভ্র উষার চারণবালক ;
 পন্নপাতার শয্যা'য় আজো ব্যথায় দোলে
 ব্যর্থপ্রেমের পূর্ণপ্রতীক হাঁসের পালক,
 তাই নিয়ে যাবো মহামোহানার ঢেউয়ের কোলে ॥

দিনের কবিতা

অর্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য—দ্বিতীয় বর্ষ, আর্টস্

স্বচ্ছনীল আকাশের পটভূমিকায়
 ফুটে ওঠা উঁচু-নীচু বাড়ীদের গারি
 ভাদ্রের ছুরন্ত ছপুরে ।
 ফুটপাতে তন্দ্রাতুর দেবদারু গাছ
 গলানো সোনায় সেরে স্নান ।
 জানলার পাশে এলে চোখে জাগে ধূসর শহর.
 রহস্যের আবরণে লেখে ব'সে দিনের কবিতা ।

ধোঁয়াভরা অলিতে গলিতে
 প্রাচীরের পাশে আর সবুজাভ মাঠে
 আকাশের বক্ষভেদী চিম্নীর চূড়াদের পাশে
 গ'ড়ে ওঠে দিনের কবিতা ।
 মাকড়ের জালে ঘেরা অন্ধকার কোণে
 জমকালো রেশোরার বুকের উপরে
 আলো আর ছায়ার মায়ায়
 জানি তার ছন্দ গাঁথা আছে ।
 উপরেতে শুধু নীল আকাশের বৃকে
 চিলেদের কালো কালো পাখা ।
 ধূসর শহর নীচে কবিতার পাণ্ডুলিপি লেখে
 ভাদ্রের এ ছরস্তু ছপুর্নে ।

“উত্তর-স্বাক্ষর”

বরুণা ভট্টাচার্য—পঞ্চম বর্ষ, আর্টস্

কাব্যের অহুদগত অঙ্কুর,
 মুকুলিত হলো,
 অকস্মাৎ ।
 বিপুল সম্ভাবনা তার ।
 জড় পিণ্ডের স্তূপে
 প্রথম হলো প্রাণ সঞ্চারিত ।
 প্রতিধ্বনিত হলো
 আদিম প্রাণের
 অনুচ্চারিত বাণী ।
 অপরিচয়ের যবনিকা
 গেল সরে,
 কবির আত্ম-পরিচয়ে ।
 ফুলে ফলে তার
 বসন্ত সম্ভার,

দুঃসহ আনন্দের আবেগে
 মরে কেঁপে,
 রৌদ্রস্নেহ-তপ্ত শিশুগাছটার মত ।
 পাতায় পাতায়
 পল্লবিত হয় কত বাণী ।
 অজান্তে কবি লিখে যায়
 উত্তর স্বাক্ষর,
 কাব্যে গানে সৃষ্টিতে ।
 ভবিষ্যতের চিরন্তন
 প্রতিক্ষা—
 এই বাণীর তরে
 সৃষ্টি ও স্রষ্টার সার্থকতা
 নিখিলের ঘরে ।

সমাজবিজ্ঞানের গোড়ার কথা

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়—ষষ্ঠ বর্ষ, আর্টস্

Sociologyর ঠিক বাংলা সমাজবিজ্ঞান কিনা জানি না তবে বোধহয় এই কথাটিকে বাঙলা প্রতিশব্দ হিসেবে দেওয়া চলতে পারে । সমাজবিজ্ঞান জিনিষটা কি এ সম্বন্ধে সাধারণ ছাত্রের মনে একটা অসাধারণ ভুল ধারণা আছে । আমাদের কলেজ পাঠাগারে অর্থনীতি রাজনীতির বই থাকে সমাজবিজ্ঞানের বইয়ের তালিকার মাঝখানে । ফলে অনেক ছাত্রেরই ধারণা সমাজবিজ্ঞান বুঝি আরো পাঁচটা সামাজিক বিজ্ঞানের সমষ্টিমাত্র । আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এদিক দিয়ে অনেক বেশী প্রগতিশীল—তঁারা সমাজবিজ্ঞানকে রাজনীতির একটা বিশেষ শাখা বলে সব গোলমাল মেটাবার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু সমাজবিজ্ঞান এর কোনোটাই নয় ।

সমাজবিজ্ঞান কাকে বলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া একটু শক্ত ! Sociology নামটা কৌতের আবিষ্কার কিন্তু প্রায় প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানীরই সমাজবিজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে নিজস্ব একটা ধারণা আছে । এরই ফলে কোন এক বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কোনো এক সময়ে মন্তব্য করেছিলেন—পৃথিবীতে যত জন সমাজবিজ্ঞানী ঠিক ততগুলিই সমাজবিজ্ঞান । সমাজবিজ্ঞানীমাত্রকেই স্বীকার করতে হবে যে সমাজবিজ্ঞানের সীমারেখা এখনো ভালভাবে

নির্ধারিত হয়নি যার ফলে যতক্ষণ না সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে একটু পরিচয় হচ্ছে এবং সমাজ-বিজ্ঞানের নানা ভাগ সম্বন্ধে একটু জানা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে ‘সমাজবিজ্ঞান কি?’ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুশ্কিল।

এই কারণে একদল লোক সমাজবিজ্ঞানের অস্তিত্বই অস্বীকার করতে চান—কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে—সমাজবিজ্ঞানীর মধ্যে যে এত প্রভেদ সেটাই তার অস্তিত্বের মস্ত বড় লক্ষণ। সমাজবিজ্ঞানী পরিচয়ে বহু আনান্ডী যে নিজের মতবাদ সমাজবিজ্ঞানের মূলসূত্র বলে চালিয়েছেন এটা সত্যিকথা এবং এর ফলে দেখা গেছে যে সমাজবিজ্ঞানের তথাকথিত ছর্বোধাত্যার পেছনে রয়েছে এই সব তথাকথিত সমাজবিজ্ঞানীদের লেখাগুলি।

‘সমাজ’ এই কথাটা আমরা সকলেই জানি এবং মনে মনে ভাবি কথাটির মানেও আমরা জানি। ফলে, সমাজবিজ্ঞান কথাটা যখনই শুনি তখনই মনে হয় যে সমাজবিজ্ঞান জিনিসটা কি সেটাও জানি—আসলে কিন্তু সমাজবিজ্ঞান জিনিসটা অতটা সহজ নয়। সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও একদল আছেন যারা সমাজবিজ্ঞানকে পদার্থবিজ্ঞা রসায়নবিজ্ঞার স্থায় পুরোধস্তর এক বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে ফেলে তার মূলসূত্র বার করতে চান। আরেক দল সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন মতবাদী সমাজবিজ্ঞানীদের লেখা বিশ্লেষণ করে তাঁদের লেখার মধ্যে মিল খুঁজে বার করে সমাজবিজ্ঞানের সূত্র বার করতে চান, এঁদের মধ্যে সোরোকিনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সমাজবিজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে সমস্ত মতামতকে নয় ভাগে বিভক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন।^১

আজকের দিনের সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ষাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক ম্যাক আইভার এবং লিওপোল্ড ফন উইস। অধ্যাপক ম্যাক আইভারের নাম অর্থনীতি রাজনীতির ছাত্ররা সকলেই জানেন—তাঁর মতবাদ বুঝতে হলে সমাজবিজ্ঞানের মূলনীতি জানতেই হবে। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী উইসই প্রথম সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানরূপে দেখবার চেষ্টা করেন এবং সেইভাবে গবেষণা চালান। উইস-এর মতে সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের আলোচনা (“A study of interhuman relations”)। মানুষ হচ্ছে সমাজের প্রথম এবং প্রধান উপাদান—কাজে কাজেই সমাজবিজ্ঞানেরও বটে। কিন্তু মানুষের সমস্ত আচরণই সমাজবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না। মানুষের খাওয়া ঘুমানো প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক কাজের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের কোন যোগ নেই। কিন্তু যখনই মানুষ অগ্র মানুষের সংস্পর্শে আসে তখনই সে হয় সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণার বস্তু। মানুষের এই দিকটার নাম সমাজবিজ্ঞানীর কাছে ‘সামাজিক’ (ইংরেজীতে যাকে বলে সোসিয়াস)। এই সামাজিক নিয়েই সমাজবিজ্ঞানের যত কিছু কেরামতী—সমাজবিজ্ঞানের ইউনিট হচ্ছে এই সামাজিক। অ্যাডাম স্মিথের ইকনমিক ম্যানএর মতোই সামাজিকও অস্তিত্বহীন তবে

গবেষণার সুবিধার জগৎ সামাজিকের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। সামাজিক যা করে তা হলো সামাজিকতা (প্রতিশব্দ সোসিয়েসন)।

একটা উদাহরণ দিলে বোধহয় জিনিষটা একটু পরিষ্কার হবে। মনে করুন আপনি চলেছেন অনেক দূর—ট্রেনের কামরায় আপনি একলা তখন সমাজবিজ্ঞানীর কোন সন্দেহ নেই আপনার সঙ্গে। কিন্তু যখনই আরেকজন লোক কামরায় এসে চুকলেন—আপনি কোতুহলী প্রকৃতির হলে মনে জাগবে আপনার হাজার প্রশ্ন—সমাজবিজ্ঞানীর কাজ শুরু হবে তখন থেকেই। আপনি আলাপী প্রকৃতির হলে আলাপ জমাবার চেষ্টা আরম্ভ করবেন, উমরিগড় দিয়ে বলবেন, এতদিনে বোধহয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের মাথায় সুবুদ্ধির উদয় হলো—তারপর I. F. A.র সংসাহসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন। আপনার সহবাত্রীটি আপনার মতো মিশুক প্রকৃতির লোক হলে আর ভাবতে হবে না, অল্পক্ষণ বাবেই আপনারা পৃথিবীর আদর্শ বন্ধুগণ হয়ে দাঁড়াবেন! বহু স্মরণীয় প্রেমকাহিনীর সূত্রপাত এই ভাবেই হয়েছে বলে শোনা যায়। এখানে আমরা দেখলাম এক সামাজিক আরেক সামাজিকের সংস্পর্শে এল এবং তাদের মধ্যে এমন এক সম্পর্ক স্থাপিত হলো যা কাছ টানে। সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এর নাম অ্যাসোসিয়েসন।

কিন্তু এর উন্টোটিও হতে পারে—ধরুন আপনি যেই I.F.A.র প্রশংসা শুরু করলেন আপনার সহবাত্রীটি সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে থামিয়ে বলে উঠলেন—‘এত বাজে বকেন কেন?’ শুরুতেই এরকম অভ্যর্থনা পেয়ে আপনি ঘাবড়ে গিয়ে বাকী সময়টা চূপ করেই কাটাবেন। এখানে যে সন্দেহটা স্থাপিত হলো সেটা দূরে নিয়ে যায়—এর নাম ডিসোসিয়েসন।

আর এক সময়ে দেখি আমাদের পারস্পরিক ব্যবহারটি কিছুটা অ্যাসোসিয়েটিভ কিছুটা ডিসোসিয়েটিভ—এর নাম মিশ্র প্রক্রিয়া। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা এই তিন প্রক্রিয়া নিয়েই। আমরা যদি আমাদের নিজেদের সামাজিক ব্যবহার বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাব আমাদের মধ্যে এই তিন প্রক্রিয়া অহোরাত্র কাজ করছে। আমরা বন্ধুকে দেখলে এগিয়ে আসি, পুলিশ দেখলে পালাই আর বেশীর ভাগ সময়েই দুটো মিশিয়ে ফেলে কাজ করি, কাছেই ব্যবহারটা দাঁড়ায় তৃতীয় বা মিশ্র পর্ব্যায়ে।

সমাজবিজ্ঞানীর কাজ হচ্ছে এই অ্যাসোসিয়েসন এবং ডিসোসিয়েসন প্রক্রিয়ার ভাল ভাবে বিশ্লেষণ করা এবং এই দুই প্রক্রিয়ার ফল কি দাঁড়াবে সে সম্বন্ধে গবেষণা করা। একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে প্রথমোক্ত প্রক্রিয়ার ফলেই উদ্ভব হয় নানারকমের লব (গুপ) যেমন পরিবার সঙ্ঘ ধর্মসম্প্রদায়, রাষ্ট্র প্রভৃতি এবং শেষোক্ত প্রক্রিয়ার বিষময় ফল হিসেবে দেখা দিতে পারে বিশ্বযুদ্ধ। সমাজবিজ্ঞানীর কাজই হচ্ছে এইসব ফল সম্বন্ধে গবেষণা করা এবং সভ্যতার ওপর তার কি প্রভাব হতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা।

একটি কথা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন যে মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের যোগ নিবিড়। অন্য কথা বলতে কি, মনস্তত্ত্বের সাহায্য ছাড়া সমাজবিজ্ঞানের একপাও চলা মুশ্কিল। তাই

বার বার সমাজবিজ্ঞানীকে মনস্তত্ত্ববিদের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যক্তিবিশেষের মনস্তত্ত্ব থেকে শুরু করে জনতা-মনস্তত্ত্ব পর্যন্ত সবই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানীর কাজের মধ্যে—সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়। গত দশাব্দার সময় একটি জিনিষ লক্ষ্য করেছেন অনেকেই—যেই শোনা গেল “ওই এসে গেল” কে এসে গেল, কোথা থেকে এল, কোথায় তারা এসে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করেই সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগলেন—তা তাঁদের যতই বিচারবুদ্ধি থাকুক না কেন। এই নিজের ব্যক্তিত্বের সাময়িক বিলোপ জনতামনস্তত্ত্বের একটি প্রধান বিশেষত্ব। আমাদের জনপ্রিয় বিধানসভা আইনসভা প্রভৃতিও সমাজবিজ্ঞানীর চোখে একধরণের জনতাবিশেষ। বিখ্যাত নেতাদের জনপ্রিয়তার পেছনেও এই জনতামনস্তত্ত্বের দান অনেকখানি।

সমাজ বিজ্ঞান তার দলের আর পাঁচটা সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে সবচেয়ে নূতন এবং সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ। নূতন হলেও সমাজবিজ্ঞানের সূচনা গ্রীকদেরও আগে থেকে। সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা প্রায় সমাজের উৎপত্তির মতোই পুরাতন। তবে কিছুটা বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা শুরু হয় গ্রীকদের সময় থেকেই। সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক রূপ উনবিংশ শতাব্দীর চেয়ে পুরানো নয়। উনবিংশ শতাব্দীতেও সমাজবিজ্ঞানীরা মাত্র কয়েকটি সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ধারা হচ্ছে—সমাজবিজ্ঞানকে প্রগতিবাদ এবং ইতিহাস দর্শনের সঙ্গে এক করে ফেলার চেষ্টা। সমাজবিজ্ঞানকে বরাবর প্রগতিবাদ ভাবতেন তাঁদের সকলের নামই আপনারা জানেন—কোঁতে, স্পেন্সার, হেগেল, মাক্স। কোঁতেকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের জন্মদাতা বললেও অত্যাুক্তি হয় না। কিং তিনিও তাঁর সময়ের দোষ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, ফলে তিনি বারে বারেই ফিরে গেছেন অর্ডার এবং প্রোগ্রেসের প্রশ্নে। কোঁতের ধারণা, সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ সমাজ যে সমাজ অর্ডার এবং প্রোগ্রেস এই দুয়ের সৃষ্টি সমন্বয়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকে যায় অর্ডার কি এবং প্রোগ্রেস কি? অর্ডার বলতে কি আমরা বুঝি আইনানুসারে চলা—কিন্তু সমস্ত আইনকে মেনে নেওয়া কি বাঞ্ছনীয়—সেটা জাগ্রত মনের অভাব বোঝায়—সেটা মৃত্যুর লক্ষণ। আর অর্ডার বলতে যদি আমরা বুঝি আমাদের মধ্যে যা ভাল জিনিষ বর্তমান তাকে পুরোপুরি রক্ষণ কর। এবং প্রোগ্রেস বলতে বুঝি তাকে উন্নততর করার প্রচেষ্টা, তাহলে অর্ডার আর প্রোগ্রেস এর তফাৎটা থাকে কোথায়?

অর্ডার এবং প্রোগ্রেস ছাড়া আর যেসব প্রশ্ন নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজবিজ্ঞানীরা ভেবেছেন তাদের মধ্যে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র এবং ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র নিয়ে দ্বন্দ্বই হচ্ছে প্রধান। এই সমস্যা নিয়ে ঝাঁপা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হর্নে কার্ল মাক্স। কিন্তু মাক্সবাদীর সংখ্যা দেশে এত বেশী যে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে যাচ্ছে বাতুলতারই নামান্তর।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজবিজ্ঞানের আরেকটা বিশেষত্ব—সমাজবিজ্ঞানের সৃষ্টি আবিষ্কারের জন্য সমাজবিজ্ঞানীর আপ্রাণ চেষ্টা। এই সমস্ত মিলিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর

সমাজবিজ্ঞান খুব পরিষ্কার একটা রূপ নিতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে আজ আমরা দেখতে পাই উনবিংশ শতাব্দীর সেইসব মতবাদ বর্জন করা হয়েছে এবং আর পাঁচটা বিজ্ঞানের মতোই সমাজবিজ্ঞানও একটা বিজ্ঞানসম্মত পথ নিয়েছে।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আজ যে সমাজবিজ্ঞানীর প্রয়োজন কতখানি তা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই বুঝিয়ে বলতে হবে না। খাণ্ড সমস্যা, বেকার সমস্যা, উদ্বাস্ত পুনর্বাসন সমস্যা, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধবুদ্ধি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আজ প্রায় প্রত্যেক দেশকেই। আজকের পৃথিবীর সমস্যা যত বাড়ছে সমাজবিজ্ঞানীর সমস্যাও ততই বেড়ে চলেছে। সমাজবিজ্ঞানীর সমস্যার ছুএকটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে আজকের দিনের সমাজবিজ্ঞানীর কাজ কত জটিল হয়েছে।

শুনতে অদ্ভুত হলেও, কোন সমস্যাটা সামাজিক আর কোনটা নয় এটাই সমাজবিজ্ঞানীর প্রথম সমস্যা। আগেই বলেছি সমাজবিজ্ঞানের সূত্র খোঁজবার ঐকান্তিক একটা চেষ্টা সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা যায়। এই জন্ত একদল সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক সমস্যার একটা নিয়ম বেঁধে ফেলবার চেষ্টায় বলেন যে, যে কোন সামাজিক পরিবর্তনই একটা সামাজিক সমস্যা। এ দলের নেতা হচ্ছেন রোশেনকুইস্ট। এই ফরমুলা মেনে নিতে আপত্তি বিশেষ নেই কিন্তু মুশকিল এই, সমাজ যখন কোন পরিবর্তনকে সহজভাবে মেনে নেয় তখন তাকে আর সমস্যাপদবাচ্য করা চলে না যখন পরিবর্তনের পথে ওঠে প্রতিবাদ তখনই সেটা হয় সমস্যা কিন্তু তখন তাকে পরিবর্তন হিসেবে প্রতিপন্ন করা শক্ত। বাসে যখন ধূমপান নিষিদ্ধ করা হ'ল তখন কেউ প্রতিবাদ না করে মেনে নিলেন, এটা আর সমস্যা হিসাবে দেখা দিল না। কিন্তু যখন ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া এক পয়সা বাড়লো তখন প্রতিবাদ উঠলো ধাজার কণ্ঠে আর তখনই সেটা দেখা দিল সমস্যারূপে। এই দুটো উদাহরণেই বোঝা যাবে রোশেনকুইস্টের ভুলটা কোথায়।

আরেকদল সমাজবিজ্ঞানী মার্জকে অহুসরণ করে বলেন যে সামাজিক সমস্যা দলবিরোধ বা Group conflict ছাড়া কিছুই নয়। তাঁরা বহু দল আবিষ্কার করেছেন—যেমন পুঁজিপতি এবং সর্বহারা, ছাত্র এবং শিক্ষক, হিন্দু ও মুসলমান। এই সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এইসব সামাজিক দলের বিরোধই হচ্ছে সামাজিক সমস্যা। আপাতদৃষ্টিতে এই উত্তরটিকেই খাটা বলে মনে হয়। এই মত নিঃসন্দেহে অনেকাংশেই সত্য কিন্তু একটু ভাবলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে সব সমস্যাই দলবিরোধের তৈয়ারী নয়। আজ যদি প্লেগ দেশে মহামারীরূপে দেখা দেয় তবে সেটা নিশ্চয় সামাজিক সমস্যারূপে পরিগণিত হবে কিন্তু সেটা দলবিরোধের ফলে উৎপন্ন বলতে অতি বড় উৎসাহীও একটু গোলমালে পড়বেন।

আরেকদল সমাজবিজ্ঞানীর মতে সামাজিক সমস্যাগুলির বিভিন্ন নাম দিয়ে তার কারণ নির্দেশ করাই আদর্শ পন্থা। কিন্তু এ প্রকার গোল অনেক। একটা সামাজিক সমস্যার নাম দেওয়া গেল দারিদ্র্য। কিন্তু কারণ অহুসন্ধান করতে গিয়ে হয়ত জানা যাবে দেশে বিধবার

সংখ্যাবৃদ্ধি এই দারিদ্র্যের মূল কারণ। এখানে দেখা গেল যে সমস্তার নাম আমরা দিয়েছিলাম দারিদ্র্য তা আগলে হচ্ছে মুতাহারবৃদ্ধি সমস্তা।

এতক্ষণে যদি ধারণা হয়ে গিয়ে থাকে যে সামাজিক সমস্তা বলে কিছু নেই তবে দোষ বিশেষ দেওয়া চলে না। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীর কাছে সামাজিক সমস্তা কি সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক সমাজে প্রত্যেক সময় একটা সর্বজনসম্মত সমাজ আছে। সেই সমাজব্যবস্থা হয়তো কালের সঙ্গে সঙ্গে বদলিয়েছে কিন্তু সবসময়েই একটা সমাজব্যবস্থা সকলেই চেয়েছেন। যখনই সেই সর্বজনসম্মত সমাজব্যবস্থা থেকে কোনো বিচ্যুতি ঘটে তখনই হয় সামাজিক সমস্তার সূত্রপাত। যখন প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিল তখন সেটি সর্বজনসম্মত সমাজব্যবস্থা থেকে একটি বিচ্যুতি ঘটল এবং সেই কারণেই সেটা সামাজিক সমস্তা। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে সেই সর্বজনসম্মত সমাজব্যবস্থা পৃথিবীতে কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হয় নি বা হবেও না; ফলে সামাজিক সমস্তা চিরকাল ছিল এবং থাকবেও।

পরিশেষে এইটুকু মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে সমাজবিজ্ঞানীর কাজ তথ্য-সন্ধান আর বিশ্লেষণ। কোনো বিশেষ সমস্তার নৈতিক দিক সমাজবিজ্ঞানের সীমার বাইরে। দেশে ছাত্রদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা যদি বেড়ে যায় সমাজবিজ্ঞানী তার কারণ অনুসন্ধান করতে পারেন; হাজার রকমের প্রতিকার বাতলাতে পারেন কিন্তু পরলোকে এর বিষময় ফল সম্বন্ধে গবেষণা করা তাঁর পক্ষে অনধিকার চর্চা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি কি হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে কোনো কিছুই বলবেন না—তাই যিনি বলতে চান তিনি নিজেকে সমাজ দার্শনিক বলে পরিচয় দিল তাতে তিনি কাউকেই ঠকাবেন না অন্তত নিজেকে ভোঁ নয়ই। আজকের সমাজের অবস্থার পর্যালোচনা করে সমাজবিজ্ঞানীর যদি মনে হয় সাম্যবাদের প্রবর্তন অবধারিত সত্য তবে সেটুকু বলেই সমাজবিজ্ঞানীর কাজ শেষ। এসম্পর্কে বিবাদগ্রস্ত হওয়া বা উৎসাহ প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে শুধু অশোভন নয়, অচ্যায়। আণবিক শক্তির গবেষণাপূর্ব চলে ল্যাবরেটরী ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে। আর তার ধ্বংসলীলার প্রয়োগস্থল হয় বাইরের বিশ্ব। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসেবে এ প্রয়োগ সম্বন্ধে নির্বাক থাকতে হবে গবেষককে। সমাজ-বিজ্ঞানও এমনি একটি বিজ্ঞান—সমাজবিজ্ঞানীও একজন বৈজ্ঞানিক—তাঁরও কর্তব্যের পরিধি টানা রয়েছে ওখানেই। সমাজবিজ্ঞানীর সঙ্গে Ethics এর সম্পর্ক খুব কম।

মানুষ হিসাবে মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা অবশ্য সকলেরই আছে। আর এটি তো মানতেই হবে এই রকম বিগতস্পৃহ হয়ে মানুষের পক্ষে চার ঘণ্টার বেশী থাকা সম্ভব নয়, বাকী কুড়ি ঘণ্টা সমাজবিজ্ঞানী সাধারণ মানুষ। সমাজবিজ্ঞানী যেখানে সাধারণ মানুষ তাঁর মতে মূল্যও সেখানে সাধারণ। যেখানে তাঁর কথার ওজন ভারী, যেখানে তাঁর তথ্যবিশ্লেষণ অবাধ সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত একেবারেই অবাস্তব। সেখানে সমাজবিজ্ঞান শুধু বিজ্ঞান, দলনিরপেক্ষ তার কাজ, মতনিরপেক্ষ তার বিশ্লেষণ আর অমোঘ সত্য তার সিদ্ধান্ত।

ইতিহাস-বিজ্ঞান

বিনয় চৌধুরী—পঞ্চম বর্ষ, আর্টস্

প্রাগৈতিহাসিক আর ঐতিহাসিক যুগের সীমারেখা আজ প্রায় ঘুচে যেতে চলেছে—প্রাগৈতিহাসিক যুগের সীমান্ত পেরিয়ে যাবার ছাড়পত্র মিলেছে ঐতিহাসিকদের নিরলস অহুসন্ধানের মূল্যস্বরূপ। কিন্তু ইতিহাসবোধের দিক থেকে আমরা যেন এখনও প্রাগৈতিহাসিক যুগের আধ-আলো আধ-ছায়াময় পরিবেশে—আবিষ্ট সেখানে আমাদের চেতনা, বিভ্রান্ত আমাদের বুদ্ধি। প্রকৃতির খামখেয়ালীপনাকে মানুষ পায়ে বেড়াই পরিিয়েছে—কিন্তু আপন সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কেই সে বড়ো বেশী রকমের বেওয়াকিফহাল। তার হালচাল কিরকম বেগতিক, ঠেকে। ইতিহাসকে আমরা যেন সচেতনভাবে সৃষ্টি করতে পারছি। আমরা যেন ইতিহাসের হাতের পুতুল—আর পুতুলনাচের ইতিকথাকে আমরা ইতিহাসের উকি পরিিয়ে জতে তুলছি। বিজ্ঞানের জগত মানুষ-প্রকৃতি দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় মানুষের চেতনার সন্ততির ইতিহাস। যুক্তিশৃংখলা আবিষ্কার করে বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আর ব্যবহারিক জগতে তার প্রয়োগের দ্বারা সে জ্ঞানের বিকাশ সম্ভব হয়। বিজ্ঞানের এ প্রক্রিয়া বিশেষ এক বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—বিজ্ঞান বিশ্বাস করে আমার চেতনার রঙেই পান্না হয়ে উঠে না সবুজ, চূণী হয়ে উঠে না রাঙা—চেতনার বাইরে এক বস্তুবিশ্ব পারম্পরিক অচ্ছেদ্য সম্পর্কের মধ্য দিয়েই দ্বন্দ্বের ভেতরে নূতন নূতন রূপে বিকাশ লাভ করছে, বিজ্ঞান তাই বিশ্বাস করে। নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার যান্ত্রিক বিকাশ ও যথার্থ্যের স্থানে আজ বিরোধের মধ্য দিয়ে গতিময় প্রকৃতির বিকাশমানরূপই স্বীকৃত—যেখানে যথার্থ্যকে দেখা হয় সম্ভাব্য বিকাশের বিশেষ একটা অংগ বলে। বস্তুর এ দ্বন্দ্বিক অভিব্যক্তির ফলে পরিমাণগত বিকাশ থেকে গুণগত বিকাশে উত্তরণ—বিজ্ঞানে আর একটা স্বীকৃত সত্য। তাই বিজ্ঞান বস্তুর গতিপ্রবাহে অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করে। বস্তুর স্বধর্ম আপন বিকাশে—একথা বিজ্ঞান বিশ্বাস করে বলে অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। ইতিহাসকে যদি বিজ্ঞান হতে হয়, তাহলে সমাজের বিকাশের মূলনীতিকে আবিষ্কার করতে হবে। ইতিহাস সমগ্র সমাজের ইতিহাস বলে প্রকৃত ইতিহাস সামগ্রিক সমাজ-বিশ্লেষণের পদ্ধতি দিয়ে সুরু হবে—প্রয়োজনীয় ঘটনার ধারাবাহিক বিশ্লেষণে নয়। এই বিকাশকে যদি সমাজের দ্বন্দ্বের, বিরোধের মধ্য দিয়ে নূতন রূপের ইতিহাস বলে দেখা যায়, তাহলে ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানের জগতে মূলনীতির সম্ভাব্যতার উপরই আজকাল বেশী জোর দেওয়া হয়—আংকিক ফরমুলার দস্তুরকে কোনো রকমেই আজ মানা হচ্ছে না। ইতিহাসের জগৎ প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে ও তাকে যোগ করে একটা স্বতন্ত্র

জগৎ। বিকাশের ধারাও তার জটিল। তাই এখানে ভবিষ্যতের যে ইংগিত দেওয়া তা কোন সঠিক বিকাশের নিভুল ইংগিত হতে পারে না। আজকে আমরা ইতিহাসের কয়েকটি মৌলিক নীতি বুঝতে পারি—যেগুলোর আসল চেহারা সিদ্ধান্ত হিসাবে—ঐ মূলনীতিগুলো মানুষ তখন বুঝতে পারে নি। বিজ্ঞানের জগতে যেমন জ্ঞান আর প্রয়োগের নিবিড় সম্পর্ক—ইতিহাস-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। প্রকৃতি ও বস্তুজগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানের যে ধারণা ও প্রক্রিয়া, ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনুরূপ ধারণা ও প্রক্রিয়া যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলতে আপত্তি থাকেনা—বিজ্ঞানের নিয়মনীতি ইতিহাস-বিজ্ঞানের নিয়ম-নীতির চেয়ে ঢের বেশী সত্য ও যথার্থ কিনা—তার প্রশ্ন এক্ষেত্রে উঠেনা। এক্ষেত্রে যা বিচার্য তা হল এই যে ইতিহাস শুধু যুক্তিবিজ্ঞান থেকে অনেক বড়ো পরিধির মধ্যে আপনার এলাকাকে প্রসারিত করতে পারে।

ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা গেছে ভাববাদ বা যান্ত্রিক বস্তুবাদকে আমদানী করা হয়েছে। ভাববাদীদের মতে ইতিহাস হোল একটা অন্তর্হীন ভাবের আত্ম-প্রকাশের রূপ—ইতিহাসে পটপরিবর্তন এ ভাবের স্বন্দের ফলেই। অতিপ্রাকৃত কোন শক্তির ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে যেন ইতিহাসের মধ্য দিয়ে। হেগেলের Absolute idea, ফিশারের লিবার্টি, টয়েনবির ধর্ম—প্রধানত ভাববাদী দর্শনের, বিভিন্ন দিকের প্রতিভূ। কিন্তু ইতিহাস যে বিজ্ঞান তা কোনটারই দ্বারা প্রমাণিত হয় না। হেগেল ইতিহাসে গতিবাদের কথা বলে ইতিহাস-বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু হেগেল যখন বলেন যে মানুষের রাজনৈতিক ইতিহাসের চরমতম রূপ হোল প্রাশিয়ার ১৮৬৮ সালের শাসনতন্ত্র, তখন অসংগতিটা চোখ এড়াতে পারে না। আগে থেকেই নির্ধারিত কোন লক্ষ্যের অভিমুখে ইতিহাসের গতিধারা নয়। প্রধানত সামাজিক মানুষের কার্যকলাপই ইতিহাসের বড়ো কথা বলেই যদি ইতিহাসকে বিজ্ঞান হিসাবে মর্বাদ দিতে হয় তাহলে বস্তুবিজ্ঞান এ ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। ফিশার লিবার্টি কি তা স্পষ্ট ভাষায় কখনও বলেননি। অথচ তিনি বলেছেন যে যুরোপীয় ইতিহাসের আসল রূপ এ লিবার্টির ধারণার রূপায়নের ইতিহাস। লিবার্টির ধারণা আপেক্ষিক। সামন্ততান্ত্রিক যুগে যে লিবার্টি, ধনতান্ত্রিক যুগে তা সম্পূর্ণ পৃথক। আবার একই যুগে, যেমন ধনতান্ত্রিক যুগে, বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে যা খোদ স্বাধীনতা সর্বহারাদের কাছে তা হল পায়ের বেড়ী। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে ইতিহাসে এ লিবার্টির ধারণার বিবর্তন বেশ প্রয়োজনীয় একটা অংগ। কিন্তু স্বয়ম্ভুভাবের বস্তুবিজ্ঞান বিবর্তনকে ইতিহাসের মূল নিয়ামক বলে মেনে নেওয়া ইতিহাসের ব্যর্থ সরলীকরণ। ইতিহাসে গুণগত বিকাশকে ব্যাখ্যা করা যায় না এ তত্ত্বের দ্বারা। টয়েনবির ব্যাখ্যাতে বিভিন্ন সভ্যতায় পরস্পরের উপর উৎপাদনপদ্ধতি সম্পর্কে আবিষ্কারের প্রভাবকে জোর দেওয়া হয়না। যদিও ভৌগোলিক কারণে এ যোগাযোগ অনেকক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়নি, তথাপি এটা ইতিহাসের একটা স্বীকৃত সত্য। আবার কোন দেশের ইতিহাসকে সংস্কৃতির

বিবর্তনের ইতিহাস মনে করে টয়েনবি উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সংগে সংগে সংস্কৃতির বিভিন্ন অংগে যে পরিবর্তন আসে তার দিকে মোটেই নজর দেন নি। ঐতিহাসিক কারণেই রাশিয়ার ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার উপর বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু সমাজ-তাত্ত্বিক রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে পুরোনোদিনের পরিমাণগত ধারাবাহিকতা মনে করা ইতিহাসের বিকাশকে অস্বীকার করা। বিজ্ঞানের সব চাইতে বড়ো কথা এ বিকাশের ধর্ম। মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে যে পরিবর্তন, তা কি করে ব্যাখ্যা করা যাবে—পাগান যুরোপ থেকে খ্রীষ্টীয় যুরোপে উত্তরণ, রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাবকে ব্যর্থ করে প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মের জয়যাত্রা কি করে ব্যাখ্যা করা যায়? আর ইতিহাসে কি গুণগত বিকাশ আসে এ সংস্কৃতির পরিবর্তনে? অতীতকে ভৌগোলিক পরিবেশ দিয়ে, অর্থনীতির তথাকথিত চিরন্তন নীতিসূত্র দিয়ে ইতিহাসব্যাখ্যা একান্তভাবেই যান্ত্রিক। ভৌগোলিক পরিবেশ অপরিবর্তনীয় থাকলেও ইতিহাসে পরিবর্তন আসে। সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের পর নূতন অর্থনীতির প্রবর্তন ইটালীয় ঐতিহাসিকদের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে—তারা সম্পূর্ণ ইতিহাসকে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বলে মনে করেন। এ অর্থনীতির সংগে রাজনৈতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক জীবনবোধের সম্পর্ক কোথায়—তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। অথচ ইতিহাস হল সামাজিক মানুষের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সামগ্রিকতা। ব্যক্তির প্রাধাণ্য দিয়ে ইতিহাস-ব্যাখ্যার চেষ্টা সম্পূর্ণাংগ হতে পারেনা। ব্যক্তির সংগে সমাজের সম্পর্ক, এতে পরিষ্কার করে বলা হয় না—ইতিহাসের বিশেষ একধাপে জন্মগ্রহণ করেন বলে ব্যক্তির প্রতিভা ও তার দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত। ইতিহাসের গতিধারাকে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় পরিবর্তিত করতে পারে না। আবার ব্যক্তির ইচ্ছা বিভিন্ন সময়ে ব্যর্থ হয়—ব্যক্তি দিয়ে ইতিহাসের সামগ্রিক অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করা যায় না—নেপোলিয়নের দ্বারা তদানীন্তন যুরোপের কয়েকটা রাজনৈতিক ঘটনাকে আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—কিন্তু তদানীন্তন সামন্ততান্ত্রিক শক্তির পূর্ণঅবক্ষয়, ফিনান্স ক্যাপিটালিজমের অভ্যুদয়, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, ব্যালজাকের অপূর্ব সাহিত্যসৃষ্টি—এর কোনটাই প্রমাণিত হয় না। ব্যক্তির প্রভাব ততটুকু যতটুকু সে ইতিহাসের গতিধারাকে এগিয়ে দেবে বা পেছিয়ে দেবে। বিরাট সমাজের সাধারণ মানুষ কি ভাবে ইতিহাসে কাজ করে তার কোন দিশই পাওয়া যায় না। ইতিহাস বিকাশ—ইতিহাস পুনরাবৃত্তি নয়—স্পেংলারীয় দর্শন তার সোজাসুজি বিরোধিতা। নানাকারণে সমাজে প্রগতির ধারা ব্যাহত হতে পারে। কিন্তু বিকাশকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সম্পূর্ণভাবে অনৈতিহাসিক। কোন কোন ক্ষেত্রে—যেমন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে—পুনরাবৃত্তি হতে পারে কিন্তু যদি পারিপাশ্বিক অবস্থার বিচার করা যায়—তাহলে এটা আর টেকেনা।

মননের জগতে বিজ্ঞানের আশ্চর্য প্রগতি, অর্থনীতির জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, দর্শনের জগতে হেগেলীয় ডায়ালেকটিক সমাজের বিকাশ সম্পর্কে আমাদের ধারণাতে বেশ

কিছুটা স্ফুটতা আনতে পেরেছে। মধ্যযুগে এ ইতিহাস-বিজ্ঞান সৃষ্টি সম্ভব হয়নি নানা কারণে। চার্চের প্রভাবে মানুষ ইতিহাসে অলৌকিক শক্তির প্রভাবকে স্বাভাবিক বলে মনে করত। ধর্মসৃষ্টি এ মূঢ়তাকে বিজ্ঞান তখনও আঘাত দেয়নি। সামন্ততান্ত্রিক জগতে মানুষের মনের পরিধি সীমায়িত ছিল টুকুরে টুকুরে। ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে। অতীতের সংগে বর্তমানের যোগও পরিষ্কৃত হওয়া সম্ভব ছিলনা—যার ফলে মনে হোত সামন্ততন্ত্র ঘেন মূর্তিমান বিশৃংখলা। বর্তমান ধনতান্ত্রিক জগৎ মননের জগতে মানুষের এ ঘেরাটোপকে ভেঙ্গে দিয়েছে—বিরাট পৃথিবীর সমগ্র রূপ আজকে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। বর্তমান ধনতান্ত্রিক জগতে উৎপাদন পদ্ধতির নিয়ত বিকাশ—বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উৎক্ষেপ সমাজের চঞ্চল গতিপ্রবাহ সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে পরিষ্কার করেছে। কিন্তু আধুনিক যুগেও কেন ইতিহাস-বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়নি ?

শ্রেণীসমাজে অবক্ষয়ের যুগে চিন্তা আর কর্মের মধ্যে বিরোধ খুব স্ফুট হয়ে উঠে। ইতিহাসের দিক থেকে শ্রমবিভাগ সামাজিক প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে কারও কারও চিন্তার একচেটিয়া অধিকার, আর কারও কারও কর্মের দাসত্ব করার অধিকার প্রধানত এ সমগ্র সমাজের প্রয়োজনের বিরোধী। শ্রম হল সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ—মানুষ-প্রকৃতি দ্বন্দ্বের উপর জয়ী হবার জন্ম মানুষের বিশেষ একটা হাতিয়ার—কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে শ্রমকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে—এখানে তাই সাধারণভাবে ভাবাদর্শ শাসকশ্রেণীর পরিপোষক হয়। শ্রম আর চেতনার এ বৈরিতার ফলে ঐতিহাসিক সামাজিক জীবনের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আবার ধনতন্ত্রকে একটা পাকাপোক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে মনে করা হয়—ইতিহাসকে যদি বিজ্ঞান বলে মেনে নেওয়া হয়—তাহলে ধনতন্ত্রের অবসান অনিবার্য একথা মানতে হবেই। কিন্তু বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা তা স্বীকার করেন না। আসলে ইতিহাস হোল অতীতকে বর্তমানের মধ্যে দেখার বিশেষ এক ভঙ্গী। বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা অতীতকে বিশেষ এক বিশৃংখলা বলে মনে করেন—যার একমাত্র দাওয়াই বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থা। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই যে অতীতের জীর্ণ সমাজব্যবস্থা আধুনিক কালের সমাজব্যবস্থার জন্ম পথ করে দিল—ঐতিহাসিকেরা তা বুঝতে পারেননা। শ্রম আর চেতনার এ বিচ্ছেদের ফলে ইতিহাসের যে বিকৃতিকরণ আর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চিরন্তন মনে করা সব সময়ে সচেতন নয়। অথচ শ্রম আর চেতনার বিরোধের ফলে সাধারণ মানুষকে মর্দাদা দেওয়া বুর্জোয়া ঐতিহাসিকের পক্ষে সাধারণতঃ সহজ হয় না। বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসে হিরোর সন্ধান করে বেড়ান—কেননা বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণা সামাজিক ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাকে জিঞ্জিরে উঠে সবরকম সামাজিক সম্পর্কেই অস্বীকার করার সামিল। বুর্জোয়া চিন্তানায়কের সমাজের সংগঠনকে সাধারণত স্বীকৃতি দেবেন না। এর কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে মূনাফাসৃষ্টির জন্ম বুর্জোয়া শ্রেণীর আসল হাতিয়ার হল কোন রকম রাষ্ট্রের বিধিনিষেধকে অস্বীকার করা।

এই প্রধান শ্রেণীর ভাবাদর্শ সমগ্র সমাজের আদর্শ হয়ে পড়ে। গর্কি বলেছেন শ্রেণীসমাজে মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তার প্রকাশকে এমন আড়ষ্ট করে রাখা হয় চারদিক থেকে যে মানুষ নৈরাজ্যবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। এ সামাজিক সংগঠনকে না মানার জগ্গই সামাজিক সংগঠনের মূলে যে সাধারণ মানুষের বাঁচার ইতিহাস আছে তা সম্পূর্ণ বাদ পড়ে। বুর্জোয়া-শ্রেণী রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে স্বীকার করে ততটুকু যতটুকু তাদের মুনাফাতে সতর্ক প্রহরা দেওয়া যায়। এভাবে সামাজিক চেতনাবোধ বিকৃত হয়ে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বুর্জোয়া-দর্শনের কোন বিশেষ দিক ইতিহাস রচনার methodকে প্রভাবিত করেছে। পজ্জিটিভিজম—যার গোড়ার কথা জ্ঞানের সীমাহীন সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা—বস্তুকে অজ্ঞেয় মনে করা—বিচ্ছিন্ন ঘটনাকেই প্রধান মনে করা—ইতিহাস রচনাপদ্ধতিকেও কোনও কোনও দিকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। তাই ইতিহাসে ঘটনার সমাবেশই প্রধান হয়ে উঠে। মোট কথা একটা সামগ্রিক দর্শন সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের আলোচনাকে ব্যাহত করেছে। আসলে ইতিহাস যে বিজ্ঞান হতে পারেনি তা বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবক্ষয়ের লক্ষণ—তাই বিভিন্ন বিজ্ঞানের শাখার মধ্যে ঐক্যের বদলে বিরোধটাই ঘেন স্পষ্ট। যেহেতু মানুষের ইতিহাস সবকিছুকে মিলিয়ে, সে কারণেই স্বাভাবিক ভাবে ইতিহাসের মধ্যে এই ঐক্যবোধের অভাব।

আসলে যদি মানুষের সামাজিক সংগঠনের উৎপত্তি বিকাশকে বুঝতে পারি তাহলে দেখা যাবে ইতিহাস বিজ্ঞান—ইতিহাসের যাকিছু আকস্মিক ঘটনা, ব্যক্তির যা কিছু ব্যর্থতা তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবেনা সামাজিক গতিপ্রবাহ থেকে। ইতিহাস হল মানুষ-প্রকৃতি দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় সংঘবদ্ধ সমাজবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক সংগঠনের বিকাশের ইতিহাস—প্রকৃতির সংগে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে মানবিক করে তোলার সংগে নিজেকে পরিবর্তনের ইতিহাস। ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক যাই ভাবুন, সামাজিক সংগঠনকে অস্বীকার করে সামাজিক প্রগতি সম্ভব নয়—যা দরকার তা হল সংগঠনের সামাজিক প্রয়োজনের বনিয়াদের উপর গড়ে তোলা—যাতে তা বিশেষ কোন শ্রেণীর স্বার্থের পরিপোষক না হয়। আসলে সংগঠনের বিকাশ মানুষের মুক্তিকে খর্ব করা নয়। এ সংগঠনের গোড়াকার কথাই হল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যা মানুষ-প্রকৃতি দ্বন্দ্বকে ঘুটিয়ে দেবার প্রাথমিক উপায়। ইতিহাসে গুণগত পরিবর্তন তা উন্নততর উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে মানবিক করে—তোলার ফলেই। পুরাতন প্রস্তর যুগে পাথরের ব্যবহার নূতন প্রস্তর যুগে কৃষিকার্যের প্রবর্তন, ব্রোঞ্জ যুগে তামার আবিষ্কার, লৌহযুগে মূল্যবান তামার বদলে লৌহ-গলানোর পদ্ধতি আবিষ্কার, মধ্যযুগে জলীয়শক্তিকে কাজে লাগানোর কৌশল উদ্ভাবন—আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে শিল্পবিপ্লব ও অর্থনীতির জগতে বিপ্লব—এ হল বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অগ্রগতির রূপ, যার গোড়াকার কথা হল অর্থনীতিতে। রাজ-রাজড়ার বিবাদ-কোন্দলের ইতিহাস আসল ইতিহাস নয়, সমাজাতীত কোন ভাবের বিকাশের ইতিহাস,

ইতিহাস নয়। উৎপাদনপদ্ধতি সংঘবদ্ধ বলে উৎপাদন সম্পর্কের প্রশ্ন আসে। সাধারণত উৎপাদনপদ্ধতি উৎপাদন সম্পর্কে নিয়ন্ত্রিত করে—সুতরাং সংঘবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক মোটামুটি ভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সামন্ততান্ত্রিক যুগের ভূস্বামী আর ভূদাসদের সম্পর্ক ধনতান্ত্রিক যুগে আর নেই—এখানে ধনিক শ্রেণী আর সর্ব-হারার সম্পর্কই আসল সম্পর্ক। উৎপাদন সম্পর্কও উৎপাদনপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। সামন্ততান্ত্রিক যুগের উৎপাদন সম্পর্ক নূতন সম্ভাবনাময় বুর্জোয়া উৎপাদনপদ্ধতিকে ব্যাহত করেছিল—আধুনিক যুগে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক বিভিন্ন ভাবে উন্নততর উৎপাদনপদ্ধতির সম্ভাবনাকে ব্যাহত করছে।

ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের পরিষ্কার ধারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যদি আমরা উৎপাদন-পদ্ধতির আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। পুরোনো একটা সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গেলেই যে একটা নূতন উৎপাদনপদ্ধতি বিকাশ লাভ করবে তা নয়—পুরোনো সমাজব্যবস্থার মধ্যেই এ বিকাশ সূত্র হয়—পরে সেই সমাজের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দেয়। কেননা মানুষের নূতন উৎপাদনপদ্ধতির আবিষ্কার পুরোনো উৎপাদনপদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা আংশিক নিয়ন্ত্রিত। প্রাচীরের সংগে প্রথম খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রশ্ন আছে, পরে সামাজিক প্রয়োজনেই নবীনের সৃষ্টি সম্ভব হয়। পুরোনো সমাজের ক্ষীয়মান উৎপাদনপদ্ধতির মধ্যেই নূতনের বীজ লুকিয়ে থাকে—পরে তার শাখাপ্রশাখাকে প্রসারিত করে দেয় দেউলিয়া সমাজব্যবস্থার গভীরে—তাতে জীর্ণ সমাজব্যবস্থা দীর্ণ হয়ে যায়। আবার ইতিহাসের ধারাই হল এমন যে ভবিষ্যতের রূপটা কি হবে তা সঠিক বলা সম্ভব হয়না। সামাজিক প্রয়োজনেই নূতনের জন্ম—সে নবজাতক কোন শক্তিকে আহ্বান করে আনবে তা জানা সম্ভব হয়না।

এ উৎপাদনপদ্ধতির বিকাশ মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংগঠন ও অগাঢ় ভাবাদর্শকে প্রভাবিত করে—মাক্স এ কথা বলেছেন ‘ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি’র ভূমিকাতে। রাজনৈতিক সংগঠন আইনকানুন প্রভৃতি যে নূতন উৎপাদনপদ্ধতি ও সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইতিহাস থেকে তাকে সহজে প্রমাণ করা চলে। প্রাক-ফরাসী বিপ্লবের সময়কার সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থে পরিচালিত রাষ্ট্রিক সংগঠন ও আইনকানুন বিপ্লবোত্তর বুর্জোয়া ফ্রান্সে অচল—তাই নূতন আইনকানুনের সৃষ্টি। আর তখনকার যুগের ভাবাদর্শও এ নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দর্শন। ব্যক্তির মুক্তি আসলে সামন্ততান্ত্রিক বিধিবিধানের জঞ্জাল থেকে ব্যক্তির মুক্তি—সে ব্যক্তি তো মঙ্গল গ্রহের কোন জীব নয়—তখনকার যে বাস্তব সমাজ সংগঠন তার মানুষ—এক-কথায় সামন্ত-তান্ত্রিক বিধিবিধান থেকে নূতন উৎপাদন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুক্তি। কিন্তু উৎপাদন-পদ্ধতি ও ভাবাদর্শের সম্পর্ক যান্ত্রিক কোন রকমেই নয়। আসলে এ হল দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক। নূতন ভাবাদর্শ যখন সৃষ্টি হয়, তখন তার একটি বিশিষ্ট গতিবেগ সৃষ্টি হয়। সে ভাবাদর্শ উৎপাদন শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিপ্লবের সময়কার ফরাসী দর্শন তখনকার

মধ্যবিত্তদের বৃদ্ধি বল জুগিয়েছিল; আবার এ ভাবাদর্শ উৎপাদনপদ্ধতিকে ব্যাহত ও করতে পারে—মধ্যযুগের চার্চের প্রচারিত ভাবধারা মানুষকে শ্রেণীসংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। যুরোপজোড়া রোমান ক্যাথলিক সাম্রাজ্যের কথা ঘোষণা করে নূতন অর্থনীতির উপর গড়বার সম্ভাবনা নিয়ে যে নেশন রাষ্ট্রের স্বপ্ন তাকে ব্যাহত করেছিল। টাকা লেনদেনকে পাপ বলে চালিয়ে মার্কেটাইল ধনতন্ত্রবাদের বিকাশকে কণ্টকিত করে তুলেছিল। আবার দেখা যাবে যদিও উৎপাদন শক্তির উন্নতি বা বিকাশ অব্যাহত তবুও ধর্মের ভাবাদর্শে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা বা রাজনৈতিক সংগঠনে অল্পরূপ ব্যর্থতার পরিচয় মেলে। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে উৎপাদন সম্পর্ক মানুষের বুদ্ধি ও অল্পভূতিকে, এক কথায় মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রকাশকে ব্যাহত করেছে। নূতন উৎপাদনপদ্ধতি স্বল্প হবার সময় উৎপাদন সম্পর্কের সংগে বেশ একটা ছন্দ বজায় থাকে। কিন্তু উৎপাদন সম্পর্ক যখন উৎপাদনপদ্ধতির সংগে বেহুঁরো হয়, তখন ঐ প্রতিক্রিয়াশীল উৎপাদনপদ্ধতিকে জীইয়ে রাখার জ্ঞ প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের সৃষ্টি হয়—রাষ্ট্র জোর করে আইনকানুন দিয়ে এ উৎপাদন সম্পর্কটিকে রাখতে চায়। তবে এটুকু সাধারণভাবে বলা চলে যে বস্তু থেকেই চেতনার বিকাশ—মানুষ-প্রকৃতি দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানুষ আপনার সংগঠনকে গড়ে তোলে; গড়ে তোলে সাহিত্য ও শিল্পকে; গড়ে তোলে মানুষের ধর্ম। তাই ইতিহাস আলোচনা করার সময় আমরা মানুষের ভাবাদর্শকে গতিবান সমাজের প্রয়োজনীয় সৃষ্টি বলে মনে করব।

ইতিহাসে যখন বিপ্লব হয়, তখন এই উৎপাদন ও ভাবাদর্শের সম্পর্কটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইতিহাসে বিপ্লব হয় তখনই যখন উৎপাদনপদ্ধতি আর উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে দেখা দেয়। ধনতান্ত্রিক জগতে দেখতে পাচ্ছি, যারা উৎপাদন করেছে সে সর্বস্বত্বাধারের সংগে মালিকের স্বার্থের নিয়ত বিরোধ। এ মালিক, সর্বস্বত্বাধার উৎপাদন সম্পর্ক সামাজিক অগ্রগতিকে রুদ্ধ করেছে। তাই নূতন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির জ্ঞ বিপ্লবের প্রয়োজন। তেমনি করে ইংলণ্ডে ১৬৪৮ ও ১৬৮৮ এর বিপ্লব, ফরাসী দেশের বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ককে জয় করে নূতন উৎপাদনপদ্ধতির আত্মপ্রতিষ্ঠা। তেমনি সোভিয়েট দেশে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ককে জয় করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন। এই বস্তুজগতের দ্বন্দ্বের একটা বিশেষরূপ ভাবাদর্শের লড়াইয়ে দেখা যায়। ধনতান্ত্রিক জগতে রাষ্ট্রীয় সংগঠন দিয়ে, আইনকানুনের মারপ্যাচ দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শ দিয়ে নূতন শক্তির সৃষ্টিকে ব্যাহত করতে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু নূতন বিকাশমান শক্তির মধ্যে আবার নূতন ভাবাদর্শের সৃষ্টি হয়—এবং পুরোনো ভাবাদর্শের সংগে তার সংঘর্ষ আসে। পুরোনো অর্থনীতিক বনিয়াদের ধ্বংসের পর স্বভাবতই পুরোনো ভাবাদর্শ আপনার শক্তি হারিয়ে ফেলে—আর নূতন ভাবাদর্শ বিজয়ী হয়।

তাই ইতিহাসকে যদি সংঘবদ্ধ মানুষের ইতিহাস হিসাবে দেখা যায়, উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের ইতিহাস হিসাবে দেখা যায়, মানুষ-প্রকৃতি দ্বন্দ্বের বিশেষ অভিব্যক্তি, ভাবাদর্শের

ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস হিসাবে দেখা যায়, যার সংগে উৎপাদন পদ্ধতির অলক্ষ্য বোগাযোগ রয়েছে, যদি ইতিহাসের মধ্যে গুণগত পরিবর্তনকে সামাজিক জীবন ধারণের ঐতিহাসিক প্রয়োজনের ফলস্বরূপ দেখা যায়—তা হলে ইতিহাস বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ইতিহাসের গতিতে অল্পধাবন করে, শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অভিব্যক্তিকে বুঝে আমরা ভবিষ্যৎ ইতিহাস-বিকাশের ইংগিত দিতে পারি—সচেতনভাবে আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারি। আজকের দিনে তার পরিষ্কার রূপ আমাদের সামনে। রুশবিপ্লবের পর, পূর্ব যুরোপের অনেক রাষ্ট্রে ও নয়াচীনে নয়াগণতন্ত্রের বিজয়ের পর মানুষের কাছে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গতিপথ খুবই স্পষ্ট। অন্ধকার পথে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে তাকে আর এগুতে হচ্ছেনা। সে সংগ্রামের রূপ আজকে দেখছি উপনিবেশে উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ঘৃণিত কৌশলকে বানচাল করার জন্তু মেহনতী মানুষের সংঘবদ্ধতায়—বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সব মুখোশ আজকে খুলে পড়েছে—তাই উপনিবেশিক মুক্তিসংগ্রামের ধারা আজ নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে, যা ধাপে ধাপে সমাজতন্ত্রের দিকে এগুবে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্তু মানুষের স্বপ্নকে রূপ দেওয়ার জন্তু আজকে ইতিহাসের নূতনভাবে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এক কথায় মানুষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগের তোরণে এসে দাঁড়াচ্ছে—প্রয়োজনের জগৎ থেকে মুক্তির জগতে মানুষের উত্তরণ থেকেই হল আসল ইতিহাসের সূত্র।

বাঁশীর সুর

সমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান

আলোঢালা চাঁদনী রাত। বাঁশের বাঁশী হাতে চলেছিলেম মাঠের পথ ধরে। কাজ তখন পড়েছে ঘুমিয়ে, স্নক হয়েছে কাজভাঙ্গানোর রাজস্ব। ঘুমের মাঝে দু-একটা পাখী এক-একবার উঠছে ডেকে। চারিদিকে বিরাজ করছে অপূর্ব শান্তি, নীরব স্নিগ্ধতা। জ্যোৎস্নাভরা এই পূর্ণিমা রাত্রি—এ যেন কি যাদু রেখেছে লুকিয়ে, বারে বারে মনকে টেনে নিয়ে আসে ইটকাঠপাথরের বন্ধন থেকে সীমাহীন স্ফামলিমার মাঝে। বাঁশী দিলেম বাজিয়ে; তার সুরের বন্ধার আকাশ-বাতাসে জাগিয়ে দিল কাঁপন, সে সুরের রেশ গিয়ে পৌঁছল স্তম্ভ প্রকৃতির হৃদয়ের প্রতিটি কোণে। মনে হ'ল, বাঁশীর সুরে এখনি মায়াপুরীর কোন রাজকন্ঠে উঠবে জেগে, স্নক হবে রূপকথার রাজস্ব। সে বাঁশীর সুরে সাড়া দিল পূর্ণিমারাত্রির মধুর স্নিগ্ধ প্রকৃতি। চাঁদ বললে, ওগো বাঁশী, তুমি যে আমারই একান্ত আপন। তোমার সুরে আমারই অন্তরের কথাগুলি পেয়েছে প্রকাশ। বললে অনন্ত আকাশের নিবিড় নীলিমা—ওগো বাঁশী, তোমার সুর যে সীমাহীন অনন্ত নীলিমার গান, তোমার সুরে আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি

আমার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। ছায়াঘন শ্রামলিমা বললে, বাঁশী, তোমার সুরের মাঝে আমাকেই যে তুমি জানালে আহ্বান, আমার প্রাণ দিলে মাতিয়ে, ও যে আমার হৃদয়ের নিবিড়তম গান। মাটি তাকে বললে ডেকে, ওগো বন্ধু, তোমার সুরে যে বিশাল ধরিত্রীর ব্যথা উঠছে বেজে, মাটি-মায়ের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসটুকু তুমি যে নিয়ে নিয়েছ তোমার সুরের মাঝে, তোমার গান যে যথার্থই মাটির গান।

বাঁশী শুনে বললে হেসে, “ওগো বন্ধুরা! আমার সুর যে তোমাদের সকলেরই প্রাণের আনন্দ-বেদনের সুর। আমি যে গান গাই শুধু অনন্তসুন্দরের, তাই তার সুর বাজে তোমাদের সকলের হৃদয়ে। এ গান জ্যোৎস্নার গান, নীলিমার গান, মাটির বৃকের গান, এ স্নিগ্ধ শ্রামল প্রকৃতির গান—এ যে সুন্দরের আবাহন। তাইতো আমার সুরে বিশ্বপ্রেম ওঠে জেগে, তাইতো এ সুর আনন্দের সাড়া জাগায় তোমাদের সকলের প্রাণে। সবারই যে প্রাণ সুন্দরের সাথে বাঁধা আছে আনন্দের যোগসূত্রে।

আমাদের কথা

ছাত্রপরিষদ :

কাজ করার অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে পরিষদের কার্যভার গ্রহণ করেছিলাম। সংগঠন-মূলক কাজের মধ্য দিয়ে পরিষদের ধারাবাহিক কর্মজীবনের পরিবর্তন আনবার ইচ্ছা ছিল আমাদের। আমাদের সে চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছিল তা বলতে পারবেন আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু নিজেদের দিক থেকে এইটুকু বলতে পারি যে কার্যক্ষেত্রে আন্তরিকতার ও নিষ্ঠার অভাব ঘটে নি কোনদিন।

এবার আমাদের প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহের উদ্বোধন হয়েছিল বিরাম-পীঠিকা বিভাগের উদ্বোধনে অনুষ্ঠিত ষ্টীমার পার্টি দিয়ে। এবারকার ষ্টীমার পার্টিতে আগের কয়েক বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি হঠাৎভাবে সম্পাদনার জন্ত শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। ১৯শে জানুয়ারী বাংলার বিধানসভার শ্রেয়স্পীকার শ্রীশৈলমুখার্জী তাঁর বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা চলচ্চিত্রের সাহায্যে আমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আমাদের নিজস্ব কোন হল না থাকায় আমাদের কলেজের অনুষ্ঠান চিরকাল বাইরের কোন হল এ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই সকল অস্থিবিধা দূর করবার জন্ত আমরা মাঠে প্যাণ্ডেল করে প্রায় আটশ লোকের বসবার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্ভোগের ফলে আমাদের পরিকল্পনা আশঙ্করূপভাবে সফল হয় নি। ২৪শে জানুয়ারীর জলসায় শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা উৎপলা সেন, শ্রীশচীন গুপ্ত, শ্রীপান্নালাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীমানবেদ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা কল্যাণী রায়, শ্রীমহাপুরুষ মিশ্র প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীগণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনে জলসায় মাত্র কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে শ্রীঅমিত মিত্র, শ্রীধরত চৌধুরী ও শ্রীগোতম সরকারের গান বিশেষভাবে সকলকে আকৃষ্ট করেছিল। নাট্যপরিষদের সহযোগিতায় এইদিন শ্রীসুবোধ বহুর 'অতিথি' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। অভিনেতাদের মধ্যে শ্রীবীরেন পাল চৌধুরী, শ্রীহুর্গাদাস রায় ও শ্রীসখিণ্ড চ্যাটার্জীর অভিনয় সকলের প্রশংসা অর্জন করে। শুধুমাত্র কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এইরূপ একটি অনুষ্ঠান পরিচালনার প্রচেষ্টা বোধহয় কলেজের ইতিহাসে এই প্রথম। আশা করি আমাদের পরবর্তী কর্মীবৃন্দ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এইরূপ সুযোগ দেবেন।

বিরাম-পীঠিকা :

ষ্টীমার পার্টির বিবরণ আগেই দিয়েছি। টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা এবার সম্ভবপর হয় নি।

নাট্যপরিষদ :

নিউএম্পায়ার হলে আমাদের বাৎসরিক নাট্যানুষ্ঠান শ্রীগোতমকুমার সরকারের পরিচালনায় হঠাৎভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'অগ্নিবাণ' ও শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের রচিত 'মেন্স নম্বর ৪৯' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছিল।

স্বাস্থ্যপরিষদ :

শ্রীঅমলবিকাশ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই বিভাগের পক্ষ থেকে এলিট সিনেমা হলে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

দমাজ্জসেনবা-বিভাগ :

শ্রীদ্বিপ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে অনেক দুঃস্থ ব্যক্তিকে নিয়মিত সাহায্য দান করা হয়েছে।

বিতর্ক-বিভাগ :

সম্পাদক শ্রীশ্রীশান্ত বহুর পরিচালনায় এই বিভাগের কাজ বেশ হুঁহুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতৃ-দম্পতীর প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মিলিত বিতর্ক সভার আয়োজন করা তাঁর পক্ষে এবার সম্ভব হয়ে উঠেনি।

এবার পরিষদের সকল কাজে আমরা ছাত্রীদের পক্ষ থেকে বণেশ উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছিলাম। আমাদের সকল কাজে তাঁরা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে আমাদের সাফল্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছেন।

যাঁরা ধন্যবাদের পাত্র তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে উল্লেখ করা অসম্ভব। সাধারণভাবে তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি।

প্রদীপকুমার দাস—সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র-পরিষদ

প্রকাশনা-বিভাগ :

মাসুলী-নিয়মমাসিক বছরে দুটি করে পত্রিকা বের করা আর রীতিমত অপবা ইচ্ছামত দেয়ালী বের করা এই তো জানতুম এ দপ্তরের কাজ। সংখ্যায় এরা মাত্র দুটি—খুবই ছোট তবু গুরুত্ব বেশ বড়। দু-দিন পরে জানলাম এবং জেনে অবাক হলাম যে দেয়ালীর দায় ও দায়িত্বের বোঝা থেকে আমাকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। সেটা চেপেতে যুগ্ম-সম্পাদকের ঘোঁষা ঘাড়ে। বাকি রইল পত্রিকা বার করার কাজ। সবাই বলল—কাজটি সহজ নয়—কাগজটিকে তো প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের সঙ্গে ভাল রেখে চলতে হবে—তাল কাটলে বিদগ্ধমনেরা সহ্য করবেন কেন? খাটি কথা—নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমারও কিছু বলবার আছে—পত্রিকার ভেতরের কোন লেখাকে বাতিল বা অবাতিল করার ভার তো আমার নয়—সে কাটাছেঁড়ার ভার তো সম্পাদকের। আমি তো শুঁ অপরোধন টেবিলের বারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি—আর খুব বেশী হলে কথামত ছুরিটা কাঁচিটা এগিয়ে দিতে পারি।

তবে এবার কিছু নতুনত্ব এসেছে—কাগজের আর প্রচ্ছদপটের শুভ্র পরিষ্করতা। সবার কি রকম লাগবে জানিনা—আমাদের ভাল লেগেছে। ছুটির আগে কাগজ বেরলে ভাল হয় সত্যিকথা—কিন্তু এবার বেরলে সেটা হ'ত শূন্য-সংখ্যা—কারণ কালির আঁচড় থাকত না সেখানে। সাদা কথায় বলতে গেলে আমরা ছুটির আগে ছাপবার যোগ্য কোন লেখা কারও কাছ থেকে পাই নি।

সবশেষে প্রচ্ছদপট এঁকে দেবার জন্ত ইতিহাস সেমিনারের সম্পাদক শ্রীদ্বিপ্রকুমার ঘোষকে এবং পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপারে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্ত এই বিভাগের বিদ্যায়ী ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত ও শ্রীহীনীতকুমার ইন্দ্র, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য ও সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীজ্যোতির্শয় পালচৌধুরী—সম্পাদক, প্রকাশনা-বিভাগ

বিতর্ক-পরিষদ :

বিতর্কের রিপোর্ট লিখতে বসে এবারে কয়েকটি অভাবনীয়ের উল্লেখ করতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি। প্রথমতঃ, বাইরের বিভিন্ন আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতার যতোগুলিরই নিয়ন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করেছিলাম সেই

সবগুলিতেই আমাদের প্রেরিত প্রতিনিধিরা সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। এর মধ্যে শ্রীপ্রদীপ দাসই তো আশু ভজন বার পুরস্কার পেয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, এই সব বাইরের প্রতিযোগিতার সাফল্যের কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রথম বর্ষের ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিতর্কের ইতিহাসে নতুনত্বের সূচনা করেছেন। তৃতীয়তঃ, বহুদিনবাদে এবারে অন্ততঃ একটি বিতর্কে ছাত্রীরা যোগদান করেছেন।

অবশ্য ক্রটিও রয়ে গেছে আমাদের কাছে। যথা, সেসনের প্রথমার্ধে এবারে কলেজে মাত্র ত্রকটি প্রতিযোগিতা-মূলক ও দুটি প্রদর্শনী বিতর্কের অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিল। এই সংখ্যালঘু নিত্যসুই অনিচ্ছাকৃত। সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত কলেজ বিতর্কটির বিষয় ছিলো, “An Economic Blockade against Pakistan is the only effective way to save the minorities there.” বিষয়টি খুবই topical হওয়ায় ছাত্রমহলে বিশেষ আগ্রহের কারণ হয়েছিলো। বাইরের থেকে এই বিতর্কে যোগ দেন শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত। সভাশেষে বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় University Institute, ও বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজের উদ্যোগে আন্তঃকলেজ বিতর্ক-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটির বাংলা বিভাগে প্রতিযোগী হিসেবে আমরা পার্শ্বাই প্রথম বর্ষের শ্রীঅর্জুন সেনগুপ্ত ও শ্রীঅরুণাত দাশগুপ্তকে। যে আশা নিয়ে আমরা এই অব্যবহারসিদ্ধ কাজ করলাম আমাদের মে আশা ব্যর্থ হয় নি। শ্রীঅর্জুন সেনগুপ্ত এখানে প্রথম হলেন ও দুজনের মিলিত চেষ্টায় দল হিসেবে আমাদের কলেজ দ্বিতীয় স্থান লাভ করলো। কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রতিযোগিতাটিতে আমাদের কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেন চতুর্থ বর্ষের শ্রীঅমর্ত্য সেন ও শ্রীপার্থসারথি গুপ্ত। এখানের ফলাফলও অনুরূপ। শ্রীঅমর্ত্য সেন ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেন এবং আমাদের কলেজ দ্বিতীয় স্থান পায়।

“প্রতিষ্ঠাতা-সপ্তাহ” উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রদর্শনী বিতর্কের বিষয় ছিলো “The liberation of India lies in the Chinese way.” প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত ও অধ্যাপক অল্পান দত্ত এবং বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে শ্রীমুখাংশু দাশগুপ্ত, শ্রীপার্থসারথি গুপ্ত, শ্রীমুখময় চক্রবর্তী, শ্রীপ্রদীপ দাস ও শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেন।

এরপর পর পর দুটি আন্তঃকলেজ বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় তৃতীয় বর্ষের শ্রীপ্রদীপ দাস প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ দুটির উদ্যোক্তা ছিলেন যথাক্রমে India Tomorrow Club এবং B. E. College Students' Institute, দ্বিতীয় বিতর্কটিতে দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপও আমাদের প্রতিযোগীরা জিতে আনেন। শ্রীমুখ দাসের সহযোগী হিসেবে এখানে ছিলেন প্রথম বর্ষের শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়।

মার্চমাসে আমরা একটি বাংলা বিতর্কের আয়োজন করি। বিষয় ছিলো, “বর্তমান যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রসাহিত্য অনাধুনিক।” দুজন ছাত্রী—শ্রীভারতী সেনগুপ্ত ও শ্রীমৌনাক্ষী বসু এই বিতর্কে যোগ দেন। সভাপতির অভিভাষণে অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য উত্থাপিত প্রস্তাবের এবং বিতর্কের মানের সমালোচনা করেন।

এই মাসেই অনুষ্ঠিত তিনটি বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় আমাদের প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। প্রথমটি পুনরায় India Tomorrow Club এর উদ্যোগে। উভয় পক্ষের শ্রেষ্ঠ বক্তারা এখানে পুরস্কৃত হন। আমাদের প্রতিযোগী শ্রীপ্রদীপ দাস অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বক্তা হিদ্বে পুরস্কার পান। ল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তঃকলেজ বিতর্কটিতে শ্রীপ্রদীপ দাস আবার প্রথম হলেন। দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্তু সাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রদের সংগে আমাদের দলের “tie” হয়। আমাদের দলের দ্বিতীয়জন ছিলেন শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়। তৃতীয় বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় ফলও সমস্তাষজনক হয়েছিলো। এতে যোগ দেন শ্রীমুখচিত্র চক্রবর্তী ও শ্রীপ্রদীপ দাস। উভয়পক্ষের শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসেবে এঁরা দুজনেই পুরস্কৃত হন।

গ্রীষ্মাবকাশের ঠিক আগে একটি প্রদর্শনী বিতর্কের আয়োজন করা হয়েছিলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এটি বর্জন করতে হয়।

গ্রীষ্মাবকাশের পরে জুলাই মাসে “For the purposes of human progress what is needed is not a denial of religion but its renovation.” এই সিদ্ধান্তের ওপর প্রথম বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। সন্তোষহর্গত শ্রীপার্শ্বসারথি গুপ্ত ও শ্রীঅমর্ত্য সেন এতে যোগ দেন। পরের মাসে এক বিপুল জনসমাগমের মধ্যে “Individual liberty does not and cannot exist in any form of society today,” এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক সভা হয়। বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকেও আগ্রহভরে এই প্রদর্শনী বিতর্কটি শোনেন। প্রখ্যাত বক্তাদের মধ্যে এই বিতর্কে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অলান দত্ত, শ্রীমুখাংশু দাসগুপ্ত ও ইবিষ্কু মুখোপাধ্যায়।

পরের সপ্তাহেই জামানাম আমেরিকান ছাত্রদের একটি দলকে আমরা এক সিমপোসিয়ামে আমন্ত্রণ করি। আমাদের কলেজ দল গঠিত হয় শ্রীঅমর্ত্য সেন, শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত ও শ্রীপার্শ্বসারথি গুপ্তকে নিয়ে। আমেরিকানদের মধ্যে Mr. Jack Mackeene ও Miss Vivien Robinson এর বক্তৃতা ধারালো হয়েছিলো। আলোচনা এনসে উভয়পক্ষের মধ্যে বিরোধিতার সৃচনায় অধ্যাপক অনিয় মজুমদারের চেষ্টাতে মিটমাট ঘটে। এরপরে প্রথম বর্ষের ছাত্ররা একটি বিতর্কের অনুষ্ঠান করেন।

সেপ্টেম্বর মাসে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর বাণিজ্য-বিভাগের ছাত্ররা একটি আন্তঃকলেজ বিতর্ক-প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। চতুর্থবর্ষের শ্রীপ্রদীপ দাস ও শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত এখানে আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন। শ্রীক্লদ দাস যষ্ঠবার প্রথম পুরস্কার পেলেন আর টিম চ্যাম্পিয়ানশিপ শিল্ডও আমাদের হাতে এলো।

বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে আন্তঃশ্রেণী বিতর্ক-প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এয়ারের কার্যক্রম শেষ করা হলো। বাংলা ও ইংরেজী উভয়ের প্রতিযোগিতাই একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। বাংলা বিতর্কের বিষয় ছিলো, “ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ একটি ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণী।” তৃতীয় বর্ষ এতে জয়ী হন। বক্তৃতা ভাবে কৃতিত্ব দেখান তৃতীয় বর্ষের শ্রীশিশিরকুমার দাস (প্রথম), দ্বিতীয় বর্ষের শ্রীদীপেন্দ্রনাথ রঙ্গ্যাপাধ্যায় (দ্বিতীয়) ও প্রথম বর্ষের শ্রীমলয়েন্দ্রকিশোর চৌধুরী (তৃতীয়) ইংরেজি বিতর্কের প্রস্তাব ছিলো, “The neutrality of India in the present-day world politics is an absurdity.” এতে জয়লাভ করে চতুর্থ বর্ষ। প্রথম হন শ্রীপ্রদীপ দাস (চতুর্থ বর্ষ), দ্বিতীয় শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত (চতুর্থ বর্ষ) ও তৃতীয় সংযুক্তভাবে শ্রীঅজিত রায় (চতুর্থ বর্ষ) ও শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় (দ্বিতীয় বর্ষ)।

অভাব অভিযোগের কথা তোলা বোধহয় নিরর্থক। পূর্ববর্তী সম্পাদকেরা বিতর্কবিভাগে অধিকতর ব্যয় করার দাবী করেছিলেন। এবার অবশ্য নির্দিষ্ট পরিমাণকেও হ্রাস করে দেওয়া হয়েছিলো। তবে উত্তরসূরীদের পূর্ণ আশা আছে। উদার নীতির সূত্রে তাঁরা মিলিত হয়েছেন। সূত্রাং ইউনিয়নের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটিকে পঙ্গু করে দেবার মনোভাব তাঁদের থাকবে না বোধহয়। আমরা তো কেবল অর্থাভাবের জন্তই আন্তঃকলেজ বিতর্ক-প্রতিযোগিতা আহ্বান করতে পারিনি। তা সত্ত্বেও শেষের দিকে কয়েকটি ঘটতি পুরণের জন্ত যথাস্থ মহাশয়ের দ্বারস্থ হতে হয়। প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে তিনি আমাদের খুবই উপকার করেছেন।

পরিশেষে, যে সব অধ্যাপক এবং ছাত্ররা সর্বদা বিতর্কের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন তাঁদের বহুবাদ গনাই। শ্রীজ্যোতির্ময় দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ, আমার অনেক কাজই তিনি করে দিয়েছেন। প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদার, প্রাক্তনছাত্র শ্রীদীপক রায় ও চতুর্থ বর্ষের শ্রীঅজিত রায়ও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

সুশান্ত বহু—সম্পাদক

নাট্যপরিষদ :

নিছক গতানুগতিকতাকে বর্জন করবার জন্তে এবার আমরা প্রয়াস পেয়েছি। এর একটা পরিচয় এই যে প্রতিষ্ঠানবিশ্ব উপলক্ষ্যে বোধহয় এই প্রথম নাট্যপরিষদের তরফ থেকে একটি নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা হোল। স্ববোধ বহু রচিত কোতুক নাটিকা 'অতিথি'তে অনেকেই প্রতিভার পরিচয় দেন।

বহুপ্রত্যাশিত বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠান রূপায়িত হ'য়েছিল ১৮ই আগষ্ট নিউএম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে। বিষয়বস্তু—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্নিবাহণ' এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'উনপঞ্চাশ নম্বর মেস'। দ্বিতীয় নাটকটিতে আমরা অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করেছিলাম বললে বোধহয় অতিরঞ্জিত হ'বে না। তবে দর্শকদের হাশ্রোচ্ছাসের ফলে নাটকের গতি ব্যাহত হ'ছিল। সেটার কারণ নাটকের প্রাণবস্তুর আবেদন। তাই এতে তাঁদের দোষ দিইনা। 'অগ্নিবাহণ' নাটকটিতেও বিভিন্ন টাইপ চরিত্র রূপায়ণে প্রত্যেকেই কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

বাহিরের শিল্পীকে কলেজের আসনে আসন দেওয়ার রীতি আমরা পরিত্যাগ করেছিলাম। তাই আমাদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল ছাত্রদের মধ্যে। যন্ত্রসংগীত রচনায় প্রেসিডেন্সি কলেজ অর্কেস্ট্রা কৃতিত্বের দাবী করে। এটি আমাদের উৎসাহে গ'ড়ে উঠেছিল—আশা করি পরবর্তী যুনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হ'বে।

এবারে ধন্যবাদের পালা। নাটক পরিচালনার কৃতিত্ব একক নয়—সেটা সামগ্রিক। তাই যেসব ছাত্রবন্ধু আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে সকলের নামোল্লেখ সম্ভাব্যতার বাইরে। তাই তা' থেকে বিরত রইলাম।

সবশেষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীযতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং অধ্যাপক শ্রীমনোমোহন ঘোষকে—যাঁদের সহায় উপদেশই ছিল আমাদের বাত্বাপথের শ্রেষ্ঠ পাথের।

গোতমকুমার সরকার—সম্পাদক, নাট্যপরিষদ

পাল্‌স্‌ কমন্‌স্‌ :

পত্রিকায় ছাপাবার মত মস্ত কোনও কাজ আমরা এবার করিনি। এ বছরে আমাদের কাজ ছিল প্রধানতঃ দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগগুলোর প্রতিবিধানের চেষ্টা করা। জলের অভাব মিটেছে—ছাত্রীদের কমনরুমে ম্যাগাজিন আসে। অবশ্য কমনরুমের আয়তন সম্বন্ধে আমাদের যে অভিযোগ সেটা দূর হয়নি—অদূর ভবিষ্যতে হবে এমন আশাও নেই। তবে ছাত্রীদের তরফ থেকে এটুকু দাবী নিশ্চয় করতে পারি যে এবছরের ছাত্রীরা কলেজের সব কাজেই অংশগ্রহণ করেছেন। ইউনিয়নের নির্বাচনে গত বছর পুরবী বহু নির্বাচিত হয়েছেন, গৌরী দাসগুপ্ত অত্যন্ত যোগ্যতার সংগে দর্শন সেমিনারের সেক্রেটারীর কর্তব্য করেছেন, মলি ঘোষ খেলাধুলার বিভাগে ছাত্রী প্রতিনিধি হিসেবে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, বিশেষতঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভ্যর্থনা সভায় ছাত্রীদের সহযোগিতা লক্ষণীয় ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ছাত্রীদের কমনরুমের তরফ থেকে শুধুমাত্র ছাত্রীদের একটি বিতর্ক-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক অমিয় মজুমদার। তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ভারতী সেনগুপ্ত, সম্পাদিকা

গণিত সেমিনার :

হঠাৎ-না-বলে-চলে-বাওয়া সম্পাদক অমিয় মাইতি সারা বছর কি করেছেন জানিনা—তবে কিছুদিনের জন্ত সেমিনারের কাজ পেয়ে আমরা ত্রুটি কাজ করেছি—ছাত্র-ছাত্রীদের বই দিয়েছি সেমিনার লাইব্রেরী থেকে—আর বিদায় দিয়েছি আমাদের প্রিয় অধ্যাপক ডক্টর সনৎকুমার বহুকে। তাঁর চলে যাওয়াতে ছাত্র-ছাত্রীরা হারিয়েছে

আমাদের কথা

একজন মনোবীর সান্নিধ্য—শ্রীযুক্ত বহুর সঙ্গে যে মধুর সম্পর্ক আমাদের গড়ে উঠেছিল তা যে এত শীঘ্র ভেঙে বাবে আগে ভাবতেও পারিনি।

ছুটির কিছুদিন আগে ডক্টর বহুকে বিদায় অভিনন্দন দেবার আয়োজন করা হয়। ডক্টর বহু নিষ্কারিত সময়ের মধ্যেও না এসে পৌঁছুলে বাস্তব হয়ে কয়েকজন ছাত্র অভিনন্দন-পত্র নিয়ে ডক্টর বহুর বাড়ি যান। ডক্টর বহু সেখানে যা' বলেন তা' সত্যই মর্মস্পর্শী। তিনি বলেন, “আজকের দিনে তোমাদের মেহের দান আমি কোনও রকমেই ভুলতে পারবনা। তোমরা যে আমাকে এত ভালবাসতে তা কোনওদিন কখনও করতে পারিনি।” ডক্টর বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ছুটির পর আবার একদিন এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন।

সুনীল পাল, রণজিৎ ঘোষ

ইতিহাস সেমিনার :

আমাদের সেমিনারের কাজ বেশ দ্রুতগতিতেই এগিয়ে চলেছে। সেমিনারের এবছরের কাজের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল Seminar Constitution-এর আমূল পরিবর্তন। এই নতুন ব্যবস্থাতে Under-graduate এবং Post-graduate সেমিনার দুটি এক সংযুক্ত সংস্থায় পরিণত হয়। এই সঙ্গেই আমরা উদ্বোধন করেছি আমাদের একটি প্রাচীরপত্রের। শ্রীবরণ দে ও শ্রীমৃগাঙ্ক রায়ের সম্পাদনায় প্রাচীরপত্রের কাজ ভালই চলেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন বিপ্লবগুলিকে অবলম্বন করে আমরা একটি প্রবন্ধমালার আয়োজন করেছিলাম। এর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবন্ধ পড়েন, শ্রী অরুণকুমার ভাট্টা (চতুর্থ বর্ষ), শ্রী অনিল দাশগুপ্ত (ষষ্ঠ বর্ষ), শ্রী পার্থসারথি গুপ্ত (পঞ্চম বর্ষ) ও শ্রী দীপেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ষষ্ঠ বর্ষ)। এছাড়াও আমাদের আমন্ত্রণে শ্রী দেবেশ দাস এক বিশেষ অধিবেশনে Romance of Rajasthan শীর্ষক একটি হুল্লিভিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভারতীয় ইতিহাসের পর্যায়ক্রম সম্পর্কে আর একটি অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রী বরণ দে (পঞ্চম বর্ষ)। সেমিনার লাইব্রেরীর নিজস্ব দগ্ধ গড়ে তোলার জন্ত আমরা একটি Seminar fund-এর স্থাপনা করে কাজ আরম্ভ করেছি।

এবছর বিভিন্ন সময়ে চারবার আমরা সামাজিক অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছিলাম। জানুয়ারী মাসে বিদ্যায়ী চতুর্থ বর্ষকে এবং অক্টোবর মাসে বিদ্যায়ী ষষ্ঠ বর্ষকে আমরা সম্বর্ধনা জানিয়েছি। জনপ্রিয় অধ্যাপক শ্রী ভবতোষ দত্তের বিশেষ যাত্রায় ইতিহাস সেমিনার তার এক দরদী বন্ধুকে হারিয়েছে। তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে আমরা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। এছাড়াও আমাদের প্রাক্তন ছাত্র মিলনী সাকফোর সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় স্তম্ভ জন প্রাক্তন ছাত্র এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠানের সাকফোর জন্ত অনেকের কাছেই স্বণী। এই প্রদক্ষে বিশেষভাবে ষষ্ঠ বর্ষের শ্রীস্বর্ষ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীস্বর্ষনন্দন মল্লিক (ষষ্ঠ বর্ষ)

শ্রী দিলীপকুমার ঘোষ (চতুর্থ বর্ষ)

অর্থনীতি দপ্তর :

পরিষদের কর্মসূচিপরিচালনার ভার আমার হাতে আসার পর আমাদের সেমিনারে উল্লেখযোগ্য মাত্র তিনটি কাজ হয়েছে : দুটি রচনা পাঠ ও উক্ত ভবতোষ দত্তকে তাঁর বিদায় উপলক্ষে অভিনন্দন জ্ঞাপন। রচনা দুটির বিষয় ছিল ‘India’s Five Year Plan—its promises and how far they will be realised’ এবং ‘Dynamic fluctuation in an underdeveloped economy.’ প্রথমটি পাঠ করেন শ্রী প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত এবং দ্বিতীয়টি শ্রী মিত্রকুমার রক্ষিত। দুটি বৈঠকই খুব উপভোগ্য হয়েছিল।

এক গাণ্ডীর্ষপূর্ণ সভায় উক্ত ভবতোষ দত্তকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। সভার শেষে উপস্থিত বাক্যকে জনযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

কলেজ লাইব্রেরী থেকে অনেক বই এবার আমাদের সেমিনারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এজ্ঞে অধ্যাপক যোষালকে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

সেমিনার কম সম্পর্কে আমাদের অভিযোগ বহুদিনের। ঘরটা অন্ধকার, সঁাতসেতে। শুনেছি সেমিনারটিকে কলেজ গৃহের অল্প কোন অংশে স্থানান্তর করার জ্ঞ কতৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু এ পর্যন্ত কোন ফলই পাওয়া যায়নি।

দুর্গাদাস রায়,—সম্পাদক অর্থনীতি সেমিনার

রাজনীতি সেমিনার :

সেমিনারের উপকারিতা দ্বিবিধ, প্রথমতঃ বই আদান-প্রদান ও দ্বিতীয়তঃ আলোচনার সুযোগদান। দুটুকু দিয়েই বোধহয় আমরা পুরো সুযোগটা নিতে পেরেছি।

তৃতীয় বর্ষ পাঠচক্রের কাছ থেকে কয়েকখানি অতি প্রয়োজনীয় বই পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া লাইব্রেরীর থেকেও অনেক নতুন বই আনা হয়েছে।

আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছিল দুটি। প্রথম সভাটিতে শ্রীঅজিত রায় “The Phase of Socialism in India” প্রবন্ধটি পাঠ করেন অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে।

দ্বিতীয় সভাটিতে New York School of Social Research-র অধ্যক্ষ Dr. Saul. K. Padover History of Political democracy in the U. S. A-র ওপরে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা থাকায় সভাটি বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছিল।

আমাদের পূজোর বন্ধের আগে আর একটি কাজ ছিল—অর্থনীতি দপ্তরের অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্তকে বিদায় সম্ভাষণ জানানো।

বক্তব্য শেষ করার আগে ধন্যবাদ জানাই সভাপতি অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ যোষাল মহাশয়কে তাঁর মূল্যবান উপদেশের জন্তে। দপ্তরের অস্থায়ী অধ্যাপকদেরও আমাদের নানাভাবে সাহায্য করার জন্তে জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ—বিশেষ করে অধ্যাপক তাপস মজুমদারকে বাঁর পরিশ্রমে অধ্যাপক দত্তের বিদায়ী সভা হয়েছিল আনন্দ আর বেদনায় মূর্ত।

সুচিত্রকুমার চক্রবর্তী, সম্পাদক

দর্শন-পরিষদ :

বছরের শেষে দর্শন-পরিষদ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আমাদের চারিটি অধিবেশনের মধ্যে প্রথম আলোচনার বিষয় ছিল দর্শন ও বিজ্ঞান। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীমধুসূদন মৈত্র “যুক্তি ও ধর্ম” সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি ছিলেন শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী। তৃতীয় অধিবেশনে ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়েন শ্রীমতী মণিকা চট্টোপাধ্যায়। সভাপতির আসনে ছিলেন শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী। চতুর্থ অধিবেশনে ‘জড়বাদের সমর্থন’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীঅশোক গাঙ্গুলী। এদিনও সভাপতি ছিলেন শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী।

অস্থায়ী কাজের মধ্যে আমরা একটি বিদায় সভার অনুষ্ঠান করে আমাদের পূর্বগামীদের শুভকামনা জানিয়েছি। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীনিখিলচন্দ্র সেন অবসর গ্রহণ করেছেন। নানাভাবে তিনি আমাদের সাহায্য করে এসেছেন। তাঁর সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা ভুলবার নয়। তাঁর বিদায় সভায় মিলিত হয়েছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ, দর্শনবিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীরা। শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী তাঁর পরিবর্তে এসেছেন। তাঁকে আমরা জানিয়েছি আন্তরিক অভিনন্দন।

গৌরী দাসগুপ্তা, সম্পাদিকা

PRESIDENCY COLLEGE FOOT-BALL TEAM—1952

RUNNERS-UP

HARDINGE BIRTHDAY CHALLENGE SHIELD



LEFT TO RIGHT: (Sitting on the Ground)—M. Das Gupta, S. Bose, A. Sircar.
(Sitting on Chair)—P. Gubathakurta, S. Chatterjee, Sri N. N. Chatterjee, Principal J. C. Sengupta
Prof. J. Choudhury, K. Dutta Gupta (Captain), N. Dutta (Secretary).
(Standing)—Bostom (Bearer), N. Ghosh, N. Ganguly, D. Das Gupta, B. Barman, A. Chakravarty
S. Chakravarty, S. Sānātani, B. Niyogi, Chandra (Bearer).

THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

EDITORIAL

Notes and Comments

To get an issue of the college journal together is a task which though not to be described as a job of Hercules, is, nevertheless, one of considerable difficulties. People do not seem to agree as to what should be the aim of a journal like this. There are, for instance, those amongst us who hold that it is the duty of the journal to focus our attention on what our students are doing outside the class room. The ideal issue, it seems, would be an impressive collection of the reports of our different committees punctuated by about half a dozen photographs of the same. This ideal is strongly criticised by another school of opinion, which dislikes committee reports, hates group photographs, and would like to get from their journal a series of edifying articles set off to perfection with a nice sketch or two. There are people who want us to bring out an extremely progressive issue attacking all conceivable things under the sun. There are those who would read only short stories and nothing else and there are those who would like the editorial to be written in verse. All these make up that dynamic entity which we know as the Presidency College.

Subject to the ultimately determining influence of the economic factor, your journal strives, as best as it can, to act the mirror to all these different shades of opinion. Here is with you, what we trust to be, a representative cross section of the things that Presidency College does or feels. But this is no more than a cross section. The numerous bits that remain unpublished demand we make a few general comments about them. It is an obligation we owe them and it is a duty towards you that we have assumed. We are convinced that it is only by telling you what we feel about the things we got and the things we ought to have got but did not, that we can make a better job of our second issue, which—now that the first is already in print—is our main preoccupation.

A journal, if it is not to be cordially disliked by all, has to present a well balanced page of contents. But our contributors, it appeared, had made up their minds not to stand any nonsense in the shape of an editorial policy. We tried to procure a presentable one-act play. We failed. We expected some of our people to come forward with some neatly turned out opinions about the latest additions in the field of books. No one did. We felt at least a short discussion on some international topic was badly needed. Our contributors ignored our feelings. The element of variety could not be smuggled in.

People who wrote displayed a remarkable penchant for short stories and what appeared to be suspiciously like prose lyrics. The run on short stories was very unfortunate. We have to lay aside regretfully some very cute attempts in this domain. We really wish these people—very accomplished writers most of them—had tried their hands at something else. The same is true of that undoubtedly difficult subject of prose lyrics. Our contributors came out as very good writers of prose but their lyrical ambition somewhat let them down. Our scientists from whom we expected discussions on scientific subjects in a popular vein, sent in very little. And most of this little appeared to be forbiddingly technical.

Our friends, on the whole, have been exceptionally co-operative. And we hope we have done nothing to lose this co-operation. A somewhat more judicious selection of the subject matter will, we feel, make a world of difference and we shall be spared the agonizing spectacle of able contributors unnecessarily jostling with each other in an overcrowded field. And, incidentally, you will get a much better journal.

There is a very obvious topic, neglected by our contributors, which, we believe, can easily yield very satisfactory results, if handled brightly and judiciously. That is our college. Presidency College, these days, is displaying what one of our contributors would term, a very remarkable tendency towards 'association'. At the same time, we fancy, an acute conflict is going on amongst us between different sets of attitude. We should like to make our meaning clear. That our students are very much active outside their class rooms should be obvious. All our secretaries seem to be enthusiastic about it. We should like, however, to draw your attention particularly to a couple of things with which this journal feels connected. The activity of our study groups is a very pleasing feature in our academic life. The Third Year Study Circle is a very important body. In their third year people can take their time and study things which within a year from now it would be quite impossible for them to do. The reason is obvious but as it is not considered good form to discuss unpleasant things, we do not mention it. We on our part, however, expect great things from this study group and we are looking forward to the journal that they tell us they are going to bring out. We also

expect to hear about a First Year study circle very soon. Some of our talented friends have got together a group which they call the Poetry Association. We sincerely hope they are going to think up some very fine poetry and give it to us next time we go to press.¹

Apart from these study groups another interesting feature of our academic life is the running of a few hand-written sheets. The College wall newspaper, *Dewali*, is already an established institution. Only very recently our scientists have begun taking a hand in its shaping. This is certainly encouraging but they must always bear in mind that whatever they have to say, has to be said in a popular vein. Otherwise the purpose of that sheet will be defeated. The enterprising folks of our First Year classes have their *Prathama*, which maintains a surprisingly high standard and almost invariably manages to come out in an impeccable get up. The History Seminar Wall Newspaper has nothing to boast of in its turn-out. But it maintains a fair standard and it is the only sheet which has some of our professors and ex-students as regular contributors. Incidentally, it is interesting to note, that all the seminars of the post graduate department of our University have their own organs. The History Seminar has made a beginning which we think can well be followed up by the others. All these sheets serve the same purpose as does this journal. They enable us, moreover, to maintain a profitable lookout for possible contributors. And with the coming out of this issue, they are, we are sure, going to give us a crop of critical notices which cannot possibly be flattering but which will, nevertheless, be an invaluable aid to us.

This much about the very praiseworthy things that our friends are doing. These are all facts and no fancy. But the thing we are going to suggest next is, undoubtedly, a conclusion on our part, and if the reader himself has not felt it, it can, assuredly, be dismissed without a second thought. The general attitude of the Presidency College, we suggest, is getting more and more positive and what is singularly unfortunate, more and more narrow. All this is bound up, ironically enough, with our various progressive opinions. People are not only progressive—which is a very excellent thing—but are impatient of anything which is not. This last is not only unfortunate but dangerous. This is evident in what we are writing in the columns of the *Dewali* and the *Prathama*. This is evident in what we are saying in our seminar discussions. This is evident in the very way we speak in our debates. Our generalizations are sweeping, our assertions are categorical and conclusions, necessarily, catastrophic. A well-balanced attitude is fighting a rearguard action all along the line. But it has not lost out yet and there is still time to rally. We shall give what we consider to be a

¹ Please give us a chance to do something which may please you. When you form a study group try and tell us about it so that your journal can take up an important aspect of the academic life not covered by your secretaries' reports—B.D.

typical example. Some time back a batch of American students visited us. We met them at a symposium, the subject for discussion being Academic Freedom in Universities. Our debaters straightaway threw all caution to the four winds and plunged in denouncing American Imperialism. The standard of debate in this college is as good as ever. And when that exceptionally skilful debater, Sj. Amartya Sen, launched his scornful shafts at the American attitude towards world problems to-day, the lecture theatre shook to the sound of stormy applause. Our visitors appeared a bit taken aback. So along came the tactful rejoinder from the chair that all this does not mean that we bear any ill-feeling towards the Americans. One expected a stony silence to greet such tact. But one was really relieved to hear Presidency College obliging with another burst of spontaneous applause. That is why we say that a sane attitude is still behind its guns. If we can persuade our progressives that a thing that exists is not necessarily bad, that a generalization must have its loopholes, and that the best way to arrive at truth is to listen to what the other fellow is saying, we can still win out. Presidency College may be aggressively progressive, but Presidency College has as yet, never been bigoted.

It is very difficult to say why none of our contributors tried to tackle the topic of Education. A journal of this type, however, cannot allow itself to be presented without something being said about this subject somewhere in its pages. The topic is not easy to deal with and the pen that now is constrained to make the gallant but presumptuous attempt is far from being competent.

It is, nevertheless, possible to present a few facts which would outline some of the features of what the journalists love to describe as the Crisis in Education. That something has gone wrong is obvious but the thing that has gone wrong here with us is not the thing that worries people over there in the U.S.A., Britain or Russia. But both of them are connected. We shall try to show how.

In Britain and the U.S.A. it is held that people have different mental capacities and it is not possible to give *all* of them any very high standard of education. To determine the capacity of a student they rely almost exclusively on I.Q. tests. The concrete results so far have been that in Britain, where they accepted the principle of universal education back in 1870, the act of 1944 has acknowledged *in principle* secondary education for all with a leaving age of sixteen, and in U.S.A. they insist upon equal opportunity for all with a general uniformity up to the age of eleven. In both the countries there is a wide variation in the standard reached and in U.S.A. in particular it varies from state to state.

In Russia, they believe that it is possible to educate *everybody* and up to a *very fair standard*. It is only after this stage has been reached that the question of aptitude comes in. This attitude of theirs is based upon a

denial of the efficacy of the I.Q. testing system. They claim that data gathered on observation contradict the results given by intelligence testing and that children from unfavourable environments are adversely affected by the system. They have made seven years' schooling compulsory for all children after which the institute called *Tekhnikum* gives four years of vocational training. There are also special centres where higher studies in the humanities can be undertaken. By 1960 they hope to extend the compulsory schooling period to ten years. Prof. Giles is of opinion that this ten years' schooling would enable all the Russian children to reach the old matriculation standard of the London University.²

This feat of the Russian government, which can, perhaps, be described as commendable, has set the people in Western Europe, thinking. And as it happens so often, these days, when people indulge in thinking, they think politics. In the U.S.A. they are persuaded that if Russia can educate her people and if the free world cannot, then Communism will spread. Thus for an example if the Jamaicans find that after three hundred years' of British rule 80 per cent of their people are illiterate while in Russia within thirty years of their revolution they have achieved cent per cent literacy, then they may very likely commit the blunder of equating communism with education and democracy with illiteracy.³

This acute reasoning on their part has made the United States do a thing which, peculiarly enough, is not at all a bad one. They have poured out money to get the UNESCO going and the UNESCO is one of those bodies which enable us to think that all sanity is not lost yet. They are working right in our midst and they are doing good work. This brings us to our own problems and worries. The experts of the UNESCO have already undertaken studies of the educational system in Thailand, the Philippines and Afghanistan. The reports they have submitted are instructive. In Thailand, we are told, the government passed a law of compulsory education back in 1921. Between 1921 and March 1951 the Thai cabinet changed fifteen times. The Thai people got fifteen different educational policy statements. The sum spent on education rose by one per cent. And there it stopped. These are facts which some people have found amusing and others, grim. They are undoubtedly peculiar but very typical. The report about the Philippines is severely critical and that about Afghanistan is not exactly complimentary. The experts came to the conclusion that to do anything good these people have to change their social set-up a bit, regulate their finance, eliminate corruption and show some efficiency.

² Prof. Giles in the spring issue of the *Anglo-Soviet Journal*, 1952.

³ They may not be as clever as Prof. Dobinson, who points out that Russia could do it only through the coercive power that it exercises [*British Journal of Educational Studies*, May, 1953]. The force of the argument is tellingly driven home when we consider that nothing would scandalize the British Government more than any idea of using coercion in one of its colonies.

We should not of course dream of applying these observations our own country. We had our own University Commission. Scholars differ as to what has happened to the Radhakrishnan Report. Its ultimate fate is a matter of metaphysical speculation. Our government is going ahead with its scheme of spreading the light. In our Adult Education programme we are bringing our people up to the fairly high standard of class four. The new scheme of the West Bengal Government contemplates the employment of graduate teachers at eighty-five rupees a month. As a matter of academic interest we could mention that the Brooke Bond Tea Company employs labourers at not less than Rs. 120/- per month. But of course our government is not in a position to spend so much money. An irresponsible section of the students is talking about a twenty per cent budgetary allocation for education. But our authorities are persuaded that the only thing to do to these youngmen is to reorient their moral outlook, preferably through religious instructions. And there the matter rests.*

* This note was written before the students, 'apparently under the influence of external agencies', dared defy our authorities, who religiously put them down at Lucknow and elsewhere.

The Book of Psalms—An Appreciation

SANTA DAS—*Sixth Year Arts*

The Book of Psalms is an impassioned cry from the very depths of the heart of the psalmists. Through it is expressed all the faith, all the weakness and all the poetry of their souls.

Here as elsewhere in the Bible there is no philosophy, no logical argument to prove the existence of God. Faith, complete faith wipes out even the shadow of a doubt and there is nothing so simple as the calm dependence in the line "The Lord is my shepherd, I shall not want."

In their day of weakness they pray for strength, in their hour of need they pray for comfort. In psalm after psalm this cry for help, for protection, for strength swells and swells till their souls are revealed in all their weakness, in all their nakedness. They do not utter that most difficult of all prayers "Thy will be done".

They have not yet learnt to love their enemies and bless them that curse them. With a directness that is childlike in its frankness they pray for themselves, they plead their own cause—"Hear the right, O Lord, attend unto my cry, give ear unto my prayer".

There is no emotion of the human heart that has not been imaged here. All the sorrows and fears, joys and pleasures by which it is tossed, have been depicted to the life.

The distress, the pain and grief of the soul fighting against temptation, succumbing to it, are revealed in the poignant cry of the sixth psalm. "O Lord, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure; Have mercy upon me, O Lord; for I am weak."

Sometimes they are tortured with the thought that God has turned away from them. But their love remains as strong as ever, as sincere as ever. And in Psalm XIII there is all the love of a lover in the whispered prayer—"How long wilt thou forget me, O Lord? forever? how long wilt thou hide thy face from me?"

But over and above all is the prayer in Psalm LXI—condensing within it all the struggles of the human mind trying to reach what is good and best, aspiring and hoping for a better ideal, a greater goal—"Lead me to the rock that is higher than I".

Nowhere else are there expressed more happily the feelings of a soul full of joy and exultation than in the psalms of thanksgiving or the psalms of praise. In every little thing, in the little details, everywhere, the psalmists see the hand of God and sing to Him with thanksgiving for covering the heaven with clouds, for preparing rain for the earth, for making grass to grow upon the mountain. Psalm CXLVIII is the utterance of a heart filled to the full with the thought of the infinite majesty of God. It is a hallelujah of all heavenly and earthly beings. The final psalm closes in an ecstasy of praise. Its utter simplicity reveals the depth of feeling running through it like an under-current. The psalmist is overwhelmed with feeling, he cannot find words enough, means enough by which he can praise God. His over-flowing heart can only simply utter—"Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord".

The Psalms are the poetry of spiritual life. Never has thought risen so high and pure. Never has the soul revealed itself in language so tender, so sympathetic and so moving. They are the records of individual experience, they express the truth of human feelings, they give voice not to the palpable and superficial but to the secret of the inmost life. Their beauty and power never fail, for the psalms consist not of theological dogmas but of human experience, of human suffering, of human emotions which remain the same throughout the ages. And in the Book of Psalms all difference of time, of country and religion is wiped away. Its appeal is universal, its strength is abiding, its beauty is a spring-time of freshness.

Stalin's Last Thesis

SUBIR CHANDRA DAS GUPTA—*Sixth Year Arts.*

Stalin's last thesis is a statement of the ways in which the economic problems of socialism in the U. S. S. R. have been sought to be tackled. We shall try to summarise the principles and the results achieved and also to evaluate them.

The principles involved are, that natural laws depend upon objective processes and that they are immutable in a particular stage of historical development. Some of the laws are eternal, although some are not. Laws of economics fall in the latter category. Natural laws cannot be transformed but their harmful effects can be isolated. One particular law of capitalistic economy, i.e., the law of value operates on a limited scale in the Soviet economy. But its harmful effects have been got rid of. The law of value still operates because historically Russia is not sufficiently advanced to do without it. Especially the agronomy is undeveloped. But Russia can claim sufficient advance in other directions. Inequality between the town and the country, agriculture and industry, manual and intellectual labour no longer exists. Due to the development of a socialist economy under Russian guidance, capitalist countries face economic collapses and will go to war against each other. And also as Socialist economy is based upon the principle of maximum satisfaction, which is sounder than the capitalist principle of profit maximisation, Soviet economy will thrive and the capitalist system will decay.

These principles in practice, Stalin states, have led to important results. As Russian agronomy was in an undeveloped state, it could not be nationalised. Agriculture is carried on on a collective basis. There are, therefore, two economic sectors, the collectivised agronomy and the nationalised industry. The theory of value, which as a natural law, depends for validity upon objective conditions, operates in the agronomy. But the accompanying ills have been got rid of. As complete nationalisation has not been a possibility, the system of commodity production still exists. But as the state is responsible for all investments, surplus value does not appear, and, capitalism does not reappear. A war between capitalism and socialism is inevitable. And the Soviet system must win. Capitalism is weakened by booms and slumps, over-production and production for maximum profit. The Soviet system is strengthened by rising production-level, continuous production and production for maximum satisfaction. Territorial expansion of socialism has led to an intensification of strife among

capitalist countries themselves. And capitalism as a whole today thrives by militarisation, rearmament and the Korean war to make up for the loss of exploitable markets. But its basis crumbles. American dollar supremacy is only temporary—England and France are prospective rebels. Germany and Japan will resent tutelage. As capitalism all over is weakening the Soviet system is getting stronger and integrating its economic sectors in a time-scale of ten to fifteen years.

It is possible to trace both a liberal and an orthodox tendency in Stalin's last thesis. The liberal tendencies are manifested in the concessions that are made to collectivism. These are elements of pragmatism, adjusting political and economic theory to historical circumstances. Unfortunately, this liberal tendency does not extend very far. If it is possible to purify the value system of its dangers in Soviet Russia, it is difficult to see why the same cannot be done anywhere else. Logical consistency demands that we admit the possibility of purifying the value system all the world over. In point of fact, capitalism today is by and large controlled capitalism and the value system operates only through checks and balances. But apart from the logical inconsistency which Stalin's last thesis entails in so far as the value system is concerned, a more fundamental criticism is possible. Stalin advocates the theory, that natural laws depend for validity upon objective circumstances, and cannot be transformed. A theory about the operation of natural laws, seems, in the first place, beside the point in this particular context. We are more interested in the effects of the operation of natural laws, if there are actually such laws, and not with the modes of their operation. But, if there are natural laws in the Stalinian sense, they can be said to undergo occasional transformation. Considering Stalin's example of floods let us suppose two situations. In a primitive stage of human knowledge floods were generally destructive, to-day, with increased human knowledge their forces may be harnessed for electrification. The natural law can be said to have undergone a transformation, for circumstances have changed by the factor of increased human knowledge. It cannot be said that a new natural law has been created for the river is the same river and the floods the same as of yore. It is hardly a case of a restriction of destructive propensities, for, that implies some unnaturalness: Rather, to-day it is unnatural that there should be floods for destruction and natural that they should be beneficial.

It is possible to comment on the lines of economic development envisaged in the Soviet Union and detailed in the thesis. It is hoped that as the State co-ordinates the two economic sectors and helps to create ultimate conditions of full socialisation, the collective system will slowly wane away. But that is only a fond hope or expectation. It is difficult to say which sector will ultimately become preponderant. The occasional necessity of using the might of the State against the stubborn peasantry forbids over-optimism. At the same time, it is possible to visualise the

Soviet system as a single monopolistic industrial concern, of which the last thesis is a policy statement, and which carries on production with the consent and co-operation of the component parts. Hence the existence of collectivisation and nationalisation side by side.

Stalin's theory about the impending collapse of capitalism seems unsound from many standpoints. Firstly, capitalism to-day operates mostly in welfare states, and is different from capitalism whose destruction Marx prophesied. As a matter of fact, American production-level shows continuous increase and no economic slump has yet followed after the Second World War. Secondly, it is improbable that England or France would go to war with America in any near future, for not only is America immeasurably more powerful, technology has almost indissolubly linked up the respective economic structures. Germany and Japan may not go to war with America because circumstances for them are different from those that Germany faced after the Versailles treaty. Finally, it is untrue and unrealistic to suggest that the socialist and capitalist economic sectors are contradictory as the former follows a principle of satisfaction maximisation and the latter one of profit maximisation. Different industries have different highest rates of profit and it is difficult to get a highest rate of profit for capitalism as such. Again, the concept of profit is not purely momentary. Human, psychological and material factors help to develop the concept. It may be suggested that an artist does not necessarily become a steel magnate or an agriculturist joins industry because of financial gains. No body, of course, would produce if returns were less than costs, but the returns need not try to reach a hypothetical maximum.

Certain difficulties are raised when we consider the ways in which Stalin proposes to remove unequal distinction between agriculture and industry, town and country, manual and intellectual labour. Labour is supposed to be the right criterion for remuneration. Labour also has an intensive aspect. A criterion of labour-expenditure, however, is very vague. The main distributive problem is that of maintaining the supply of personnel to the essential services. A too high remuneration breeds over-competition and a too low remuneration results in under-competition. Therefore, it is possible to suggest, that the right principle should be, rather, one of fixing remuneration on the basis of supplying adequate personnel to the socially desirable industries.

At one point Stalin's thesis seems to mark an improvement on the Anti-Duhring. Removal of unequal distinctions between town and country has meant more of urbanisation. Engels thought that large towns would be scarce. But Engels naturally could not have foreseen the gigantic advances of modern technology.

To sum up, the last thesis as a statement of the ways in which the Soviet Union has tried to solve its economic problems is a tribute to pragmatism in terms of practical policy. But orthodoxy lingers—and hence

the cart-load of prophecies based upon doubtful factual evidence. Communism and the Communist Internationale have always tended to show various strata of opinion and differences between the orthodox or the rigid and the more liberal group. Bolshevism began as a rigid Marxian doctrine with its insistence upon the inevitability of the class-struggle, the dictatorship of the proletariat and the theory of surplus-value. As it came to grips with reality in the Russian state, it had perforce to re-orient itself in terms of environment and circumstances. The religious question is a case in point. Marxism, certainly, is a dynamic thing, but dynamism without the essential elements of Marxism, hardly is Marxism. Of course, Marxism has to be introduced in stages, but how do we synthesise the two absolutes of flux and pattern to suggest that the stages are created to lead to a Communist Utopia? And if we suggest that the process or the dialectics should be viewed dialectically, we reach the absurd position of judging the thing by the thing itself. And finally, Bolshevism bade good-bye to Marxism the moment it assumed the role of the guardian of law and order in Russia. The revolution was to come in industrially advanced countries, Great Britain for example. Its emergence in Russia is non-Marxism. If it is the world-situation as a whole that should decide the question of the timeliness of revolutions—it is difficult to see why the country is Russia. And it is Russia because there is a strong party organisation there which means available power. Therefore, the revolution came not because of any Marxian imperative but because of the non-Marxian element of power. The stages by which Communism is sought to be established in Russia are just those stages which Russia had not passed through to make her a proper revolution-arena. Whither this revisionism of Bolshevism?

Democracy and Freedom of Thought¹

SRI AMLAN DATTA—*Ex-Student.*

The etymological platitude that democracy means the rule of the people, and, in modern states, of the representatives of the majority of the people, has, in the present century, done dubious service to the cause that it proposes to uphold. The definition of democracy as the rule of the majority is wrong as well as dangerous. It is not by counting the heads of Hitler's supporters that one must decide whether the Hitlerite regime was democratic or not. If, in a fanatical community, the majority decides to gag the voice of all minorities, the system does not deserve to be called democratic merely because its undemocratic action has the approval of the majority. Even in its narrower connotation, democracy stands for a peaceful method of political change; and as such it stands for the right of the majority, or the representatives of the majority, to rule, *as well as* the right of the minority to try, by every peaceful means, to convert the majority. Every case of rule of a minority is a case of undemocratic rule; but not all cases of rule of the majority are cases of democracy. Without the right of the minority to convert the majority, democracy loses its dynamic significance and is turned into its opposite.

In a wider sense, democracy is not just a peaceful method of political change, but a system representing the maximum possible opportunity for the individual to develop what is unique in him and to enrich society through the contribution of his creative uniqueness. It demands, unquestionably, the right of the individual to material security, inasmuch as such security is an essential condition of unhampered growth; but it stands also for something more. If security were an end in itself, there would have been nothing to say against the security of detention camps. Democracy is as much hampered by the absence of "economic rights" as by the presence of these same "rights" in a form which constitutes a negation of political liberty and of other human rights. As a matter of fact, the rights of an individual as a man take precedence over all other rights, and these other rights are to be judged in terms of their effectiveness in sustaining fundamental human rights. Of the fundamental rights of the individual, the right to freedom of thought and expression is

¹ We had asked for and received this article from Sj. Datta a few months back. We intended to publish it in the second issue of our last session. But that issue itself could not be published. In the meantime the thoughts expressed here appeared as a chapter in Sj. Datta's book *For Democracy*. The article is now published here with his kind consent.—EDITOR.

amongst the most essential. This right is important in an ultimate as well as in an instrumental sense. In an ultimate sense, the peculiar glory of man lies in his power of contemplation and his incomparable capacity for externalising and communicating his thoughts and emotions. Ever if it were possible in a completely regimented society to enjoy to the full the material comforts of life, the best of human spirits would feel after a time that life is not quite worth living merely for the sake of such comforts. They will feel something innermost in them being starved and their manhood will rebel against the monotony of the pleasures of a predominantly physical existence.

Not less important is the instrumental value of freedom of thought. In countries like this, where the economic problem is acute, there is a not too uncommon habit of dismissing freedom of thought as a luxury, important only for the better-off people, which can easily be dispensed with till the more pressing problem of livelihood for the million is solved. This is an entirely erroneous way of looking at the question of democracy.

It is true that only a minority of people are interested in thought. It does not follow that a minority enjoys the fruits of thought. The progress of natural as well as social sciences has been due to the efforts of a small number of exceptionally gifted men ; but the discoveries made in these fields have brought benefits to numbers far exceeding those directly connected with the acts of discovery. Progress of ideas, then, is important not for a select few, but for the community as a whole. That being the case, the important question is whether, on the evidence of history, ideas have most rapidly progressed in an atmosphere of freedom or under the rule of authority. It is no use saying that those ideas alone should be allowed to circulate which contribute to progress. If historical evidence is any guide, no group of people, however wise, is competent to settle beforehand which ideas will turn out in the long run to be most conducive to progress. Even erroneous ideas have often a contribution to make, which they yield best when they are freely discussed and allowed to withdraw themselves in the normal process of time rather than in obedience to the fiat of the state. Ideas, it has long been recognised, develop through a process of mutual opposition and interpenetration, so that to raise any set of ideas to the status of a State religion and protect it against fundamental criticism, leaving only the right of annotation and interpretation of the scripture to choice devotees, is to raise an overwhelming impediment to the progress of ideas and to deprive society of much of the fruits of such progress.

But it is not simply by arresting the advance of ideas that totalitarianism brings harm to society. Not less destructive of social welfare are the atmosphere that suppression of thought produces and the many strange creatures of that vicious atmosphere. Suppression of thought is not simply a physical process ; it is a psychological process as well. It

signifies not only the act of stopping the expression of certain ideas ; it points also to the act of hating certain ideas, and of inculcating such hatred upon the largest possible number of people. By introducing in society a specially glorified variety of intolerance, it pollutes the very sources of social solidarity. Free co-operation arises from readiness to appreciate differences. Where appreciation of differences is seriously restricted, there can only be concerted action without the spirit of free co-operation. Hatred has its counterpart in fear ; and a society urged by hatred is equally urged by fear. Where differences are not respected, people have to cultivate an instinctive caution against fellow men, lest unwittingly they should betray differences which, in the eyes of authority, merit condemnation. Few things are spiritually more degrading than an attitude of continuous caution against the people who surround us. Under modern forms of totalitarianism, there is no respite from such caution even in one's relations to one's dearest people ; for the modern State has left earlier types far behind in its mastery over the delicate art of setting loved people against one another in the service of the State. Under the rule of the dictator, there is no holiday from fear.

Modern totalitarianism has, not infrequently, introduced itself with the promise of ending exploitation. It has never failed to create a new justification for exploitation. Exploitation presupposes the will as well as the power to exploit ; presupposes, that is to say, as its subjective condition, denial by the exploiter of any but an instrumental value of the individuals exploited, and, as its objective condition, great difference of power between the exploiter and the exploited. A community ruled by dogma creates both these conditions. The individual in such a community has no intrinsic value ; he is valued only as a bearer of the faith. Denial of all value of those who oppose the faith is part of the faith itself. It is easier for "true" love to go without jealousy than for "true" faith to tolerate heresy. Where there is dogma, there, again, is hierarchy, with concentration of power in the hands of the high priest. Beyond a range, the lower down a person stands in the hierarchy the more is he, in all probability, subject to exploitation. Lowest down are the "non-conformists" or the "enemies" of the regime. Where the faith of the fanatic is leavened with the merciful presumption that even the worst sinner can possibly be won over to the way of God, hatred is tempered with pity ; where that leaven is absent, every restraint is dropped. The enemies of the people must be disposed of in the shortest possible time—with time enough, possibly, to exploit the utterances of their dying moments to add glory to the rule of the dictator. Or, else—and is not that better still when coolly considered !—they may be thrown into forced labour camps, to contribute to the society they have sinned against the maximum of surplus value that the guardians of society may wisely extract from them before they enrich the soil with their bones. Said the ruler of a totali-

tarian state, with great cogency, "The labour of those deprived of liberty is being used by us on....communal and highway tasks. We did this before, we are doing it now, and we shall continue to do so. This is profitable for society." Profitable indeed, and how else could one augment such profit to society without increasing indefinitely the number of those "deprived of liberty"!

Not only is the suspicion of the fanatical rulers of a totalitarian State turned against its own citizens, but by the very single-mindedness of their fanaticism they are rendered incapable of regarding other States with anything but suspicion, unless total submission is offered as the price of friendship. The rulers of a totalitarian State are, moreover, quick to learn that the largest possible degree of obedience can be had from its citizens only when the latter, struck by some real or imaginary fear, are anxious to be protected by the strong arm of the State; and that one of the quickest ways of creating such panic amongst the people is to persuade them that the enemy is ever knocking at the door. The same course is suggested by another consideration, as dear to the dictator as it is necessary for him. The dictator requires to clothe himself with moral authority to suppress all his adversaries; and one of the easiest ways in which such suppression can be carried out with the enthusiastic support of the people is to play on their herd-instinct and deceive them into the belief that the opposition to the dictator acts under instructions from intriguing foreigners. Totalitarianism will as easily allow rival opinions to grow within the country as it will treat rival powers, reluctant to accept its leadership, as anything but wicked, furiously to be guarded against. And the cost of continuous "defence", even in material terms, is high indeed! A dictator cannot afford to give first preference to prosperity.

If freedom of thought were merely a luxury for the intellectual *elite*, if by showing democracy the door we could bring in justice and prosperity, how much of the attention paid to these ideals would have been out of place! Democracy is not just a political system; it is a way of life. The greatest enemy of the democratic way of life is fanaticism. Fanatics are rarely guilty of lack of idealism; what they lack is tolerance. It is not generally realised how completely idealism may be corrupted by intolerance. In the same proportion as the fanatic is self-sacrificing in the cause of his ideal, he feels himself duty-bound to transgress the general codes of ethical conduct in his attitude to his opponents. Through his intolerance he extends the boundaries of that field in which, self-righteously, he acts in open disregard of morality. Thus, the fanatical idealist, in the very pursuit of his ideal, builds a world in which the most insistent profession of high ideals is united with thorough-going contempt for all ideals in practice.

In Defence of P. G. Wodehouse

SABYASACHI CHATTERJEA—*Fourth Year Arts.*

It is our endeavour to claim for Wodehouse, if not an exalted place in English literature, then at least a right to be considered seriously. A systematic study of growth and development of his mind goes to show that there is a serious side to his humour. The Wodehouse effusions are a faithful and vivid reflection of the growth and development of a twentieth-century mind.

One of the most fruitful sources of humour is the ridicule of the exalted. "The coming of Gowf", one of Wodehouse's earliest stories, marks the first phase in his career of humour. As always, his humour is with a purpose. There he lets loose for the first time a tide of raillery against the high and mighty. We are transported to a mythical kingdom of Oom, ruled by young king Merolchazzar. The setting is peaceful and serene. On the broad terrace outside his palace, overlooking the fair expanse of the Royal gardens, King Merolchazzar stands leaning on a low parapet, his chin on his hand, and a frown on his noble face. The day is fine, and a light breeze bears up to him from the garden below a fragrant scent of flowers.

In elaborating the king's unsuccessful love-affairs—the cause behind that Royal frown—Wodehouse has a masterly dig at Royalty. This is the 20th century mind ridiculing a decrepit institution. The king's minstrels sing inimitable eulogies:

"Oh, tune the string and let us sing
Our godlike, great, and glorious king!
He's a bear! He's a bear! He's a bear!"

There is a light contempt for the king as a person, and a healthy one for kingship as an institution. The ridicule is extended to the servants of the king and their offices. There is a "Supreme Hereditary Custodian of the Royal Pet Dog", an "Exalted Overseer of the King's Wardrobe", and a "Supreme Splendiferous Maintainer of the Twenty-four Handicap Except on Windy Days When It Goes Up to Thirty." By a contemptuous Wodehouse, the characters are reduced to mere toys, to be played with at will.

It is a curious fact that nearly all the settings in this Wodehouse collection are almost idyllic. There is no distress in the early Wodehouse world. Peace reigns over the Wood, Hills Golf club and its ever-present

and omniscient Oldest Member. Indeed, one sees in this the reflection of the unruffled, youthful writer who says in the Preface :

“As a writer of fiction I have always till now been handicapped by the fact that my disposition was cheerful, my heart intact and my life unsoured. Handicapped, I say, because the public likes to feel that a writer of farcical stories is piquantly miserable in private life, and that, if he turns out anything amusing, he does so simply in order to obtain relief from the almost insupportable weight of an existence which he has long since realised to be a wash-out.”

With the maturing of the Wodehouse mind, the contempt for royalty in particular gave way to a contempt for aristocracy in general. We find a new series of characters taking the field—prosperous, contented and eccentric earls, planted in rich and sumptuous castles. At this stage, the Wodehouse earls are eccentric rather than idiotic ; as yet, no commoner-intellect, like the valet’s or the butler’s, is there to set off their idiocy. The trend is there. There are efficient secretaries—witness Rupert Baxter—who are much more efficient than their masters. There are free-lance consulting agents like Psmith (spelt with a P which is silent) who prove their commoner-intellect to be superior to the intellects of their blue-blooded masters. There is a consistent effort to bring down the aristocracy from its undeserved pedestal, but as yet, not to the gutter—not yet by butlers and valets.

In the next phase, the Wodehouse earl changes for the worse. There is no venom in the raillery ; there is no rancour. But the ridicule is more pungent. The nobility is not merely eccentric ; it is decidedly foolish. And the new lords are fat, inactive and definitely less affluent.

The Earl of Emsworth and Lord Hoddesdon may be said to represent the two types. In the first place, the former has a more respectable name. Later names in Wodehouse tend to grow increasingly absurd. Secondly, where the former is merely eccentric, the latter is very much of an imbecile.

The superiority of the commoner over the aristocrat is painted in firmer lines. Hoddesdon’s son, Lord Biskerton (nicknamed, incidentally, the “Biscuit”), is contrasted with Conway : the former’s lethargy with the latter’s alertness ; the latter’s capability with the former’s general uselessness. And the nobility, as hinted at earlier, is now impoverished. Biskerton is in the habit of chasing his friends for fivers. Hoddesdon is in a chronic state of bankruptcy.

It is noticed that the idyllic settings have disappeared. Much of the action takes place in busy London. There is, fittingly, a new type of character, the rich industrialist from America, typified in T. Paterson Frisby, the “T” standing, we are informed confidentially, for Torquil.

It is significant that Wodehouse is more bitter towards the millionaire than he is towards the earl. The former is presented in all his miserly

meanness, not hesitating, in the case of Frisby, to blight the happiness of his niece for the love of his bank balance. Frisby's blatant betrayal of the trust Conway placed in him is painted in garish colours.

In contradistinction, Hoddesdon and Biskerton are things apart from the dyspeptic world of Frisby. They are comic, good natured, even loveable ; only they are much too cloth-headed.

This introduction of the American millionaire into English society is a reflection of the social changes that took place in the England of the late thirties. It heralds the increasing hold of the American dollar over the English aristocrat. Wall Street financiers tend to enter the Wodehouse arena in increasingly unfavourable colours. Equally faithful is the picture of the American heiress, and her hold over the impoverished nobility of the day. Sir Arthur Conan Doyle had sung the same theme some years ago. It was already a favourite subject for journalistic banter. Wodehouse takes up cudgels with his inimitable witticisms and his unforgettable raillery.

As yet, the inferiority of Wodehouse's noble protagonist has been brought out in the domestic plane solely through domineering sisters and aunts. In later Wodehouse a new character—the butler or the valet—is introduced. This innovation serves to heighten the same effect. Mervyn Spink, a butler, is introduced as a butler who looks like a lord, while his master, a lord, looks disconcertingly like a butler. The Wodehouse butlers, and Beach is another example, identify themselves with their masters. In "Spring Fever", the earl hero in the concluding chapter is made to act the part of a butler in a Hollywood film. We leave him standing before a mirror, bowing to himself, and practising his new rôle.

Wodehouse's earl is now at his sorriest plight. The Wodehouse arena is now full of jelly-spined, cloth-headed, men-of-the-world, who are absolutely dependent on their valet-wizards. Jeeves is the prototype of these gentlemen's personal gentlemen. And in Jeeves Wodehouse has succeeded in creating a character who "lives", the essential test for a creative novelist.

It is significant that Wodehouse is the most popular lowbrow idol of present-day English literature. The years have seen in him a true reflection of the mass spirit—the general contempt for grey top-hats, the general disbelief in the intellectual superiority of the aristocrat over the commoner. Yet, an Englishman's attitude has no venom. He has an unconscious regard for age-old institutions that recall his mighty past. Wodehouse, the Englishman, has no venom either—only good-natured ridicule, and ridicule through an extremely effective medium. We see in him a rebirth of the tradition of Lambian humour, inaugurated with the much-talked-of and extremely loveable Whim Wham effusions.

One must keep in mind that Wodehouse's reflection of the mass mind remains a reflection ; at no stage does he try to propagate a philosophy.

If he presents a definite point of view, he does so unconsciously—like a true child of his age.

In an estimate of Wodehouse's treatment of aristocracy, a quotation from De Quincey will not be out of place: "England owes much of her grandeur to the depth of the aristocratic element in her social composition, when pulling against her strong democracy. I am not the man to laugh at it. But sometimes, undoubtedly, it expressed itself in comic shapes." De Quincey, it is true, could not laugh at it. But for Wodehouse, much of that grandeur has worn away, and when he laughs, he does not have to protest that he is not laughing at it, but can laugh both openly and freely.

What S. E. Maltby says of the essays of Gardiner might very well be said of the writings of Wodehouse: "They are so sensible, and they are funny without being silly." For at bottom, if we come to think of it, we find it means that his writings have shown us "something in a true light, and yet have made the vision of the truth pleasant and not forbidding."

Materialistic Interpretation of History

NITISH SEN GUPTA—*Fifth Year Arts.*

Nineteenth century European scholarship was more than a little nervous when the iconoclastic influences of Marxism invaded the field of historical thought, as that of every other branch of knowledge, seeming, as it actually did, to go counter to all fondly-cherished historical ideas. Since then Marxian historical thought has received increasing attention from the thinking part of mankind. And to-day, in the fitness of things there is a tussle between the Marxists and the so-called Idealists in the field of historical thought corresponding to the abysmal gulf dividing men in the fields of politics and culture. While the obvious limitations make it impossible to indulge in any criticism or appreciation of Marxian historiography, the following pages are intended to sketch a bare outline of the Marxist idea of history for laymen, confused amid a multiplicity of counteracting prejudices. Those well-versed in the subject must therefore be disappointed if they expect anything to feed their intellect.

The first thing to get clear is the idea of dialectical materialism which is undoubtedly the prop of the imposing edifice that is called Marxism. The genesis of this all-important principle is to be sought in the Hellenic civilisation where materialism first took its shape at the hands of philosophers like Anaxagorus and Democritus. This was paralleled by the growth of the idea of dialectics in a crude form. Eclipsed for millennia, both were revived in modern times, materialism by Bacon, Hobbes, Lock, Diderot and others, and dialectics shortly afterwards by Hegel. It was left for the genius of Marx to integrate these two thought-currents into one organic whole. Dialectical materialism as understood by him proclaimed in the first place that change takes place through the conflict and interaction of opposite forces and in the second place stood for the pre-eminence of matter over mind, of material forces over human ideas. Thus every object (thesis) in the process of transformation gives rise to an opposite tendency (anti-thesis) and the conflict between thesis and anti-thesis results in the emergence of a third thing (synthesis). Marxian dialectics, however, reflects a conflict of material forces and is thus thoroughly different from Hegel's dialectics which means the self-realization of the eternal Absolute Idea through the conflict of opposite ideas.

This law of nature, when applied to the study of history gives birth to historical materialism which recognizes change as a fundamental fact in history. Change, again, occurs at different speed in different environ-

ments. A long spell of very slow evolution is usually followed by a violent eruption through which the long-stored forces of change find release. Marxism thus regards revolution as an agent of progress.

A further feature of historical materialism is the assertion that historical development is determined ultimately by material forces which are taken to mean the material agents of production—tools and machines—together with natural resources and the skill to operate them. Marx elucidated the entire process in the following lines. "In the social production of their livelihood men enter into definite social relations that are necessary and independent of their wills. . . . The sum total of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real basis on which is reared a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. . . . With the change in economic foundations the immense superstructure in its entirety is more or less rapidly transformed. In considering such transformation a distinction should be drawn between the material economic conditions of production that can be determined with the precision of natural science and the legal, political, religious, artistic, or in a word, ideological forms under which men become conscious of the conflict between the means of production and the relations of production." Thus, Marxist historical thought which has come to be known as the materialist or economic interpretation of history rejected the previous view that rested on the conception that all historical changes are rooted in the changing ideas of human beings and that political changes are the most important of all historical changes. Marx and Engels were the first to proclaim that all ideas have their origin in material conditions and these are to be laid bare in order to understand the driving force behind political and other changes.

This is, however, not to say that they totally denied the role of ideas and institutions in the course of history. Nor does Marxism regard economic factors as the only driving force behind history. "We make our own history," wrote Engels "but under very definite presuppositions and conditions. Among these the economic ones are finally decisive, but the political ones etc. and indeed the very traditions that haunt the human mind play a part, though not the decisive part." Thus, the ideas and institutions that sprang up under Bronze Age economy in Egypt played so important a part as a stumbling block to progress that the Egyptians clung to the older economy even long after the coming of the Iron Age which revolutionized the entire technique of production in other parts of the Mediterranean world. Historical materialism, to quote Stalin, "distinguishes between different kinds of ideas and theories. There are old ideas and theories which have outlived their day and serve the interest of moribund forces in society. Their significance lies in the way they hamper the development and progress of society. But there are new and advanced ideas that serve the advanced forces of society. Their significance lies in

the fact that they facilitate the progress of society and is the greater, the more accurately they reflect the needs of development of the material life of society. New social ideas and theories indeed arise only after the development of its material life has set new tasks before society. But once they have arisen, they become a most potent force which furthers the material progress of society. It is precisely here that the tremendous organizing, mobilizing, and transforming value of new ideas, new theories, new political institutions becomes manifest."

If history is, as Marxists hold, a dynamic process how then is change operative in it? This brings us to the well-known but often misunderstood conception of class-struggle. All history, declared Marx in 1848, has been a history of class struggles, that the moving force behind all the complicated political vicissitudes has been the division of society into classes, the domination by one of others, the resultant struggle and the final conquest of the class in power by some newly arising class. What is fundamental in this conception is not the widely held but erroneous notion that opposite classes have always been engaged in cut-throat conflicts, but rather the undeniable fact of the division of society into classes in all stages of history. These classes, on an analysis of the material environments, are found, almost invariably, to be the products of the actual modes of production and exchange in particular ages. Society is dominated by the class that controls the means of production. It thus constitutes itself as the ruling class and exploits the labour of other classes for its benefit.

The forces of production are, however, dynamic rather than static and through a slow and often imperceptible but steady process of evolution they tend to take on new shapes—so much so that the corresponding social relations are often found to be lagging behind. "From forms of development of the forces of production these relations turn into their fetters" (Marx). This contradiction between the changing material forces and the moribund social relations is paralleled by the fact of the down-trodden classes engaging in a struggle against the dominant class for a re-adjustment of social relations with the changed modes of production. The whole thing in most cases culminates in a revolution with which the long-postponed readjustment of social relations comes through the victory of a revolutionary class over a reactionary ruling class. Society thus progresses through the interaction of material forces and the consequent struggle between classes, just as every object of external nature evolves through a dialectical process.

By applying all these ideas, Marxist historians have been able to trace the evolution of society through five broad historical phases—primitive tribalism, slave society, feudalism, capitalism and socialism. In the first stage, which, strictly speaking, falls within the domain of prehistory rather than history proper, the natural dangers facing man, the immense

trouble in procuring the bare necessities of livelihood and the meagre resources at his disposal forced him to live a 'communal life' based on joint effort to get food and joint appropriation of the same. Such a society, by nature, was bound to be one in which social classes could not arise. With the progress of humanity along the high road to civilization—the invention of agriculture, of pastoral farming and of the use of metals—social classes began to appear and at the dawn of history in all our known societies a smaller class of military or priestly aristocracy is found to rule over an incommensurately larger number of servile people. Slave-economy was the dominant feature of the ancient world and reached its apogee in classical Greece and Rome. The fall of the Roman Empire was more than a mere political happening; it was symptomatic of the collapse of the classical slave-economy and the beginning of a great transition that gave birth to a new social order known as feudalism which meant the replacement of slavery by serfdom. This order "rested on the self-sufficient economy of small peasant communities which themselves produced almost all their requirements in which there was almost no exchange and which received from the arms-bearing nobility protection from without and national or at least political cohesion."

Feudalism had its climax in the 12th and 13th centuries, but thereafter it began to decline with the gradual growth of various handicraft industries, of trade and commerce both on a capitalistic basis and the consequent emergence of a new class, the so-called bourgeoisie. The discovery of the extra-European world gave momentum to this Middle class by offering a far more extensive sphere of trade and exploitation. This class gradually came to combine social wealth and social power in its hands, though for a considerable time it did not assume political power. To conquer power from the feudal nobility, it had to wage three titanic battles—the Reformation in the 16th, the English Revolution in the 17th and the French Revolution in the 18th centuries, though the rear-guards of the decadent order continued to dominate Eastern Europe even after this. Finally, the Industrial Revolution of the 19th century, itself very largely a product of the phenomenal accumulation of bourgeois wealth through the plunder of colonies made large-scale industry possible and gave the capitalist order its present shape. In Asiatic societies slave-economy had been replaced long before the corresponding change in Europe by a quasi-feudal order, technically called Asiatic feudalism which did not quite resemble European feudalism in respect of external features but differed little fundamentally. The duration of Asiatic feudalism was far greater than that of its European counterpart and it was only in the 18th and the 19th centuries that this ancient regime received its final death-blow by the impact of the expanding capitalist economy of the West.

The contradictions inherent in capitalism had meanwhile been increasingly in evidence through the increasing gulf between the capitalists

and the wage-earning classes, the periodical economic crises, the unending hunt for colonial markets and the occurrence of imperialist wars at regular intervals. The mounting discontent of the labouring classes found expression in a series of uprisings that marked the history of the 19th century. All this, in the opinion of Marxist historians, signify a crisis in the old story of class struggle. The struggle between the capitalists and the proletariat, they further hold, must end in the victorious emergence of the latter and the establishment of a classless society through the conscious efforts of this revolutionary class. History is to reveal whether, or to what extent, they are correct in reading its course.

This, in short outline is the conception of history which Marx and Engels were the first to shape and which was subsequently expanded by others including such greatmen as Plekhanov, Lenin and Stalin. This revolution in historical thought was due to the discovery of the 'laws of motion' in history. "Just as Darwin discovered the law of development of organic nature, so Marx found out the law of development of human society" (Engels). Historical materialism is the result of the application in the field of history of the general law which governs the behaviour of all matter and history as such becomes a scientific study of the evolution of human society rather than a conglomeration of isolated and accidental events. This is however not to say that historical materialism has managed to reduce history to a mechanical order. Its foremost exponent made allowances for unforeseen happenings disturbing all calculations, when he declared in 1871 that history would be of a very mystical nature, if accidents were not to play an important role. Thus though classless society is a fitting goal of history, it is by no means a goal to which history leads inevitably and fatally. It is precisely here that historical materialism lays emphasis on the role of human mind that can "set the problems of progress and solve them in conformity with the historical conditions of the epoch."

Periodisation in Indian History¹

BARUN DE—*Fifth Year Arts.*

British historians and their followers in writing Indian history have generally viewed it synthetically as a record of the subjugation of India to various forces and accordingly have grouped its eras into three major classifications—the Hindu Period, the Muslim Period and the British Period. If we accept this explanation of the nomenclature, then we find that one of the main objections to it is disposed of—that there is a discrepancy in the emphasis on each period, the first two being on a religious basis, and the third only, being on domination by some power. As a matter of fact, it appears that the older school of historians have actually named the periods after the races by which they believed India to have been ruled at that time. It is in this sense, that “Hindu” is to be interpreted, as a synonym for that hybrid stock, which held sway in Northern India till the invasions of Muhammad of Ghor, and which has been proved by A. M. T. Jackson, D. R. Bhandarkar and others to be an assimilation of the various races which have poured into India in her early history. Similarly, the term “Muslim” is convenient as denoting a religious group in which the Ibaris, Khiljis, Tughlaks, Afghans and Chagtai Turks may be lumped. They were no more ethnologically a single group than they were in religion. Needless to say, the same disparities existed, though in a minimized form among the British rulers of modern India. But though there is no contradiction in the terms of this classification, the underlying idea that the history of India is to be explained by the implicit imperialism of various races over her is clearly untenable. It seems to have arisen from a self-justificatory attempt of the British historians to bring their actual imperialism in line with a continuous but fictitious trend. It is unfortunate that some backdated historians still try to perpetuate the legend.

Besides, we find that in each of these arbitrary periods, other race-groups like the Tamils and other southerners in the first, and the Marathas in the second, have held equal sway. The very theory of imperialism by one race-group being the dominant factor in Indian history seems negated by facts. Are we then to say that the Andhras and the Salankayanas, the Chalukyas and the Cholas and the Pallavas played no part in Indian history? For this is what it amounts to, if we do not class

¹ Originally read at a meeting of the College History Seminar on the 25th September, 1953. Slight additions and alterations have been made in clarification of certain points.

them all as Hindus, simply on the basis of their religion, which would create a contradiction (already referred to) with the other two periods. The domination of North over South is implied in the old classification and will not, we believe, be always borne out by facts.

On the other hand, if we do acknowledge the old periods on the basis suggested by their propagators, a close analysis will show that between the so-called periods, an interval of political flux has invariably intervened. A study of Dr. H. C. Raychaudhuri's interesting chapter on the Sorasa Mahajanapadas in ancient Northern India (in his "Political History of Ancient India) demonstrates that these years were a period of change from primitive oligarchical or popular democracy to simple monarchy, somewhat, though not completely, of the type we find in ancient Greece. All over Northern India, in Kasi, Kosala, Avanti and most of all in Magadha, strong men like Chanda Pradyota and Binbisara were concentrating the sovereignty in their own hands, from the clans and sects who had so long held it in actuality. This period was ultimately to lead to the wider one of imperialism of one state, i.e. Magadha and much later, of Kanyakubja over all the others. Again this is followed by the disruption of the "Rajput" period, when various clans, each forming a monarchy in itself, wrestled for supremacy. The same process also took place in the Deccan, although under a different form of polity. This was the period, in which, as we hope to show, the beginnings of a quasi-feudal system were laid to continue through the early part of the so-called Muslim Period. Again, the period from, say, Muhammad Tughlaq, to Akbar may correspond to a similar transitional period, for reasons which will be demonstrated hereafter. So we find that the Hindu, the Muslim and the British Period are each composed of a transitional phase and one of imperial expansion. Separatism rather than imperialism is the dominant feature of Indian history, and men like Samudragupta or Akbar shine out because they are so rare in comparison to the many rulers who have aimed at local independence.

It therefore appears that the old classification of periods is untenable. Now this gives rise to a second question—what is the true criterion for the periodisation of Indian history? Three general criteria have often been suggested—religious, political and economic. A cursory analysis of the old classification may lead us to believe that Indian history has been judged by the religious criterion: in fact a writer once called the British Period, the Christian Period. But an adoption of this criterion would force us to take a false view of Indian history, and it may be discarded without further thought. The economic criterion has been used to classify European history, and it may be desirable, in some cases to apply it to India. The fact that the only major socio-economic change that India has seen is the transposition of a colonial, capitalist economy on her dying, village culture, by the British, is, of course, incontrovertible. But this

can, by no means, lead us to believe that there were thus only two major periods in Indian history, the Pre-British and the British. Though no single era may be distinguished in which violent economic changes occurred, yet we may easily see that Indian economy was slowly progressing, and in the period of the Mughals, had been divested of much of the form that it had in the Gupta age. Therefore, although we need not challenge what some scholars still cherish as the fundamental unity of Indian culture through the ages, it is up to us to demarcate its subdivisions. Since no marked economic criterion for the pre-British ages has yet been found, we must fall back on a study of the socio-polity of India, which as we hope to demonstrate, has undergone three major changes. An analysis of Indian economy will, of course, sometimes prove useful in such a study. We would therefore propose three general periods for Indian history—Ancient, Mediaeval and Modern—the names are, of course, used because they are free from any special bias for any one criterion. They have the added virtue of familiarity to all students of history, but we must not be led into the common error of drawing any parallelism between Indian and European history, simply on this ground. It is difficult to get better names and so Ancient, Mediaeval and Modern must stand for the time being. We shall show that they are by no means identical to the Hindu, Muslim and British periods.

Little light has been thrown on the dawn of the ancient period. There are indeed large scale evidences of the settled, pastoral Mohenjo-Daro-Harappa culture spread over the Punjab, Rajputana and Sind. But this seems to have been only a regional culture and cannot be definitely proved to have had any concrete influence in Indian history, except perhaps in the sphere of religion. We can, perhaps, afford to leave out the Mohenjo-Daro civilisation in a generalised discussion of trends in Indian history, until such time, when it will be conclusively proved that there has been a continuous development from Mohenjo-Daro to the present day. This has really begun with the Aryan settlement. It was the clash of the Aryan nomadic tribes, mainly hunters and warriors with the primitive Dravidian culture, which produced a sort of fixed tribal polity all over India, even down to the Godavari and Krishna, and for all we know, beyond. The primitive Aryans did not have this polity. They had enjoyed a kind of primitive communism (of course in the widest sense of the word), but their socio-economy became complicated in contact with the Dravidians. There was a process, spread over several centuries, involving the decay of democratic life, and ultimately we find tribal chieftainship yielding place to monarchy on a separatist basis, tending sometimes towards the imperialism of the Magadhas, the Mauryas, the Satavahanas and the Guptas.

A decay of the forces governing their period is visible even during the time of Harsha. Of course, as Dr. H. C. Ray has so ably shown

in his introduction to the *Dynastic History of Northern India*, the Gurjara Pratiharas were the last of the great Indian emperors, and the Rajput age properly begins after Mahipala in 916. It has therefore been acknowledged that the ancient age ends politically with the Pratiharas in the north and the Rastrakutas in the south. The question now arises whether this "Rajput" age may be classed in the Ancient Period or within the Mediaeval Period. It ought to be noted that we do not mean to ascribe any arbitrary date for this new transitional period. The germs of it are visible in the centuries between Harsa and the Pratiharas. Profound changes seem to have been taking place in Indian polity as well as in her moral and social life. Sankaracharya and later on Ramanuja are landmarks in Indian religion, and it is certain that the Gupta Age witnessed a reform in the way of life of most Indians. Besides the leaven of various invading races like the Sakas, Kushanas, Haihayas and Gurjaras had already begun to work in Indian society. One of these changes in the social polity is to be witnessed in the administrative system. We find, all over Northern India, up to the Deccan, a revival of the clan system, presided over by a chief, who was responsible for his people and his lands to his king. This is what we might perhaps term "Samantratantra" or quasi-feudal organisation. It has been interpreted by some as simple continuation of the administrative set-up of the Mauryas and Guptas. Whereas the "mahamatyas" the "rajukas" or the "ayukta" had been officials of the king, who were appointed by him for a certain tenure, the petty "Paramesvaras" or "Parama Bhattaraka Mahipala"s about whom we hear, say in the Vodamayuta Inscription of the 12th century or in the Inscriptions of the Kalacuris of Gorakhpur clearly show a feudatory system of administration, by which the clan chiefs held a certain territory, possibly in military tenure from their king, and by which petty dynasties carried on the local government, while the monarchs co-ordinated the government. A different age is definitely coming into existence. Quasi-feudalism is the basic feature of the early Mediaeval Age and continued in full swing during the best part of the so-called Muslim Period. As a matter of fact, the Chandellas and Kacchapaghatas, the Gahadavalas and the Guhilas are an earlier manifestation of the same socio-political system which we find in the epoch of the Delhi Sultanate. All the Sultans up to Alauddin Khalji rule on the lines of centralised feudal monarchs. Their Iqtas governed by Muqtis (commandants) are incipient examples of the military tenure, which developed into jagirs, in the later sense, a complete example of the mediaeval European "feod" in the landholding sense of the term. Their provincial military levies and their linking of church and state are as near an approach to feudalism as has been achieved in India. Of course the very use of the term "quasi-feudal" shows that we do not mean to explain this polity on the lines of European development but there was a certain similarity, though in India it was more a form

of polity than an economic organisation considered in its essentials. At any rate we may group the Rajput Period with the rise of Muslim imperialism in India on a quasi-feudal basis and name the whole period Mediaeval.

There is a current conception that the Mughal Empire forms part of the Mediaeval Age. This has probably arisen from the mistaken identification of the so-called Muslim Period with the Mediaeval Period and the justifiable inclusion of the Mughals in the former. An idea that all that is modern in India had its origin with the British may have resulted in the rejection of the Mughal Age from the Modern Period. Besides modern religious biases often delude students of history into the belief that all that is Muslim is mediaeval in nature.

Quasi-feudalism in India was collapsing at the time of Panipat and the forces of transition, which were to usher in the Modern Age had already come into being. A tendency towards individualism in personal thought, an "emancipation of reason", and a synthesis of culture are visible in the potent Bhakti cults, which sweeping across the whole of India, influenced Indian life much more than did religion. There was a revolt against the mediaeval subjugation to ecclesiastical authority and the over-riding group consciousness as personified by caste. There was everywhere an atmosphere of discontent as may be studied in the popular message of the Bengali poet Mukundaram Chakravarti in "Kavikankan Chandi" or in Tukaram's Maratha ballads. A little thought will show us that this discontent was one of the exploited classes against the parasitical nobility.

It may be admitted that Mughal centralisation stifled the awakening of the lower class in about the same way as the bourgeoisie were kept down in France before the Revolution. But the tendencies of middle-class unrest seem to have been there. It is India's misfortune, that when she was weakened by the fall of the Mughal empire the British found in her, a fit ground for colonial exploitation. But the fact remains that in the Mughal Period, the Indian people, were, it might be unconsciously, awaking to a sense of their destiny. This period cannot certainly be classified as mediaeval and many of its achievements directly affect our lives. It is the dawn of the Modern Age.

The history of its rulers bears this out. Babar and Humayun might have followed the tradition of the Sultanate but the Modern Age really begins with Akbar. His mansabdari system was instituted to make the semi-feudal armies unnecessary and bind the nobles more firmly to their king. It dealt a blow to the jagirdar against whom Akbar fought all his life. He also struck at the mediaeval ulema and the old revenue system. Shahjahan might have followed a somewhat mediaeval policy, both ecclesiastical and military, but his was a temporary reaction. Aurangzeb's bigotry, thirst for uniformity and extension of frontiers were no less

modern than those of his contemporary Louis XIV. There is nothing mediaeval about the nationalist aspirations of Sivaji.

We cannot equate the British Period with the Modern Age. It is only a phase of the Modern Period which ended two hundred years later with the British conquest which in its entirety represents only that part which saw the rise of a colonial economy, stultifying the true course of Indian history and leaving behind a legacy of extra-national monopoly capitalism, which is even now showing signs of decay. We are, perhaps, ourselves in a period of transition of supreme untest, which will be classed by future historians as the beginning of a new period in which liberty in its truer economic and political sense will prevail.

Sports and Presidency College

SURYA KUMAR CHATTERJI¹—*Sixth Year Arts.*

There is a saying that Presidency College only reads and does not play. And there are people who believe this to be true. But it happens to be a myth. Mythology is a fascinating subject and people can, pertinently, be curious as to how this myth had grown up about a College which had sent out an Abbas and a Ram Bhattacharya in football, a Probir Sen and a Nirmal Chatterji in cricket, and a Dilip Bose in tennis, to mention only a few. Of course we have our limitations but we have our strong points too. A discussion about the place of sports in Presidency College has to deal with the facilities that we have, the way we avail ourselves of them and any possible improvement that may be introduced.

Our elaborately organised sports section is obviously one of our strong points. There is a council of elected representatives from the different classes. It elects its own General-Secretary and sectional secretaries. It is expected of these secretaries that they should know their jobs thoroughly. Otherwise the interest of sports suffers grievously. But these days we find the evil spirit of party politics frequently manages to place men in charge of things for which they have neither aptitude nor enthusiasm. It is up to the students to see that right men go to the right jobs. In the field of sports that is the paramount consideration.

¹For unavoidable reasons we could not give any report from the Athletic Committee. We hope this article will cover the ground adequately. S. Chatterji was the Rowing Secretary (1949-50) and the General Secretary for Athletics (1950-51). He is now a member of the Athletic Committee.—EDITOR.

The facilities that we have are ample. We have our different sections for football, cricket, hockey, tennis, rowing and the small area games. And we possess that wonderful thing that Calcutta Colleges can rarely boast of. We have our own playground. We spend a good portion of our Athletic budget each year to keep the turf of the Baker Laboratory ground in proper shape.

Amongst us football and cricket are the two most popular games. In football we generally manage to do well. We do not win trophies frequently, it is true. But in the Inter-Collegiate Leagues and knock out tournaments we are regarded as a "shock team". Only last year we fought our way up to the final of the Hardinge Birthday Challenge Shield tournament and were the runners-up. In the process we had the measure of such formidable opponents as the Bangabasi and the City Colleges. We do not have any really outstanding players but all this we did through sheer combination and teamspirit.

In cricket, too, for the last few years we have fielded a strong eleven. Our boys take a great deal of interest in this particular game and often in the cricket season crowded borders of the Baker Laboratory ground enigmatically announce the existence of deserted class rooms elsewhere.

In both football and cricket we run our inter-class tournaments which evoke keen interest. The arrangements for practice are competent. But we do wish they would do something to allow us to have some cricket practice during the Pujas. The selection of players is generally fair. But, of course, pleasant relations with the powers that be can always tear huge gaps in the defence of fair play.

These days, we regret to note, Presidency College has not a single representative in our university elevens. Our standard is certainly not so bad as to merit this exclusion. We could suggest two other reasons which would explain why we are not there. The University Sports Board wants all the players to be attached to some club or other. This for our students with whom games are merely recreation, is impossible. And of course mere fitness as a player is not the only criterion by which players are selected. This is a rule we find operating everywhere and the 'Varsity Sports Board is, perhaps, no exception.

The standard of hockey has deteriorated sadly. When we were in our Intermediate classes our hockey team simply swept everything before it. There was a particular season when we remained unbeaten throughout. But that was the end of our glory. The hockey season finds our students busy with their examinations and it becomes difficult to interest them. Nevertheless, we noted with satisfaction, our hockey-secretary aroused keen interest by his untiring efforts last season.

Sport lovers of Presidency College literally reeled when at the general meeting of the Athletic Council, last year, it was resolved that the two departments of Tennis and Rowing would be kept in abeyance for

lack of popular support and enthusiasm. Both these sections have fine tradition and rich memory. The fee for tennis is Rs. 10/- a year. This is incredibly low as compared to what one has to pay in the ordinary clubs. It is difficult to believe that it is impossible to get some fifteen people together who would be interested enough to pay this trifle. About the rowing section this step is even more difficult to explain. We are paying an annual sum of a hundred and fifty rupees as registration fee. Is this money going to be wasted? It is true the boys from North Calcutta find it difficult to attend. But has not the South enough of our students to allow us to run this?

Basket ball, revived after a long time in 1950-51, has failed to evoke enthusiasm. Volley-ball and badminton carry on a quiet but nonetheless useful existence. Our annual sports meets are as colourful as ever. On this day the presence and participation of our girls are two very heartening features. Incidentally we can note with justifiable pride the excellent feats of our all round athlete Sri Probir Guha Thakurta in the Inter-Collegiate Sports Meet as well as in the Bengal Olympics.

This we believe is not at all an indifferent record. But of course there is room for improvement. The grant for our sports section can very profitably be increased. We really need it. To give only one illustration of how well the money can be spent we can point out the utility of a Coaching Scheme. Such a scheme if undertaken on an all round basis would prove invaluable. And finally, we should urge our authorities to relax the restrictions recently imposed on the process of admission. If they can not consent to the admission of sportsmen solely on the ground of their proficiency at games, they can surely stop insisting on high first division marks as an absolutely necessary qualification. We have our wonderful team spirit but the presence of a few outstanding performers can make just that difference which would enable us to place our college amongst the leaders in the sports map.

The Alumni Association

1953 has been an eventful year for the Presidency College Alumni Association. There have been a number of social gatherings in true festive atmospheres: a steamer party in March and a play presented by Sri Ramindra Maitra and other members in October (Sri Pratap Chunder Chunder's "Prajapati" in the University Institute Hall) could find even the most careworn of the alumni relaxing.

During the year the Association has gathered strength in many ways. It has now its own office room, and some very good work has been done towards compiling the College old boys' register. The membership figures are rising and they are already in the zone of seven hundred.

*But the Association has also passed through moments of poignant sorrow, when it grieved for the loss of some of its most beloved alumni; and of despair, as when the members followed in helpless anguish those fateful events in distant Kashmir, their vice-president's detention and then, the ultimate tragedy.

Those members whom we have lost during the year we have mentioned below, but the list may not be complete, for sometimes the news may not have reached us. To the departed alumni we offer our tributes of affection and respect.

Sri Hiralal Chakravarty, Sri Nirmal Chunder Chunder, Sri Phanindranath De, Sri Satish Chandra Sinha, Dr. Shyamaprasad Mukherji and Sri Kalyan Kumar Basu.

EDITORS AND SECRETARIES
PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editors :

- 1914-15 PRAMATHA NATH BANERJEE, B.A.
1915-16 MOHIT KUMAR SEN GUPTA, B.A.
1916-17 MOHIT KUMAR SEN GUPTA, B.A.
1917-18 SAROJ KUMAR DAS, B.A.
1918-19 AMIYA KUMAR SEN, B.A.
1919-20 MAHMOOD HASSAN, B.A.
1920-21 PHIROZE E. DASTOOR, B.A.
1921-22 SYAMA PRASAD MOOKERJEE, B.A.
1921-22 BRAJAKANTA GUHA, B.A.
1922-23 UMA PRASAD MOOKERJEE
1923-24 SUBODH CHANDRA SEN GUPTA
1924-25 SUBODH CHANDRA SEN GUPTA, B.A.
1925-26 ASIT KRISHNA MUKHERJEE, B.A.
1926-27 HUMAYUN Z. A. KABIR, B.A.
1927-28 HIRENDRA NATH MUKHERJEE, B.A.
1928-29 SUNIT KUMAR INDRA, B.A.
1929-30 TARAKNATH SEN, B.A.
1930-31 BHABATOSH DATTA, B.A.
1931-32 AJIT NATH ROY, B.A.
1932-33 SACHINDRA KUMAR MAJUMDAR, B.A.
1933-34 NIKHILNATH CHAKRAVARTY, B.A.
1934-35 ARDHENDU BAKSI, B.A.
1935-36 KALIDAS LAHIRI, B.A.
1936-37 ASOK MITRA, B.A.
1937-38 BIMAL CHANDRA SINHA, B.A.
1938-39 PRATAP CHANDRA SEN, B.A.
1938-39 NIRMAL CHANDRA SEN GUPTA, B.A.
1939-40 A. Q. M. MAHIUDDIN, B.A.
1940-41 MANILAL BANERJEE, B.A.
1941-42 ARUN BANERJEE, B.A.
1942-46 No publication due to Govt. Circular
Re. Paper Economy
1947-48 SUDHINDRANATH GUPTA, B.A.
1948-49 SUBIRKUMAR SEN, B.A.
1949-50 DILIPKUMAR KAR, B.A.
1950-51 KAMALKUMAR GHATAK, B.A.
1951-52 SIPRA SARKAR, B.A.
1952-53 ARUN KUMAR DAS GUPTA, B.A.
1953-54 ASHIN DAS GUPTA, B.A.

Secretaries :

| | |
|---------|---|
| 1914-15 | JOGESH CHANDRA CHAKRAVARTI, B.A. |
| 1915-16 | PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A. |
| 1916-17 | PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A. |
| 1917-18 | RAMA PRASAD MUKHOPADHYAY, B.A. |
| 1918-19 | MAHMOOD HASSAN, B.A. |
| 1919-20 | PARAN CHANDRA GANGOOLI, B.A. |
| 1920-21 | SHYAMA PRASAD MOOKERJEE |
| 1921-22 | BIMAL KUMAR BHATTACHARYYA |
| 1921-22 | UMA PRASAD MOOKERJEE |
| 1922-23 | AKSHAY KUMAR SIRCAR |
| 1923-24 | BIMALA PRASAD MUKHERJEE |
| 1924-25 | BIJOY LAL LAHIRI |
| 1926-27 | LOKES CHANDRA GUHA ROY |
| 1927-28 | SUNIT KUMAR INDRA |
| 1928-29 | SYED MAHBUB MURSHED |
| 1929-30 | AJIT NATH ROY |
| 1930-31 | AJIT NATH ROY |
| 1931-32 | NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE |
| 1932-33 | NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE |
| 1933-34 | GIRINDRA NATH CHAKRAVARTI |
| 1934-35 | SUDHIR KUMAR GHOSH |
| 1935-36 | PROVAT KUMAR SIRCAR |
| 1936-37 | ARUN KUMAR CHANDRA |
| 1937-38 | RAM CHANDRA MUKHERJEE |
| 1938-39 | ABU SAYEED CHOWDHURY |
| 1939-40 | BIMAL CHANDRA DATTA, B.A. |
| 1940-41 | PRABHAT PRASUN MODAK, B.A. |
| 1941-42 | GOLAM KARIM |
| 1942-46 | No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy |
| 1946-47 | JIBANLAL DEV |
| 1947-48 | NIRMAL KUMAR SARKAR |
| 1948-49 | BANGENDU GANGOPADHYAY |
| 1949-50 | SOURINDRAMOHAN CHAKRAVARTY |
| 1950-51 | MANAS MUKUTMANI |
| 1951-52 | KALYAN KUMAR DAS GUPTA |
| 1952-53 | JYOTIRMOY PAL CHAUDHURI |
| 1953-54 | PRODIP KUMAR DAS. |

